অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্য
সম্পাদিত

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প

বেঙ্গল পাবলিশার্স ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৬২
প্রকাশক—বিমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
গ্রন্থশ্রীর পক্ষে বেঙ্গল পাবলিশার্স
৪৬।৫বি, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা-১৯
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড
কলিকাতা-৩৭
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

পাঁচ টাকা

সূচীপত্র

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

অধুনালুপ্ত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা 'বিচিত্রা'র সম্পাদক ও ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথের জন্ম ভাগলপুরে ২৬শে আশ্বিন, ১২৮৮ সালে (ইংরেজী ১২ই অক্টোবর ১৮৮১)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ., বি.এল. শিক্ষালাভান্তে ১৯১৩-২৫ পর্যন্ত ভাগলপুরে ওকালতি-জীবন। ১৯২৫-৩৭ পর্যন্ত 'বিচিত্রা'র সম্পাদনা। প্রকাশিত প্রথম রচনা বারো বৎসর বয়সে রচিত "সন্ধ্যা" নামক কবিতা। প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস যথাক্রমে 'সপ্তক' ও 'শশিনাথ'। 'রাজপথ,' 'অমূল তরু,' 'অমলা,' 'অভিজ্ঞান,' 'আশাবরী,' 'বিদুষী ভার্যা,' 'অন্তরাগ,' 'ছদ্মবেশী,' 'স্মৃতিকথা' (৪ খণ্ড), 'সোনালী রঙ,' 'যৌতুক,' 'দিক্‌শূল, প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী ও সুরসিক। সঙ্গীতজ্ঞ। সাহিত্যই একমাত্র উপজীব্য। বর্তমানে 'গল্প-ভারতী' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনায় ব্যাপৃত।

ভূমিকা

১

জীবনাশ্রয়ী শিল্পসৃষ্টি মূলত দু জাতের,—সমালোচনপন্থী আর উন্মীলনপন্থী। সমালোচনপন্থী শিল্পে জীবনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রাধান্য পায়। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে শিল্পীর মনোভাব সেখানে স্পষ্টোচ্চারিত। নরনারীর দুঃখবেদনার মূলে সমাজের যে-সব ত্রুটিবিচ্যুতি ও অন্যায় বিধিবিধান রয়েছে তার বিরুদ্ধে দ্রষ্টার বিক্ষোভ তীব্র আকার ধারণ করে, কখনো কখনো তা প্রচণ্ড বিদ্রোহের রূপ নিয়েও দেখা দেয়। স্বভাবতই সামাজিক-চিত্তের বিক্ষুব্ধ বাসনা-বেদনাগুলি শক্তিশালী শিল্পীর লেখনীমুখে সাকার হতে দেখে পরিতৃপ্ত পাঠকসমাজ দরদী স্রষ্টাকে মাল্যচন্দন দিয়ে সদ্য-সদ্য বরণ ক'রে নেয়। লোকপ্রিয়তার দিক দিয়ে তাই সমালোচনপন্থী শিল্পেই সাফল্যলাভ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। শাণিত ভাষণের তীক্ষ্ণ আঘাতে উচ্চকিত পাঠকসমাজে প্রতিবেদন সৃষ্টি করা কঠিন নয়। কিন্তু উন্মীলনপন্থী শিল্পীর সাধনা অন্য গ্রামের। নিরপেক্ষ দ্রষ্টার আসনে ব'সে নিরুদ্বিগ্ন মনে শুভে-অশুভে-স্থাপিত বিষামৃতময় জীবনকে প্রত্যক্ষ করা এবং তার সুগভীর রহস্যকে আপন স্বরূপে উন্মীলিত ক'রে তোলার শিল্পকর্ম নিভৃতচারী নিঃসঙ্গ একাকিত্বের মধ্যেই জন্মলাভ করে। এ ক্ষেত্রে স্রষ্টা জীবন-রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে দাঁড়িয়ে অদৃশ্যলোক থেকেই রহস্যের যবনিকা তুলে ধরেন। নিজেকে সৃষ্টির অন্তরালে রেখে শিল্পসৌন্দর্যকে জীবনবৃন্তে বিকশিত হতে দেওয়ার এই রীতিই বিশুদ্ধতর শিল্পরীতি ব'লে বিদগ্ধ রসিকসমাজ স্বীকার ক'রে থাকেন। কেননা, শিল্পলোকের শান্ত ও সমাহিত পরিবেশে জীবনের উত্তাপ নয়, জীবনের আলোকই রসিকজনের কাম্য।

বাংলা-কথাসাহিত্যে উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় শেষোক্ত দলের শিল্পী। উন্মীলনপন্থাই তাঁর শিল্পপন্থা। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর

আত্মপ্রকাশের লগ্নকে আমাদের কথাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধির যুগ বলা যেতে পারে। উপেন্দ্রনাথের প্রথম গল্পসংকলন গ্রন্থ 'সপ্তক' প্রকাশিত হয়েছে ১৩১৯ সালে, আর তাঁর প্রথম উপন্যাস 'শশিনাথে'র প্রকাশকাল ১৩২৮। 'সপ্তক' প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাত-কুমারের অধিকাংশ গল্পই রচিত হয়েছে, আর 'শশিনাথ' গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হবার পূর্বে একদিকে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' এবং অন্যদিকে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনাবলী প্রকাশিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের আকাশ এক অপূর্ব জাগরণের বিপুল সাড়ায় আলোড়িত ও উচ্চকিত হয়ে উঠেছে। সেদিনকার সাহিত্য-রঙ্গমঞ্চে দিক্‌পালেরা যখন নেতৃস্থানীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সহস্র বিমুগ্ধ-দৃষ্টিকে বিস্ময়াবিষ্ট ক'রে রেখেছেন তখনও উপেন্দ্রনাথ তাঁর অপেক্ষাকৃত গৌণ আসন থেকেই স্বীয় কলাকুশলতাগুণে কৌতূহলী দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হয়েছেন। তারপরে যখন সাহিত্যের পটপরিবর্তন হয়েছে, অভিজাতগৃহের নাটমন্দির থেকে বাণীর পাদপীঠ স্থানান্তরিত হয়েছে জনজীবনের বারোয়ারিতলায়, কালান্তরের সেই কল্লোল-কোলাহলের দিনেও উপেন্দ্রনাথ যুগচিত্তের সাময়িক উত্তেজনার সীমান্তে ব'সে একাগ্র নিষ্ঠায় নব নব শিল্পসৃষ্টি ক'রে এসেছেন। আজো তাঁর লেখনীর ক্লান্তি নেই। প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের বিয়াল্লিশ বৎসর পরেও তাঁর নতুন উপন্যাস তাঁর সৃষ্টিক্ষমতার সার্থক পরিচয় বহন ক'রে এনেছে। তিনি যে যুগে প্রথম লিখতে আরম্ভ করেন, বর্তমান কালের সাহিত্য সে যুগের রুচি ও আদর্শকে অনেক পেছনে ফেলে এসেছে। এক যুগের অতি-আধুনিকতা অন্যযুগে অচল ব'লে বর্জিত হয়েছে। সাহিত্যে নব নব যুগলক্ষণ দেখা দিয়েছে। কিন্তু যা নিতান্তই তৎকালিক ও তৎস্থানিক, উপেন্দ্রনাথ কোনোদিনই তাকে তাঁর সাহিত্যের উপজীব্য ক'রে তোলেন নি। যা কালবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বিশিষ্ট হয়েও সর্বকালীন ও সর্বজনীন, সেই সার্বভৌম মানবসত্যকেই তিনি শিল্পসুন্দর করার সাধনা চিরদিন ক'রে এসেছেন। তাই তাঁর সাহিত্য যুগান্তরের রুচিবদলের দিনেও রসিকচিত্তকে পরিতৃপ্ত করতে পেরেছে। উপেন্দ্রনাথের সাফল্যের মূলে রয়েছে তাঁর সুনিপুণ শিল্পকর্ম। মাধুর্য ও প্রসাদ-গুণে তাঁর মঞ্জুভাষী রচনাবলী সর্বদাই হৃদ্য ও সুখপাঠ্য।

কথোপকথনের ক্ষেত্রে উত্তর ও প্রত্যুত্তর রচনায় মননশীলতার সঙ্গে বাক্‌পটুতার সমন্বয় তাঁর সাহিত্যের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। জীবন-বোধ ও শিল্পরূপায়ণে সংযম ও শালীনতাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ।

স্বভাবতই উপেন্দ্রনাথের সুভাষিত রচনাবলী পাঠের পর প্রভাতকুমার ও শরৎচন্দ্রের কথা মনে হয়। উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের সম্পর্কিত মাতুল। শুধু নিকট-আত্মীয় ব'লেই নয়, প্রথম জীবনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের ফলে উভয়ের মধ্যে আজীবন অন্তরঙ্গতাও সৃষ্টি হয়েছিল। বয়সের দিক দিয়ে সামান্য ব্যবধান থাকলেও ভাগলপুরে সাহিত্যসৃষ্টির আদিলগ্নে উভয়ে একই গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। মধুর ও মনোহারী সাহিত্য রচনায় উভয়ের মধ্যে আপাতদৃষ্ট সাদৃশ্যও বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারা যাবে যে, উভয়ের জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। শরৎচন্দ্রের চেতনা-মূলে রয়েছে বঞ্চিত জীবনের প্রতি সুগভীর সহানুভূতি। প্রাণরহস্যের অতল গভীরে তলিয়ে গিয়ে শরৎচন্দ্র জীবনের মর্মান্তিক বেদনাকেই প্রত্যক্ষ করেছেন। নরনারীর হৃদয়সম্পর্ক যেখানে সামাজিক অনুশাসনে লাঞ্ছিত ও অস্বীকৃত সেখানেই তাঁর সাহিত্যের চরম উৎকৃষ্টি। স্বভাবতই পারিবারিক শৃঙ্খলার সীমানা পেরিয়েই শরৎচন্দ্রের সাম্রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের সাহিত্য পারিবারিক জীবনের স্বাভাবিক গণ্ডীর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখ ও আনন্দ-বেদনাকেই তিনি বিচিত্ররূপে আস্বাদনীয় ক'রে তুলেছেন। তাই শরৎচন্দ্রে যেখানে পরকীয়াতেই রসের সমধিক উল্লাস পরিলক্ষিত হয়, সেখানে উপেন্দ্রনাথ স্বকীয়া প্রীতির সহজতর ক্ষেত্রে তাঁর কল্পনাকে বিলসিত ক'রে তুলেছেন। তা ছাড়া শরৎচন্দ্রে ব্যর্থ ও বঞ্চনাহত জীবনের মর্মবেদনাই ঐকান্তিক হয়ে উঠেছে, কিন্তু উপেন্দ্রনাথ বেদনার আত্যন্তিকতাকে পরিহার ক'রে চলেন। জীবনের সমস্যাকে তিনি দেখেছেন, কিন্তু কখনো তাকে পর্বতপ্রমাণ ক'রে তোলেন নি; সংকটের জটিল আবর্ত পেরিয়ে চলমান জীবনের মুক্তধারার আলোছায়ার লীলাই তাই তাঁর সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছে। এ দিক দিয়ে মনে হয় উপেন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারের সগোত্র। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথের

চেয়ে প্রভাতকুমারের প্রভাবই উপেন্দ্রনাথের মধ্যে অধিক মাত্রায় পারলক্ষণীয়। আমাদের পরিচিত ও অভ্যস্ত পারিবারিক জীবনের সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেও যে রোমান্সের কুসুমিত রাজ্য বিরাজমান, প্রভাতকুমার প্রধানত সেখান থেকেই তাঁর হাস্যমধুর গল্পগুলির উপাদান সংগ্রহ করেছেন। উপেন্দ্রনাথও রোমান্সের একই স্বপ্নস্বর্গ থেকে পূর্বরাগ-অনুরাগের উপকরণ আহরণ করেছেন। কিন্তু প্রভাতকুমারের আদিরসাত্মক রচনায় হাস্যরস মুখ্যসঞ্চারী রূপেই দেখা দিয়েছে; আর উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যে হাস্যরস ফল্গুধারায় প্রবহমান। তা ছাড়া বর্ণনাত্মক ভঙ্গীতেই প্রভাতকুমারের শ্রেষ্ঠ সাফল্য, কিন্তু উপেন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য সংলাপাত্মক ভঙ্গীতে।

বর্তমান সংকলনের প্রথম গল্পটি বিশ্লেষণ করলেই উপেন্দ্রনাথের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। কলিকাতার সংকীর্ণ গলির পরিচিত পরিবেশ থেকে বহুদূরে শিমলা পাহাড়ের পার্বত্য পট-ভূমিতে এ গল্পের যবনিকা উত্তোলিত হচ্ছে। সদ্যঃবিবাহিত তরুণ নায়ক নববধূকে কলিকাতায় রেখে চাকরি-জীবন শুরু করতে গিয়ে সেখানে সাক্ষাৎ পেল পর্বতকন্যা জানকীর। জঙ্গল-দপ্তরের জমাদারের এই ষোড়শী মেয়েটি প্রতিদিন ভোরবেলা একটি ক'রে পুষ্পগুচ্ছ দিয়ে যায়, সেই সূত্রেই আলাপ। সবল সুগঠিতদেহ এই বালিকাটির যেমন সপ্রতিভ ভঙ্গী তেমনি অবাধ গতি। যেমন অবলীলাভরে সে গৃহে প্রবেশ করে তেমনি সহজেই আলাপ জমায়। এরূপ ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতা হতে বিলম্ব হওয়ার কথা নয়। দিনে দিনে আলাপ-আলোচনা ঘনিষ্ঠতর হতে লাগল। ফুলের তোড়া উপলক্ষ্য মাত্র হয়ে গল্প করাই প্রধান ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু এই দুটি ভিনদেশী তরুণ তরুণীর সুন্দর সান্নিধ্য সেখানেই থেমে রইল না; মাস তিনেক পরে তরুণটির মনে হ'ল, ঘনিষ্ঠতার মাত্রা যেন সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করতে চলেছে। এই গিরিকন্যা শুধু পুষ্প উপহার দিতেই আসে না, আসে তার সঙ্গলাভের জন্য। তরুণের মনে হ'ল, এই দুরন্ত পাহাড়ী বালিকার হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হয়েছে। বিবাহিত বাঙালী তরুণের মন অস্বস্তিকর চিন্তায় ভ'রে উঠল। সম্পর্ক যতই মধুর হোক, সান্নিধ্য যতই প্রীতিপ্রদ হোক,—এই বিভ্রান্তিকর মোহের

হাত থেকে মুক্ত হতেই হবে। যুবক যখন এই সংকল্পকে মনে মনে দৃঢ় ক'রে গ'ড়ে তুলছে, তখন এই রহস্যময়ী তরুণীটি তার চেতনালোকে চূড়ান্ত চমকের সৃষ্টি করল। একদিন ভোরবেলা একটি বড় ফুলের তোড়া নিয়ে সে এসে দেখা দিল। সঙ্গে একটি বলিষ্ঠ পাহাড়ী যুবক,—তারই স্বামী। পাঁচ বৎসর পূর্বে তাদের বিবাহ হয়েছে, আজ স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরগৃহে যাবার পূর্বে সে বাবুজীর কাছ থেকে শেষ-বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে। এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে গল্পের যেন মেঘমুক্তি ঘটল। জান্‌কীর এতদিনের নিঃসংকোচ মেলামেশা ও কুণ্ঠাহীন সান্নিধ্য সম্পর্কে তরুণের মনে যে 'বিভ্রম' সৃষ্টি হয়েছিল এক নিমেষে তার অবসান হ'ল। রোমান্সের শুভ্রোজ্জ্বল অরুণরাগে একটি রক্তগোলাপের মতোই গল্পটি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠল।

কিন্তু এখানেই গল্পের পরিসমাপ্তি ঘটে নি। জান্‌কী তার স্বামীকে নিয়ে চ'লে যাবার পর একটি সূক্ষ্ম বেদনার মধ্য দিয়ে নায়কের অন্তর-রহস্য উন্মীলিত হয়েছে। সে বলছে—

> জান্‌কীর সরল স্নেহপূর্ণ আচরণকে বিকৃত রূপ দিয়া তাহাকে শোধন করিবার সাধু সঙ্কল্পের আত্মপ্রসাদে কিছু পূর্বে মনে মনে নিজের পিঠ ঠুকিতেছিলাম। সেই শূন্যগর্ভ অহমিকা হইতে সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তিলাভ করিয়া মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন মনে হইল, কাল হইতে "বাবুজী ফুল" বলিয়া একখানি সরল অন্তঃকরণ আর আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে না, তখন একটা সূক্ষ্ম বেদনায় মনটা পীড়িতও হইতে লাগিল।
>
> সেই দিন আপিসে গিয়া বলিলাম, "সাহেব, আমাকে দশ দিনের ছুটি দাও, স্ত্রীকে আনিতে যাইব।"
>
> সাহেব বলিলেন, "তথাস্তু।"

উপসংহারের এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এসেই গল্পটি রোমান্সের স্বপ্নবিলাস থেকে সার্থক ছোটগল্পের বস্তুভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। একদিন এই যুবক মুগ্ধদৃষ্টিতে গিরিনির্ঝরের কলধ্বনিময় লীলাচাঞ্চল্যের দিকেই তাকিয়ে ছিল, এবার সেই দৃষ্টি নিজের দিকে ফিরতেই সে বুঝতে পারল যে, সেখানেও তার অজ্ঞাতসারেই একটি সঙ্গপিপাসা সংগোপনে লালিত হয়েছে। সেই স্বপ্নাবেশেই সে তিন মাস তার সদ্যঃবিবাহিত পত্নীর কথাও ভুলেছিল,

আজ পত্নীকে কাছে পাবার এই বাসনাই তার এতদিনের আত্মবিস্মৃতির অভিজ্ঞান হয়ে দেখা দিয়েছে। গল্পের উপসংহার-রচনায় এই সুচারু শিল্পকর্মের সংযম-সৌন্দর্যই উপেন্দ্রনাথের ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। জীবনের স্বাভাবিকতার ভারসাম্যে বিন্দুমাত্র উৎকেন্দ্রিক না হয়েও তিনি মানব-মনের আলোছায়ার লীলারহস্যকে উন্মীলিত ক'রে তুলতে পারেন। তাঁর শিল্পকর্মের এই অনাড়ম্বর শান্ত আবেদন রসগ্রাহী রসিকচিত্তের অতি উপাদেয় সামগ্রী।

২

উপেন্দ্রনাথ মুখ্যত পারিবারিক জীবনের শিল্পী। আমাদের গতানুগতিক ও রক্ষণশীল পরিবার-জীবনের বৈচিত্র্যহীন বিবর্ণতার মধ্যে রসের ধারা সংকীর্ণ খাতে প্রবহমান। পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ নরনারীর অনুরাগ-বিরাগ, মান-অভিমান, সন্দেহ ও অবিশ্বাসই সেখানে রসসৃষ্টির প্রধান আলম্বন। এই অতি-পরিচিত ও অভ্যস্ত পরিবেশে প্রেমের আকস্মিক আবির্ভাবেই মধ্যে মধ্যে হৃদয়সিন্ধু উদ্বেল হয়ে ওঠে। প্রেমের পূর্ণচন্দ্রোদয়ে প্রাণের সেই বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গ উপেন্দ্রনাথের কবিকল্পনাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাই তাঁর সাহিত্যে মানব-হৃদয়ের কৌমুদী-রাগই স্নিগ্ধ লাবণ্যে নয়নাভিরাম।

বর্তমান সংকলনে "গিরিকা", "বর্ষাদিনের কাব্য" এবং "শেষ মীমাংসা" এই তিনটি সুন্দর ও সার্থক প্রেমের গল্প স্থান পেয়েছে। "গিরিকা" গল্পে বয়ঃসন্ধির পূর্বরাগ হাস্যকৌতুকময় সংলাপকে আশ্রয় ক'রে মধুস্বাদী হয়ে উঠেছে। এ গল্পের কিশোর নায়ক প্রদোষনাথ ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্র, বয়স ষোল-সতের। ছোট বোন মণিমালা বেথুন স্কুলের অষ্টম মানের ছাত্রী। তারই গৃহশিক্ষয়িত্রীরূপে পরিবারে স্থান পেল 'প্রাইভেটে বি. এ পরীক্ষার্থিনী' গিরিকা। বয়স উনিশ-কুড়ি; রূপে যেমন লক্ষ্মীপ্রতিমা, কথাবার্তায় তেমনি সাক্ষাৎ সরস্বতী। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নিজের পড়ার ঘরে এই অপরিচিতার প্রথম সাক্ষাতেই লাল হয়ে উঠল প্রদোষনাথ, আর তার সপ্রতিভ 'তুমি' সম্বোধনে গিরিকার মুখখানা কৌতুকের মিষ্ট হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বলাই বাহুল্য, বয়সে তিন বৎসরের ছোট, নিতান্তই স্কুলের ছাত্রের প্রতি প্রণয়ানুরাগিণী হওয়া

গিরিকার পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না, এই কিশোরের প্রতি ছিল তার কৌতুকমিশ্র প্রীতিমধুরতা। কিন্তু গিরিকার সান্নিধ্য ও সঙ্গকামনা প্রদোষের চিত্তাকাশকে প্রেমের অরুণরাগে রঞ্জিত ক'রে তুলল। গিরিকার মনকে জানবার জন্য জাগল তার দুর্দমনীয় কৌতূহল, এবং সেই কৌতূহলের সরণি বেয়েই এল কিশোরপ্রেমের স্বপ্নমদিরতা। গিরিকা তার তরুণীহৃদয়ের রহস্যময় প্রহেলিকাজাল বিস্তার ক'রে কতকটা তার অজ্ঞাতসারেই প্রদোষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করছিল। এমনি ভাবে একটি অপরূপ ছন্দের মধ্য দিয়ে এ দুটি প্রাণীর নিত্যকার জীবন প্রবাহিত হয়ে চলছিল। হঠাৎ সুদূর হায়দ্রাবাদ থেকে জেঠামশায়ের পত্রে গিরিকার বিবাহের প্রস্তাবে চিরবিচ্ছেদের নিষ্ঠুর সম্ভাবনা দেখা দিল। গিরিকাকে ছেড়ে প্রদোষের থাকা একেবারেই অসম্ভব। অথচ বিয়ে ক'রে তাকে চিরদিনের মতো বধূরূপে পাওয়ার সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। এই সংকটলগ্নে প্রদোষের দাদা গ্লাসগোর ভাবী এঞ্জিনীয়ার প্রভাতনাথ দু মাসের জন্য ছুটিতে এসে প্রদোষ ও গিরিকাকে আশু বিচ্ছেদের দুর্বিষহ বেদনা থেকে উদ্ধার করলে। বউদিরূপেই গিরিকাকে চিরদিনের মতো পেয়ে প্রদোষ পরিতৃপ্ত হ'ল। সংলাপ-সুরভিত এই গল্পে কিশোর-মানসে ব্যক্তিত্ববিকাশের উন্মেষলগ্নে প্রেমের প্রদোষ-লীলার বর্ণনা হাস্যমধুরতায় শুধু চিত্তাকর্ষকই হয় নি, মনস্তত্ত্বসম্মত সত্যের উপরও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রদোষ ও প্রভাত এ দুটি নামের মধ্যেই পূর্বরাগের দুটি সুর শিল্পসুন্দর ব্যঞ্জনায় সুবিন্যস্ত হয়ে রসপরিবেশনে সহায়তা করেছে।

"বর্ষা দিনের কাব্য" গল্পে পূর্বরাগের রোমান্স কাব্যলোকেই কুসুমিত হয়ে উঠেছে। তাই তার ভাষাও ঈষৎ প্রগল্‌ভ এবং পরিবেশ অনুযায়ী পরিকল্পনাও খানিকটা অসংবৃত। গল্পটি ঘটনাপ্রধান। কলিকাতার বর্ষা এর উদ্দীপন বিভাব রচনা করেছে। মুষলধার বর্ষণে ছাতামাথায় ট্রামে চড়তে গিয়ে মহানগরীর পাষাণপথে রচিত হ'ল মানসবৃন্দাবন। গল্পের নায়ক রঘুনাথ ধনকুবের পিতার একমাত্র পুত্রই শুধু নয়, স্নাতকোত্তর গণিতশাস্ত্রে রেকর্ড মার্ক অধিকার ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের দীপ্তিমান ছাত্র। নায়িকা বসুদাও কলেজের ছাত্রী; পিতামাতার একান্ত আগ্রহ বসুদাকে রঘুনাথের হাতে সমর্পণ করেন; কিন্তু উভয় পক্ষের অভিভাবকের সানন্দ

সম্মতি সত্ত্বেও রঘুনাথের ধনুর্ভঙ্গ পণ—বিলেত থেকে লেখাপড়া শেষ না ক'রে সে বিবাহ করবে না। কাজেই কনে দেখার প্রস্তাবে সে কখনোই সম্মত হয় নি। এমন অবস্থায় বর্ষার মেঘ এল দূত হয়ে। বৃষ্টির মধ্যে ছাতা টাঙিয়ে রঘুনাথ উঠতে যাবে ট্রামে, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই বসুদা ট্রাম থেকে নেমে হয়তো আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিবশেই একেবারে সোজা রঘুনাথের ছাতার মধ্যে ঢুকে পড়ল। অথচ কেউ কাউকে চেনে না। এই ভাবে একান্ত অপরিচিত দুই তরুণ তরুণী দৈব-ষড়যন্ত্রে একই ছত্রতলে মিলিত হয়ে যে কৌতুকাবহ অবস্থার সৃষ্টি করল, তাকে আশ্রয় ক'রেই গল্পরস পরিবেশিত হয়েছে। ঘটনাসংস্থানের অভিনবত্ব এ গল্পে চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই, কিন্তু মধুস্বাদী উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে সংকোচে ও সম্ভ্রমে দুটি হৃদয়ের উন্মীলন-রহস্যটি লেখকের পরিবেশন-নৈপুণ্যের সার্থক উদাহরণ হিসাবে শ্লাঘনীয়।

"শেষ মীমাংসা" গল্পের পটভূমি দেওঘর। কিন্তু প্রারম্ভ "বর্ষাদিনের কাব্যে"র মতোই আকস্মিক দৈবসংঘটনে চমকপ্রদ। শীতের জনশূন্য পথে সন্ধ্যার অন্ধকারে দুর্বৃত্ত রিকৃশওয়ালার হাত থেকে বিপন্ন তরুণীকে উদ্ধার ক'রে তাকে রিকৃশয় চাপিয়ে নিজে সেই রিকৃশ টেনে আনার মধ্যে রোমান্সের চিরন্তন বীরমিশ্র আদিরস হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু উপসংহারে এ গল্পের রসকেন্দ্র নিরঙ্কুশ রোমান্সের স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসেছে বাস্তব জীবনের সমস্যা-বন্ধুর পথে। অনুরূপ অবস্থায় তরুণ বীরের কল্পনা একটু শ্লথবল্গই হয়ে থাকে। কাজেই উদ্ধারপ্রাপ্তা তরুণী মালতীর সঙ্গে অজয়ের বোঝাপড়া ত্বরিতগতিতেই সম্পন্ন হ'ল। পরম কৃতজ্ঞতাভরে মালতী অজয়ের প্রথম উচ্ছ্বাসের মুখে সানন্দে সম্মতি জানিয়ে গেল বটে, কিন্তু সে যে আগে থেকেই অন্যের বাগ্‌দত্তা! অজয়কে হারাতেও সে চায় না, অথচ তাকে বিয়ে করাও যে সম্ভব নয়। এই সঙ্কট থেকে তাকে পরিত্রাণ করতে এল তার যমজ বোন মল্লিকা। বোনের মুখে অজয়ের কাহিনী শুনে মল্লিকা তাকে ভালবেসেই ধরা দিতে এসেছিল। কিন্তু অজয় প্রতিজ্ঞা করেছিল—হয় মালতী, নয় এ জীবনে আর কেউ নয়। কাজেই ক্ষুব্ধচিত্তে মল্লিকাকে প্রত্যাখ্যান ক'রে অজয় কলিকাতা প্রত্যাবর্তনের জন্য রওনা হ'ল। স্টেশনে তাকে বিদায় দিতে এসে মল্লিকাও তার প্রতিজ্ঞার কথা

জানাল—হয় অজয়, নয় এ জীবনে আর কেউ নয়। বলাই বাহুল্য, এর পর অজয়কেই হার মানতে হ'ল। মল্লিকাই হ'ল বিজয়িনী। অবশ্য মালতীর বদলে মল্লিকাকে পেয়ে অজয়ের প্রেম সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হ'ল কিনা তার 'শেষ মীমাংসা'র ভার লেখকের নয়, তা মনস্তাত্ত্বিকের। কিন্তু রোমান্টিক প্রেমের রসপরিণতির দিক দিয়ে এই উপসংহার যে শিল্পসম্মত হয়েছে তা রসিকমাত্রেরই অবশ্যস্বীকার্য।

৩

উপেন্দ্রনাথের শিল্পচেতনার প্রথম স্তরে বিশুদ্ধ রোমান্সের কুসুমিত রাজ্য পেরিয়ে তাঁর বাস্তবঘনিষ্ঠ জীবনবোধের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। জীবনের সবটাই যে স্বপ্ন আর কাব্য নয়, সবটাই যে প্রেম আর সৌন্দর্য দিয়ে বিরচিত হয় না, এ বোধ জীবনশিল্পী মাত্রেরই সহজাত। সত্যের সেই কঠোরতর উপাদানে গড়া নরনারীর দুঃখবেদনার আলেখ্য-রচনায় উপেন্দ্রনাথের শিল্পবোধ তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে হরিহরাত্মা। মানুষের মর্ত্যলীলার কান্নাহাসির গঙ্গাযমুনায় তিনি শুধু অবগাহনই করেন নি, সেখান থেকেই তাঁর রসের গাগরী পূর্ণ ক'রে নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিতে বিষামৃতময় এই জীবনের সুখদুঃখ এক দিকে যেমন মানুষের অনতিক্রম্য নিয়তি, অন্য দিকে আবার মানুষ নিজেই তার সুগতি-দুর্গতির সৃষ্টিকর্তা। এক দিকে যেমন সে অজ্ঞাত বিধাতার হাতে অসহায় ক্রীড়নক মাত্র, অন্য দিকে আবার তার নিজেরই কামনা বাসনা ও কৃতকর্মের মধ্য দিয়ে সে স্বয়ং তার ভাগ্যরচয়িতা। জীবন সম্পর্কে এই সঙ্গতিবোধের ফলেই উপেন্দ্রনাথের শিল্পক্ষেত্রে জীবনের সহজ ও স্বাভাবিক রূপটিই নরনারীর মর্মান্তিক দুঃখবেদনার মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্তমান সংকলনে "প্রমাণ", "বিপরীত" ও "হস্তারপুর"—এই তিনটি গল্প বিশ্লেষণ করলেই আমাদের প্রতিপাদ্য প্রমাণিত হবে।

ফলিত-জ্যোতিষে অন্ধ বিশ্বাস এবং জীবনের ওপর তার বিষক্রিয়া যে কত করুণ ও ভয়াবহ হতে পারে, তারই একটি ট্রাজিক চিত্র রচিত হয়েছে "প্রমাণ" গল্পে। সওদাগরী আপিসের বড়-চাকুরে সুধাময় তার স্ত্রী অরুণা ও কিশোরী কন্যা করুণাকে নিয়ে সুখে ও শান্তিতেই সংসার

করছিল। অকস্মাৎ তাদের ভাগ্যাকাশে দেখা দিলেন আমেরিকা-প্রত্যাগত জ্যোতিষী বিমলানন্দ। বিজ্ঞাপন-মাহাত্ম্যে সুধাময়ের নিঃসংশয় বিশ্বাস হ'ল যে, বিমলানন্দের মুখনিঃসৃত বাণী ভ্রান্তিহীন। সুধাময়ের করকোষ্ঠী বিচার ক'রে মহাত্মা ব'লে দিলেন যে, সে বিবাহিত হয়েও নিঃসন্তান, সন্তান তার কখনোই হবে না। কন্যা করুণার কথা স্মরণ ক'রে সুধাময় তার প্রতিবাদ করতে চাইল, কিন্তু কোনোই ফল হ'ল না। জ্যোতিষী পুনর্গণনায় তার কোষ্ঠী ও ললাটলিপি পরীক্ষা ক'রে চূড়ান্ত রায় লিখে দিলেন, "আমার গণনায় কোনো ভুল নেই, তোমার ধারণায় ভুল।" জ্যোতিষে অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে সুধাময়ের মনে স্থান পেল, স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস ও তার চরিত্রে সন্দেহ। বিমলানন্দের বাণী মিথ্যা হতে পারে না, সুতরাং করুণা তার ঔরসজাত কন্যা নয়, অতএব তার স্ত্রী অসতী। এই সিদ্ধান্তে উদ্‌ভ্রান্ত সুধাময় ডেকে আনল তার জীবনের সর্বনাশ। এই পাপচিন্তায় বিষাক্ত স্বামীর ঘর করা কোনো আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্না স্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব নয়, অরুণা তাই তার কন্যাকে নিয়ে চ'লে গেল ভাইয়ের কাছে লাহোরে। এক বৎসর পরে সেখান থেকে সংবাদ এল যে, কন্যা করুণা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। ইংরেজ ডাক্তারের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, মেয়ের শরীরের একটি বিশেষ স্থানে একটা বিকৃতি আছে, তার ফলেই এই ক্ষয়রোগ। ডাক্তারের মতে বংশানুগত ভাবেই এই বিকৃতির উৎপত্তি, কিন্তু মায়ের দেহপরীক্ষায় এ জাতীয় কোনো বিকৃতি ধরা পড়ে নি, সুতরাং পিতার দেহেই তার অস্তিত্ব বর্তমান। বিজ্ঞানের এই নির্দেশের অনুসরণে সুধাময় নিজদেহের অনুরূপ বিকৃতি আবিষ্কার ক'রে এতদিনে তার বিমূঢ় বিভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'ল। কিন্তু তখন নিয়তির বিধান অনিবার্য-ভাবেই নেমে এসেছে। তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তরূপে কন্যাকে চিরদিনের মতোই তাকে হারাতে হ'ল। এ গল্পে স্রষ্টার একটা বক্তব্য অবশ্যই আছে, কিন্তু তা গল্পসত্যকে অতিক্রম ক'রে আত্মপ্রকাশ করে নি ব'লেই গল্পরূপটি শিল্পসুন্দর হতে পেরেছে। কিন্তু তবু এর মধ্যে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীটিও আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। অপ্রত্যক্ষ অলৌকিকতায় অন্ধ বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে তিনি বিজ্ঞান-প্রতীতিকে স্থান দিয়ে তাঁর প্রগতিশীল জীবনবোধকেই উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন। কাহিনী-

বিন্যাসে এই জীবনবোধ সঞ্চারিত হয়েছে ব'লেই শিল্পের সুন্দর আর জীবনের শিব একাঙ্গ ও একাত্ম হয়ে উঠেছে।

"বিপরীত" গল্পে দাম্পত্য-জীবনে সন্দেহ এসেছে সংকীর্ণমনা পত্নীর পক্ষ থেকে। বিয়ের মাস দুই পরে পাকাভাবে স্বামীর ঘর করতে এসে পত্নী লতিকা দেখলে, তার স্বামীর সংসার-আকাশে সর্বক্ষণের ধ্রুবতারা হয়ে সমুদিত হয়ে আছে একুশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে—তারা। অসম্পর্কিতা এই মেয়েটি স্বামী নিশীথের সহচরী, তার শিল্পচর্চার সঙ্গিনী। নিশীথ ফুল ভালবাসে, তারা বাগানে ফুল ফোটাবার ব্যবস্থা করে; নিশীথ ছবি ভালবাসে, তারা চিত্রপ্রদর্শনী থেকে ভাল ভাল ছবি সংগ্রহ ক'রে আনে; নিশীথ গান ভালবাসে, তারা তাকে প্রতিসন্ধ্যায় গান শোনায়। বাস্তব জীবনে এই অপরূপ সখ্যসম্পর্ক দুর্লভ সন্দেহ নেই, বাণভট্টের কাদম্বরী কাহিনীর পত্রলেখার মতোই নিশীথের সংসারে তারার কল্পনা স্বপ্নাশ্রয়ী কবিমানসেরই একটি সুন্দর সৃষ্টি। কিন্তু লতিকা কাদম্বরী নয়, কাজেই তার মনে তারা-নিশীথের সম্পর্ক নিয়ে ঈর্ষা আর অসূয়া কুটিল সন্দেহের কালভুজঙ্গিনীতে রূপান্তরিত হ'ল। কঠোর নিষেধবাণীতে রুদ্ধ হ'ল পরিবারের সাবলীল গতি। বাগানে ফুল ফোটে না, সন্ধ্যায় গান হয় না, নতুন ছবির দেখা পাওয়া যায় না;—যে সময় এতদিন লঘুছন্দে চলছিল তার পায়ে যেন লোহার শিকল পড়ল। কিন্তু তবু লতিকা তারা ও নিশীথকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে না। বাইরে থেকে বাধা যত প্রবল হতে থাকে, অন্তরের ঘনিষ্ঠতা হয়ে ওঠে ততই দুর্বার। অবশেষে লতিকা এই সম্পর্কের স্থায়ী বিচ্ছেদকামনায় চরম অস্ত্রোপচারের আয়োজন করল। তার বাপের বাড়ির পাড়ার দুর্বৃত্ত যুবক কেশবকে এই হীন কাজে সে নিয়োজিত করলে। কেশব তারাকে এই সংসার থেকে অপহরণ ক'রে নিয়ে যাবে—এই হ'ল লতিকার কল্পনা। কিন্তু এই অশুভ চক্রান্তের ফল হ'ল ঠিক বিপরীত। পরের সর্বনাশ করতে গিয়ে লতিকা নিজেরই সর্বনাশ তার গৃহজীবনে ডেকে আনলে। কেশব সুযোগ বুঝে লতিকাকে নিয়েই গেল পালিয়ে। কল্পনাসমৃদ্ধ এই গল্পে আদর্শ ও বাস্তব, স্বপ্ন ও সত্যের বিপরীতধর্মিতার নিষ্ঠুর রূপটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু ছোটগল্পের শিল্পরীতির দিক দিয়েও

করছিল। অকস্মাৎ তাদের ভাগ্যাকাশে দেখা দিলেন আমেরিকা-প্রত্যাগত জ্যোতিষী বিমলানন্দ। বিজ্ঞাপন-মাহাত্ম্যে সুধাময়ের নিঃসংশয় বিশ্বাস হ'ল যে, বিমলানন্দের মুখনিঃসৃত বাণী ভ্রান্তিহীন। সুধাময়ের করকোষ্ঠী।বচার ক'রে মহাত্মা ব'লে দিলেন যে, সে বিবাহিত হয়েও নিঃসন্তান, সন্তান তার কখনোই হবে না। কন্যা করুণার কথা স্মরণ ক'রে সুধাময় তার প্রতিবাদ করতে চাইল, কিন্তু কোনোই ফল হ'ল না। জ্যোতিষী পুনর্গণনায় তার কোষ্ঠী ও ললাটলিপি পরীক্ষা ক'রে চূড়ান্ত রায় লিখে দিলেন, "আমার গণনায় কোনো ভুল নেই, তোমার ধারণায় ভুল।" জ্যোতিষে অন্ধ বিশ্বাসের অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে সুধাময়ের মনে স্থান পেল, স্ত্রীর প্রতি অবিশ্বাস ও তার চরিত্রে সন্দেহ। বিমলানন্দের বাণী মিথ্যা হতে পারে না, সুতরাং করুণা তার ঔরসজাত কন্যা নয়, অতএব তার স্ত্রী অসতী। এই সিদ্ধান্তে উদ্‌ভ্রান্ত সুধাময় ডেকে আনল তার জীবনের সর্বনাশ। এই পাপচিন্তায় বিষাক্ত স্বামীর ঘর করা কোনো আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্না স্ত্রীর পক্ষেই সম্ভব নয়, অরুণা তাই তার কন্যাকে নিয়ে চ'লে গেল ভাইয়ের কাছে লাহোরে। এক বৎসর পরে সেখান থেকে সংবাদ এল যে, কন্যা করুণা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। ইংরেজ ডাক্তারের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে যে, মেয়ের শরীরের একটি বিশেষ স্থানে একটা বিকৃতি আছে, তার ফলেই এই ক্ষয়রোগ। ডাক্তারের মতে বংশানুগত ভাবেই এই বিকৃতির উৎপত্তি, কিন্তু মায়ের দেহপরীক্ষায় এ জাতীয় কোনো বিকৃতি ধরা পড়ে নি, সুতরাং পিতার দেহেই তার অস্তিত্ব বর্তমান। বিজ্ঞানের এই নির্দেশের অনুসরণে সুধাময় নিজদেহের অনুরূপ বিকৃতি আবিষ্কার ক'রে এতদিনে তার বিমূঢ় বিভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন হ'ল। কিন্তু তখন নিয়তির বিধান অনিবার্য-ভাবেই নেমে এসেছে। তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তরূপে কন্যাকে চিরদিনের মতোই তাকে হারাতে হ'ল। এ গল্পে স্রষ্টার একটা বক্তব্য অবশ্যই আছে, কিন্তু তা গল্পসত্যকে অতিক্রম ক'রে আত্মপ্রকাশ করে নি ব'লেই গল্পরূপটি শিল্পসুন্দর হতে পেরেছে। কিন্তু তবু এর মধ্যে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীটিও আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। অপ্রত্যক্ষ অলৌকিকতায় অন্ধ বিশ্বাসের উর্ধ্বে তিনি বিজ্ঞান-প্রতীতিকে স্থান দিয়ে তাঁর প্রগতিশীল জীবনবোধকেই উজ্জ্বল ক'রে তুলেছেন। কাহিনী-

বিন্যাসে এই জীবনবোধ সঞ্চারিত হয়েছে ব'লেই শিল্পের সুন্দর আর জীবনের শিব একাত্ম ও একাত্ম হয়ে উঠেছে।

"বিপরীত" গল্পে দাম্পত্য-জীবনে সন্দেহ এসেছে সংকীর্ণমনা পত্নীর পক্ষ থেকে। বিয়ের মাস দুই পরে পাকাভাবে স্বামীর ঘর করতে এসে পত্নী লতিকা দেখলে, তার স্বামীর সংসার-আকাশে সর্বক্ষণের ধ্রুবতারা হয়ে সমুদিত হয়ে আছে একুশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে—তারা। অসম্পর্কিতা এই মেয়েটি স্বামী নিশীথের সহচরী, তার শিল্পচর্চার সঙ্গিনী। নিশীথ ফুল ভালবাসে, তারা বাগানে ফুল ফোটাবার ব্যবস্থা করে; নিশীথ ছবি ভালবাসে, তারা চিত্রপ্রদর্শনী থেকে ভাল ভাল ছবি সংগ্রহ ক'রে আনে; নিশীথ গান ভালবাসে, তারা তাকে প্রতিসন্ধ্যায় গান শোনায়। বাস্তব জীবনে এই অপরূপ সখ্যসম্পর্ক দুর্লভ সন্দেহ নেই, বাণভট্টের কাদম্বরী কাহিনীর পত্রলেখার মতোই নিশীথের সংসারে তারার কল্পনা স্বপ্নাশ্রয়ী কবিমানসেরই একটি সুন্দর সৃষ্টি। কিন্তু লতিকা কাদম্বরী নয়, কাজেই তার মনে তারা-নিশীথের সম্পর্ক নিয়ে ঈর্ষা আর অসূয়া কুটিল সন্দেহের কালভুজঙ্গিনীতে রূপান্তরিত হ'ল। কঠোর নিষেধবাণীতে রুদ্ধ হ'ল পরিবারের সাবলীল গতি। বাগানে ফুল ফোটে না, সন্ধ্যায় গান হয় না, নতুন ছবির দেখা পাওয়া যায় না;—যে সময় এতদিন লঘুছন্দে চলছিল তার পায়ে যেন লোহার শিকল পড়ল। কিন্তু তবু লতিকা তারা ও নিশীথকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে না। বাইরে থেকে বাধা যত প্রবল হতে থাকে, অন্তরের ঘনিষ্ঠতা হয়ে ওঠে ততই দুর্বার। অবশেষে লতিকা এই সম্পর্কের স্থায়ী বিচ্ছেদকামনায় চরম অস্ত্রোপচারের আয়োজন করল। তার বাপের বাড়ির পাড়ার দুর্বৃত্ত যুবক কেশবকে এই হীন কাজে সে নিয়োজিত করলে। কেশব তারাকে এই সংসার থেকে অপহরণ ক'রে নিয়ে যাবে—এই হ'ল লতিকার কল্পনা। কিন্তু এই অশুভ চক্রান্তের ফল হ'ল ঠিক বিপরীত। পরের সর্বনাশ করতে গিয়ে লতিকা নিজেরই সর্বনাশ তার গৃহজীবনে ডেকে আনলে। কেশব সুযোগ বুঝে লতিকাকে নিয়েই গেল পালিয়ে। কল্পনাসমৃদ্ধ এই গল্পে আদর্শ ও বাস্তব, স্বপ্ন ও সত্যের বিপরীতধর্মিতার নিষ্ঠুর রূপটি ফুটে উঠেছে। কিন্তু ছোটগল্পের শিল্পরীতির দিক দিয়েও

গল্পটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। অনিবার্য অথচ আকস্মিক বিদ্যুদ্‌-বিকাশের মতো কাহিনীর চরম শিখরে সত্যের আবরণ উন্মোচন ক'রে উপসংহার রচনার শিল্পরীতি এ গল্পে উল্লেখযোগ্য সার্থকতা লাভ করেছে।

"হন্তারপুর" গল্পে দাম্পত্য-জীবনের রস নিগূঢ়সঞ্চারী। সন্দেহের সূক্ষ্মসূত্রে এর কাহিনী বয়ন করা হয়েছে ব'লেই বাইরের জগতে তার কোনো স্থূল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নি, দেখা দিয়েছে মনোলোকের অগম গহন গোপন অন্ধকারে। পতিসোহাগিনী পত্নীর জীবনে অনুরাগের গভীরতার জন্যেই সন্দেহের সামান্য হেতুমাত্রেই বিক্ষোভ তীব্র ও অসহনীয় হয়ে উঠেছে। অসুস্থ জীবনে মানসবিরহের এই বৈরাগ্যের সঙ্গে মিশেছে স্বামীর দিক থেকে কল্পিত অদাক্ষিণ্য-চিন্তায় দুর্নিবার অভিমান। পারস্পরিক অনুরক্তি ও নিষ্ঠা সত্ত্বেও ঈর্ষাসঞ্জাত অভিমান যে কি ভাবে প্রাণঘাতী হতে পারে তারই একটি সার্থক মনস্তাত্ত্বিক আলেখ্য এই গল্পটি। বিনয় ও কমললতার দাম্পত্য-প্রণয়ে কোথাও খুঁত ছিল না। তাদের সুখের জীবনে কাল হয়ে এল প্লুরিসি রোগ। সেবা ও শুশ্রূষায় বিনয় সেই মারাত্মক রোগের আক্রমণ থেকে কমললতাকে সুস্থ ক'রে তাকে নিয়ে গেল দেওঘরের বম্পাস টাউনে। দেখতে দেখতে কৃশ পাণ্ডুর কমললতা আবার সেই আগেকার সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী হাস্যময়ী কমললতায় রূপান্তরিত হ'ল। কিন্তু এ সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হবার সুযোগ পেল না। ভাগ্যচক্রে বিড়ম্বিত এই দম্পতির জীবনে এল সুভদ্রা। শিক্ষিতা, সুন্দরী ও সুগায়িকা সুভদ্রা দেওঘরে এই প্রবাসী দম্পতির সঙ্গে দৈবযোগেই পরিচিত হ'ল। কমললতাকে সে গান শোনাত। সেই সূত্রেই বিনয়ের সঙ্গে হ'ল ঘনিষ্ঠতা; বিনয় শুধু কলারসিক নয়, সে ওস্তাদ গায়কও বটে। শিল্পক্ষেত্রে এই দুই শিল্পীর সান্নিধ্য কমললতাকে করল ঈর্ষান্বিত। দুই গুণীর কলারসজনিত আবিষ্টতাকে অনুরাগের স্বপ্নাবেশ ভেবে তার রজ্জুতে সর্পভ্রম হ'ল। কিন্তু অনুরক্তির অকৃত্রিমতার সুবাতাসে দাম্পত্য-জীবনাকাশের এই মেঘ উড়ে যেতেও বিলম্ব হ'ল না। দেওঘরের সুখের দিনগুলিকে পেছনে ফেলে তারা ফিরে এল কলিকাতায়। বছর দুই সুস্থ থেকে কমললতা আবার অসুস্থ হয়ে পড়ল কালব্যাধিতে।

নানা স্থানে বায়ুপরিবর্তন ক'রেও যখন কোনো ফলোদয় হ'ল না, তখন কমললতার ইচ্ছাতেই তারা পুনরায় গেল দেওঘরের সেই কমলকুঞ্জে। কিন্তু সেখানেও কমললতার জীবনদীপ ক্রমশ নির্বাণোন্মুখ হয়ে এল। মৃত্যু নিশ্চিত, শুধু দিন কয়েক অমানুষিক যন্ত্রণার এখনো বাকি। সেই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্যে বিনয় এক মিথ্যা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করল। জীবন ও জগৎ থেকে বিদায় নিতেই হবে, কিন্তু কমললতার সবচেয়ে মর্মান্তিক মনে হচ্ছিল স্বামীকে ছেড়ে যাবার বেদনা। সেই আসক্তির মূলেই বিনয় হানল প্রচণ্ড আঘাত। সে স্ত্রীকে জানাল যে, সুভদ্রা সম্পর্কে একদিন সে যে সন্দেহ করেছিল, তা মিথ্যা নয়; সত্যি-সত্যি সে অপরাধী। অব্যর্থ ফল ফলল। সেই রাতেই কমললতার মৃত্যু হ'ল। বিনয় ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে সব শেষ হয়ে গেছে। মৃত্যুপথযাত্রিণীকে যে শেষবারের মতো তার ভুল ভাঙিয়ে দেবে, সে সুযোগও সে পেল না। তারই অনুশোচনা নিয়ে বিনয়ের বিপত্নীক জীবন কাটে দেওঘরের সেই অভিশপ্ত গৃহে। তার ধারণা সে-ই কমল-লতাকে হত্যা করেছে, তাই কমলকুঞ্জের নামান্তর হয়েছে হন্তারপুর অর্থাৎ হত্যাকারীর গৃহ। দাম্পত্য প্রণয়কে আশ্রয় ক'রে এমন করুণমধুর আলেখ্য আমাদের সাহিত্যে খুব বেশি লেখা হয় নি, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক গল্প হিসাবে গল্পকার এখানেই এর উপসংহার রচনা করেন নি। কমললতার মৃত্যু বিনয়কে জীবন্মৃত ক'রে রেখে গেছে। রাত নটা বেজে দশ মিনিটে কমললতার মৃত্যু হয়েছিল, প্রত্যহ ঠিক সেই মুহূর্তে বিনয় ছাতে গিয়ে যেন কমললতাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'এখন বুঝেছ কমললতা, সেদিন মিথ্যে কথা বলেছিলুম?' কিন্তু কমললতার কাছ থেকে কি কোনো সাড়া আসে? মনে হয় হাওয়ায় যেন উত্তর ভেসে আসে, 'বুঝেছি।' বিনয়েরও প্রথম প্রথম এক-আধবার সে ভুল হয়েছে। কিন্তু পরে সে জেনেছে ওটা ইউক্যালিপ্‌টাস পাতার মর্মর। অর্থাৎ যে অপরাধ সে করেছে তার হাত থেকে তার মুক্তি নেই; সারাজীবনই তাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। কমললতার কাছে আর কোনদিনই সত্য কথাটিকে পৌঁছে দেওয়া যাবে না। এই মনস্তাত্ত্বিক ট্রাজেডির সূক্ষ্ম স্তরে উন্নীত হয়েই গল্পটি চরমোৎকর্ষ লাভ করেছে। "হন্তারপুর" উপেন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের পরিপক্ব কলাকুশলতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম কারুকার্যে উপেন্দ্রনাথ যেমন পারঙ্গম, তেমনি ঘটনাবিন্যাস-নৈপুণ্যেও তিনি সিদ্ধহস্ত। এই সংকলনে কয়েকটি গল্প আছে যা মুখ্যত কাহিনীরসাশ্রিত; ঘটনাসংস্থানের অভিনবত্বের জন্যই সেখানে গল্পরস ঘনীভূত হয়েছে। "পরাভব" ও "উট-রোগ,"—এই গল্প দুটি মূলত এই পর্যায়ভুক্ত। "পরাভব" গল্পটি রোমান্টিক, কিন্তু কোনো ভাব বা বিষয়কে অবলম্বন ক'রে তার রসকেন্দ্র গ'ড়ে ওঠে নি, গ'ড়ে উঠেছে একটি রহস্যাবৃত ঘটনাকে আশ্রয় ক'রে। একাধারে জমিদার ও ব্যারিস্টার প্রিয়শঙ্কর একমাত্র কন্যাকে সৎপাত্রস্থ ক'রে এবং একমাত্র পুত্রকে ব্যারিস্টারি পড়াতে বিলেত পাঠিয়ে নিঃসঙ্গ বিপত্নীক জীবন কাটাচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর এক বন্ধু বিলেত যাবার প্রাক্কালে তাঁর এক ভাইঝিকে তাঁর কাছে রেখে গিয়েছিলেন। এই ঘটনাকে আশ্রয় ক'রেই গল্প। মেয়েটির নাম উষা। কথা ছিল, মাস চারেক পরে উষার বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেলে তাকে কাকার কাছে বিলেত পাঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল যে, আদিতে যদিও প্রিয়শঙ্কর উষার ভার নিয়েছিলেন, কিন্তু এই মাস কয়েকের মধ্যে উষাই প্রিয়শঙ্করের সমস্ত সংসারের ভার সানন্দে বহন ক'রে চলেছে। এই অনাত্মীয় তরুণীটি তাঁর কন্যার স্থান অধিকার ক'রে তাঁর প্রতিমুহূর্তের অপরিহার্য পরিচালিকা হয়ে উঠেছে। ঘোড়া থেকে প'ড়ে চিরদিনের মতো খোঁড়া হওয়ার পর কাঠের ক্রাচ ছিল তাঁর চলার সম্বল। উষা আসার পর তার প্রয়োজনও ফুরিয়েছে। প্রিয়শঙ্করের একান্ত ইচ্ছা, অল্পদিনের মধ্যেই যখন তাঁর ছেলে বিলেত থেকে ফিরে আসবে তখন তার সঙ্গে উষার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে চিরদিনের মতো তিনি তাকে এ গৃহে বন্দিনী ক'রে রাখবেন। এখানে প্রিয়শঙ্করের একটি অনমনীয় পিতৃ-অভিমান আছে। তাঁর ছেলে বিনয় বিলেত যাবার কিছু পরে এক বেনামী পত্রে প্রিয়শঙ্কর জানতে পারেন যে, তাঁর অজ্ঞাতসারে বিনয় বিয়ে ক'রে গেছে। প্রিয়শঙ্কর পুত্রকে স্নেহ করেন, কিন্তু যদি এ সংবাদ সত্য হয় তা হ'লে পুত্রের এই অবাধ্যতার জন্য তিনি তাকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না, তাকে পরিত্যাগ করবেন। অভিযোগের উত্তরে বিনয় পরিষ্কার ক'রে কোনো

কথা লেখে নি, শুধু তার ফিরে আসা পর্যন্ত পিতাকে অপেক্ষা করতে অনুনয় করেছে। পিতৃত্বের অমোঘ শাসনদণ্ড নিয়ে স্নেহপরায়ণ বৃদ্ধ বিনয়ের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করছেন। যথাসময়ে সংবাদ এল, বিনয় রওনা হয়েছে। এদিকে ঘটনাচক্রে প্রিয়শঙ্কর জানতে পারলেন যে, উষা বিবাহিতা। ফলে তাঁর সমস্ত পরিকল্পনাই শুধু যে ব্যর্থ হ'ল এমন নয়, বিনয় আসার পর উষার এ বাড়িতে আর থাকা উচিত হবে না ভেবে তিনি তাকে বিলেতে কাকার কাছে পাঠাবার ব্যবস্থাই করলেন। অবশেষে হাওড়া স্টেশনে পুত্রকে আনতে গিয়ে সমস্তই ওলটপালট হয়ে গেল। তিনি জানতে পারলেন যে, উষাই তাঁর পুত্রবধূ। কিন্তু তখন শাসনের চেয়ে স্নেহই অনেক বড় হয়ে উঠেছে। গল্পশেষে ক্রাচের সঙ্কেতটি গল্পকে পূর্ণতা দিয়েছে। উষা চ'লে যাবার পর প্রিয়শঙ্কর তার চিরসম্বল কাঠের ক্রাচটিকে আশ্রয় ক'রে ছিলেন। স্টেশনে পুত্রের মুখে অপ্রত্যাশিত সংবাদ শুনে বিহ্বলতাবশে তাঁর হাত থেকে ক্রাচটা মাটিতে প'ড়ে গিয়েছিল। নিমেষের মধ্যে উষা ছুটে গিয়ে প্রিয়শঙ্করকে ধ'রে ফেললে। পর-মুহূর্তে দেখা গেল, তিনি উষার বাহুতে ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। ঘটনাসংস্থানের এই সূক্ষ্ম অন্তিম-ব্যঞ্জনায় গল্পটি একটি দুর্লভ শিল্পশ্রী লাভ করেছে।

"উট-রোগ" অবশ্য নিতান্তই গল্প। একটা প্রচলিত কিংবদন্তীর শিথিল কাঠামোর উপর ভিত্তি ক'রে একটি মনস্তত্ত্বসম্মত হাস্যরসাত্মক গল্প গ'ড়ে তুলে লেখক হয়তো মৌলিকতার দাবি করবেন না; কিন্তু ঘটনাবিন্যাস এবং রসপরিবেশনের দিক দিয়ে তাঁর সহজাত শিল্প-নৈপুণ্যকে রসিক পাঠক অবশ্যই সাধুবাদ দেবেন। দুশ্চিকিৎস্য রাজ-ব্যাধির অভিনব মানসচিকিৎসাই এই গল্পের হাস্যরসের অফুরন্ত প্রস্রবণরূপে দেখা দিয়েছে। প্রতিহার-বংশের খণ্ডরাজ্যের অধীশ্বর মহারাজ সূর্যপালের রাজপ্রাসাদে অনশনক্লিষ্ট দুঃসাহসী ব্রাহ্মণ দেবরাজ উপাধ্যায় আর তার কঙ্কালসার মৃতকল্প অশ্বরূপের আবির্ভাব যে কৌতূহলের সূচনা করে, রসনিষ্পত্তির চূড়ান্ত স্তর পর্যন্ত তাকে অব্যাহত রেখে লেখক নিতান্তই একটি গালগল্পকে সরস ছোটগল্পের পর্যায়ে উন্নীত করতে পেরেছেন। আয়ুর্বেদাচার্য রাজবৈদ্যগণের শাস্ত্রজ্ঞানের অগোচর উষ্ট্রিকা-দোষের আবিষ্কার যতই উদ্ভট ও আজগুবি

ব'লে মনে হোক না কেন, কাহিনীর সমস্ত অসম্ভাব্যতা একটি মনস্তাত্ত্বিক সত্যসূত্রে বিধৃত হয়ে আছে ব'লেই গল্পটি ছোটগল্প হতে পেরেছে। তা ছাড়া খনিগর্ভ থেকে উত্তোলিত হীরকখণ্ড যেমন দ্যুতিমান আত্মপ্রকাশের জন্য গুণী মণিকারের স্পর্শের অপেক্ষা রাখে, তেমনি আমাদের লোকজীবনে এই-জাতীয় এমন অনেক কাহিনী আছে যা আধুনিক শিল্পসম্মতরূপে সুমার্জিত ক'রে তুললে আমাদের গল্পসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এ দিক দিয়ে "উট-রোগ" গল্পটি একটি উল্লেখযোগ্য সফল পরীক্ষা হিসেবেও আদরণীয়।

৫

বিশুদ্ধ শিল্পীর একটি প্রধান ধর্ম হ'ল এই যে, কল্পনারাজ্যের অবাস্তবকে যেমন তিনি শিল্পসম্মত রূপদান করেন, তেমনি পরিদৃশ্যমান জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তবকেও তিনি শিল্পসম্মত রূপ দিয়েই সামাজিকের রসসত্রে পরিবেশন করেন। চলতি কালের প্রভাব শিল্পীর সূক্ষ্ম হৃদয়-যন্ত্রে ক্রিয়াশীল হবেই। সমাজ-জীবনের দেবাসুর-সংগ্রাম থেকে তাঁর চেতনাকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কিন্তু বিশুদ্ধ শিল্পের মায়াদর্পণে জীবনের যে রূপ প্রতিফলিত হয়, তাতে জীবন-সত্যের প্রকাশ থাকলেও জীবনের প্রচণ্ড আবেগ শিল্পের সৌন্দর্যস্নান ক'রে শান্ত ও সমাহিত মূর্তিতেই দেখা দেয়। চলতি কালের তরঙ্গবন্ধুর জীবনের এই শিল্পাভিরাম মূর্তি "সীমার সমস্যা," "কেউ কম নয়," "কম্যুনিস্ট প্রিয়া" এই তিনটি গল্পে রূপায়িত হয়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য, সমকালীন জীবনসমস্যা শিল্পিমানসে যে ভাবানুষঙ্গ রচনা করেছে, তারই তিনটি মুখ্য দিক এই তিনটি গল্পকে আশ্রয় করেছে। সেখানে লেখকের দৃষ্টি বা বক্তব্যও অস্পষ্ট থাকে নি; কিন্তু প্রচণ্ড জীবনাবেগকেও শিল্পরূপে আস্বাদন করার সাধনাই সেখানেও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"সীমার সমস্যা" গল্পে এ-যুগের ধনিক-শ্রমিক-সমস্যার মূলীভূত স্বরূপকে একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে পরিস্ফুট করার চেষ্টা হয়েছে। গল্পের তত্ত্বাংশ অবশ্য সমরেশের মুখে স্থাপন ক'রে লেখক বলছেন, 'আসল কথা, আমরা চাই পরিশ্রমের মর্যাদা যেন সর্বত্র সব সময়ে স্বীকৃত হয়; আর, এক শ্রেণীর পরিশ্রমের সঙ্গে অপর শ্রেণীর পরিশ্রমের যেন

একটা অসঙ্গত বিভেদ না থাকে।' কিন্তু সমাজতত্ত্বের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের সামঞ্জস্য ঘটে না ব'লেই দেখা দেয় সমস্যা। লেখকের কৌতুকাবহ সিদ্ধান্ত অনুসারে মানুষের মনে একই সঙ্গে বাস করে একটি ছাগ ও একটি বাঘ। যতক্ষণ ছাগ-সত্তা প্রবল, ততক্ষণ সে অন্যের দ্বারা অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত; কিন্তু যখন ব্যাঘ্র-সত্তার আত্মপ্রকাশ ঘটে, তখন সেই হয় অত্যাচারী ও লাঞ্ছনাকারী। নেওয়ালাল সুপারভাইজার-রূপে যতদিন শ্রমিক শিল্পী ও কর্মচারীদের অন্যতম ছিল ততদিন সে ছিল শোষিত ও নির্যাতিতদেরই একজন; কিন্তু যেদিন সে অন্যের চাকরি ছেড়ে নিজেই লৌহকারখানার মালিক হয়ে উঠল সেদিন তার স্বর্ণাঙ্কিত পথে তার বিগতদিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী দেওনন্দন সহায়ই হয়ে উঠল তার পরমবৈরী। এ গল্পে অজ-ব্যাঘ্রতত্ত্ব শুধু যে শিল্পসম্মত তির্যকভাষণেরই উপযোগী হয়েছে তাই নয়, অর্থ এবং অনেক লোভ মানুষের মনোলোকে যে পরিবর্তন আনয়ন করে তার রহস্যোন্মোচনও বিশেষ উপাদেয় হয়ে উঠেছে।

"কেউ কম নয়" গল্পটি বিহারের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা। নোয়াখালির প্রত্যুত্তরে তখন বিহারের কয়েকটি জেলায় চলছিল অমানুষিক নরহননের পৈশাচিক প্রতিহিংসা। মেয়েরা কিন্তু দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে ছিল মেয়েদের স্বপক্ষে। এমনি দিনে একটি তরুণ মুসলমান-দম্পতি—আবদুল রসিদ আর জেহেনারা—দাঙ্গাবাজদের হাতে তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল হিন্দু দেওনন্দন সিং-এর গৃহে। বাড়িতে তখন পুরুষ ছিল না কেউ, গোয়াল-ঘরে ধোঁয়া দিতে গিয়ে তাদের দেখতে পায় দেওনন্দনের স্ত্রী জান্‌কী। মুসলিম-দম্পতি ধরা প'ড়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে তার শরণাগত হ'ল। শরণাগতকে সর্বভাবে আশ্রয় দান করা গৃহস্থের ধর্ম, সুতরাং জান্‌কী তাদের প্রতিশ্রুতি দিলে। এবং তারই প্রেরণায় দেওনন্দন দাঙ্গাবিধ্বস্ত পথের উপর দিয়েই তাদের গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দিতে গেল। নিরাপদে সে ফিরে এল বটে, কিন্তু প্রাণদাতার প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে জেহেনারা নিজের মাথায় লাঠির আঘাত নিল ব'লেই তা সম্ভব হয়েছে। কৃতজ্ঞতাভরে জান্‌কী ভগবানের কাছে জেহেনারার কল্যাণ কামনা করল। এ গল্পে অপরিম্লান আদর্শ-বাদের স্পর্শ লেগেছে। নারীর কল্যাণী-মূর্তির বন্দনায় লেখকের বাণী

এখানে আবেগোচ্ছ্বসিত। মহৎ সাহিত্যের বাণী জীবনের অন্ধকার-পথে চিরদিনই এমনি মঙ্গলালোক প্রোজ্জ্বল ক'রে তোলে।

"কমিউনিস্ট প্রিয়া" গল্পে লেখক এ-যুগের রাজনৈতিক দলাদলিকে রোমান্টিক প্রেমকাহিনীর উপচাররূপে ব্যবহার করেছেন। সুকুমার রায়ের সঙ্গে কমলার বিবাহে বাধা সৃষ্টি করল উভয়ের রাজনৈতিক মতবাদ। সুকুমারের পারিবারিক ঐতিহ্য কংগ্রেসপন্থী, আর কমলা যে পরিবারের কন্যা সেখানে কম্যুনিস্ট-পার্টির প্রতি আনুগত্য একটু উগ্রভাবেই সক্রিয়। উভয় দিক থেকে সম্মুখ-সংগ্রাম শুরু হ'ল নির্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ দুই পক্ষের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীকে নিয়ে। কমলার অভিভাবকগণের শর্ত হ'ল, কমলাকে পেতে হ'লে সুকুমারকে ষোলো আনা আত্মসমর্পণ করতে হবে। অগত্যা সুকুমার তাতেই সম্মত হ'ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, আত্মসমর্পণের দ্বারাই সে প্রতিপক্ষকে জয় ক'রে নিয়েছে। অবশ্য সহৃদয় পাঠকের কাছে কার জয় হ'ল, কিংবা কোন্ পদ্ধতির, অথবা লেখকের সহানুভূতি বা প্রবণতা কোন্ দলের প্রতি—এ সব প্রশ্ন অবান্তর। বাস্তব জীবনে যা মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে বিষজর্জর ক'রে তোলে লেখক তাকেই মধুস্বাদী রোমান্সের বিষয়ীভূত করেছেন। শিল্পদৃষ্টির এই অনাসক্তিযোগে সহজসিদ্ধ ব'লেই উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যে জটিল জীবন-গ্রন্থির রসমুক্তি অমন সাবলীল হতে পেরেছে।

৬

কথাশিল্পীর শক্তিপরীক্ষার একটা বড়ো দিক হ'ল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র-সৃষ্টিতে। সংসার-রঙ্গমঞ্চে জীবন-নাট্যের যে নিত্য অভিনয় চলছে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তার কুশীলবেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রতীক-ধর্মী। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে, জগতে কোনো দুটি চরিত্রই অবিকল এক নয়। এই ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য যে শিল্পীর হাতে যতটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, স্রষ্টাহিসাবে তাঁকেই ততটা উৎকর্ষের অধিকারী ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে। চরিত্র-দৃষ্টিতে উপেন্দ্রনাথের শক্তিমত্তার বিশেষ সাক্ষ্য বহন করছে বর্তমান সংকলনে তিনটি গল্প—"নাস্তিক", "সারদা মাতাল" ও "নিবারণ বাঁড়ুজ্জে"।

"নাস্তিক" গল্পে নিরীশ্বর উমাশঙ্কর পৃথিবীর সব নাস্তিকের সগোত্র হয়েও আপন যুক্তি ও ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠতায় একটি বিশেষ মানুষ। কলেজে পড়ার সময় সহপাঠীদের নিয়ে সে 'নিরীশ্বর সঙ্ঘ' খুলে বসেছিল। সংসার-আশ্রমে প্রবেশ ক'রে সহপাঠীদের প্রায় সবাই সে সঙ্ঘের সংস্রব পরিত্যাগ ক'রে প্রসন্নচিত্তে ঈশ্বরের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছে, কিন্তু উমাশঙ্কর শুধু যে তার বিশ্বাসে অবিচলিতই আছে তাই নয়, সে বিশ্বাসকে সে জ্ঞানমার্গের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলেছে। কলেজ-জীবনে জননী সারদেশ্বরী পুত্রের মতিপরিবর্তনের জন্য কুলগুরুর শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু ন্যায় ও বৈশেষিক, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল নিয়ে বিচার-বিতর্কে গুরু তাঁর গুরুত্ব কোনো দিকেই প্রমাণ করতে পারেন নি ব'লে জননীর চেষ্টা ফলবতী হয় নি। জননীর লোকান্তর-প্রাপ্তির পর সংসারের ভারসাম্য রক্ষা ক'রে চলেছে স্ত্রী মন্দাকিনী। উমাশঙ্কর চলে জ্ঞানের কঠিনপথে, আর মন্দাকিনী চলে বিশ্বাসের সহজপথে। মন্দাকিনীর দিদি আমোদিনীর ধারণা, উমাশঙ্কর দিন দিন যে ভাবে প্রবল নাস্তিক হয়ে উঠছে তাতে একদিন ভগবানই তাকে এসে দেখা দেবেন। অবশেষে ভগবানবেশী এক পুরুষ উমাশঙ্করকে এসে দেখা দিলেন। শ্যালিকার পরিহাসকাণ্ড ভেবে উমাশঙ্কর ভগবান-নামধারীর সঙ্গে রসিকতা করেছিল। কিন্তু উমাশঙ্কর-প্রস্তাবিত অগ্নি-পরীক্ষায় সম্মত হয়ে যখন তিনি প্রজ্বলিত দীপশিখায় অনায়াসে অঙ্গুলি স্থাপন করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অগ্নিশিখা জল হয়ে ঝ'রে পড়তে লাগল, তখন উমাশঙ্কর বিস্মিত ও বিচলিত না হয়ে পারে নি। তারপর ভগবান তাকে বিশ্বরূপ দেখালেন। আসলে কিন্তু এটি একটি স্বপ্ন। তবু অবচেতন মনে তার অগোচরে দুর্বলতা প্রবেশ করেছে মনে ক'রে উমাশঙ্কর সাংখ্যদর্শন খুলে বিচারে বসল। পাঠ আরম্ভ করার পূর্বে সে মনে মনে বললে, হে ভগবান, সত্যিই যদি তুমি থাক, তা হ'লে আমার মনে পরিপূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন করার পূর্বে আমার মনকে দুর্বল ক'রো না। গল্পটি সুরচিত সন্দেহ নেই, কিন্তু স্বপ্নের মধ্য দিয়ে উমাশঙ্করের জীবনে ভগবানের আবির্ভাবের কল্পনাটি শিল্পকুশলতার দিক দিয়েও যেমন চিত্তচমৎকার হয়েছে, মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়েও তেমনি হয়েছে সার্থক ও স্বাভাবিক।

ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে "সারদা মাতাল" গল্পটি যেন আরও

বাস্তব আরও উজ্জ্বল। এণ্ট্রান্স পাস ক'রে ফার্স্ট আর্টস পড়তে পড়তে এক শুভদিনে সারদা হালদার একসঙ্গে রেলকর্মচারী-দুহিতা আর রেলের চাকরি নিয়ে গার্হস্থ্য-জীবন শুরু করেছিল। বছর পনের পরে যখন লেখক তার জীবনের যবনিকা আবার তুলে ধরলেন, তখন সে আত্মারামকে সওয়া তেরো আনার সিন্নি চড়িয়ে দানাপুর থেকে পাটনায় বন্ধুসঙ্গমে বেরিয়েছে। সারাদিন সৎসঙ্গে কাটিয়ে রাত নটায় ঘরে ফেরার পর তার লাঠি আর স্ত্রী কাদম্বিনীর ঝাঁটায় যে লড়াই চলে, সে অবশ্যকৃত্য শেষ ক'রে তার পর্বদিনের কর্মতালিকা সমাপ্ত হয়। নিঃসন্তান সংসারে কাদম্বিনীকে নিয়ে মদ আর দাবা খেলে বেশ ভালই চলছিল, বৎসর দুই পরে সারদা তার অফিসে এক অভাবনীয় কাণ্ড ক'রে বসল। আগের দিনের মাত্রাটা একটু অতিরিক্তই হয়ে পড়েছিল, কাজেই অফিসে গিয়েও মেজাজটা বেশ একটু রঙিলা হয়েই ছিল। নতুন সাহেব হ্যামিণ্টনের সঙ্গে তাই নিয়ে বচসা, এবং তারই পরিণামে সাহেবকে জড়িয়ে ধ'রে চুমু খেতে গিয়ে খেল পেটে এক প্রচণ্ড ঘুষি। কোনো রকমে প্রাণটা সে যাত্রা রক্ষা পেল এবং হাফ-পেন্‌শনের ব্যবস্থা ক'রে দিলে চাকরি ছেড়ে। অবসর গ্রহণের পর সপ্তাহে সাত দিনই ছুটির দিন, কাজেই তার নিত্যকার কর্মতালিকা হ'ল প্রত্যুষে সারাদিনের আহারকৃত্য শেষ ক'রে এক্কাসহযোগে দানাপুর থেকে মুরাদপুরে যাত্রা, সেখানে রাত নটা পর্যন্ত দাবার আড্ডা জমিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন। পথে ঝিমিয়ে-পড়া ক্লান্ত দেহকে পুনরায় সজীব ক'রে তোলার জন্য মদ্যপান এবং তারই মাহাত্ম্যে গৃহে ফিরে পত্নীর উপর বীরত্ব প্রকাশ। বলাই বাহুল্য, এত সৌভাগ্য পত্নী কাদম্বিনীর সহ্য হ'ল না, সে পটল তুলল। সারদা কিন্তু সত্য সত্যই পত্নীপ্রেমিক ছিল, বিপত্নীক হয়ে সংসার-বৈরাগ্য দেখা দিল তার, কাশীবাসী হয়ে সাধুসঙ্গ করার জন্য সে গৃহত্যাগী হ'ল। সারদার জীবননাট্যের শেষ দৃশ্যে আবার যখন যবনিকা উঠল, তখন কাশীতে নয়—তাঁর সেই চিরদিনের আস্তানায় আধ-খোলা দাবাবোড়ের ছকের উপর সে তন্ময় হয়ে আছে। ছকের অপর দিকে নতমুখী এক সুন্দরী তরুণী। কাশীতে মাসীমার দেওরঝি হেমাঙ্গিনী দাবাখেলায় গজের চালে কিস্তিমাৎ ক'রে সারদাকে জয় করেছে। হেমাঙ্গিনী হুঁশিয়ার মেয়ে, বিয়ের আগে সারদাকে দিয়ে বিশ্বেশ্বরের

কাছে সুরা উৎসর্গ করিয়ে নিয়েছে। এবার থেকে দাবার আড্ডায় আর সে একা বেরোবে না, তার দোসর হবে হেমাঙ্গিনী। সমাজ-জীবনে যেমন সাহিত্য-সংসারেও তেমনি—মাতালের অভাব কোথাও নেই। কিন্তু সাহিত্যের মাতাল-সমাজে "সারদা মাতাল" যে তার অনন্যপরায়ণতায় বিশিষ্ট আসনের অধিকারী হয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

মাতালের মতো কৃপণ ধনীও সাহিত্য-সংসারের স্থায়ী অধিবাসী। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের "নিবারণ বাঁড়ুজ্যে"র মতো অদ্ভুত কৃপণ অন্তত বাংলা-সাহিত্যে আর নেই। বাগবাজার অঞ্চলে কার্পণ্যগুণে নিবারণ বহুনামা। সূর্যের অষ্টনামের মত তারও নামাবলী দিয়ে নামাষ্টক তৈরি হয়েছে। সবার ধারণা, তার নাম উচ্চারণ করতে নেই, তার মুখ দর্শন করতে নেই; তাই ভোরের দিকে সবাই তাকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলে। তাদের মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম হ'ল পতিতপাবন। সে প্রত্যহ ভোরে নিবারণের বৈঠকখানায় এসে হাজির হয়, এবং সস্তা দামের একখানা বিস্কুট-সহযোগে যথাসম্ভব অল্প চিনি ও দুধ দিয়ে প্রস্তুত এক কাপ চা পান ক'রে নিবারণের সঙ্গে প্রাতর্ভ্রমণে বেরোয়। পথ চলতে চলতে নিবারণের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করে। জীবন সম্পর্কে নিবারণের ধারণা ও বিশ্বাস তার চরিত্রেরই মহিমাজ্ঞাপক। তার দৃষ্টিতে চায়ের মতো উপকারী পানীয় আর নেই। আধ পয়সার বিস্কুট-সহযোগে ভোরে এক কাপ চা খাওয়া গেল। বাস্, একেবারে বেলা বারোটা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। ক্ষিধের নামগন্ধ নেই, আর ক্ষিধে না থাকা মানেই ভরাপেট, আর ভরাপেট মানেই বলবৃদ্ধি; অতএব চা বলবৃদ্ধিকারক। তার পথ চলার নীতি হ'ল, কাঁচা পথ পেলে পাকা রাস্তা দিয়ে চলবে না, আর ঘাস পেলে কাঁচা পথ মাড়াবে না, কারণ তাতে প্রত্যহ অন্তত আধ পয়সার ক্ষয় থেকে জুতো রেহাই পাবে। নিবারণের মতে, বাড়ির বাইরে বেরোবার সময় সঙ্গে মনিব্যাগ রাখা অপরাধ; কেননা তাতে তিন দিক থেকে অনিষ্ট-সম্ভাবনা দেখা দেয়—পিকপকেট হতে পারে, পথ চলতে চলতে কিছু কেনার লোভ হতে পারে, ক্লান্ত হ'লে ট্রামে চড়ার দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। নিবারণ-চরিত্রের পরিস্ফুরণে আর উদাহরণ সংগ্রহের প্রয়োজন হয় না। কৃপণের আর একটি বৈশিষ্ট্য

পেটুকতাও নিবারণ-চরিত্রে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। নিমন্ত্রণ-গৃহে আকণ্ঠ ভোজনের আকর্ষণ তার কাছে দুর্দমনীয়। কিন্তু এসব সত্ত্বেও নিবারণের আছে আর একটি সত্তা। স্বভাবকৃপণ এই মানুষটির অন্তরে আছে আর একটি মানুষ যে সহৃদয় ও সহানুভূতিশীল, দয়ালু ও পরদুঃখকাতর। সমাজে সবার সামনে সে কৃপণের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে দরিদ্র ও বিপদগ্রস্তের সব চেয়ে অকৃত্রিম বন্ধু ও সহায়। পিতৃশ্রাদ্ধের জন্যই হোক, আর কন্যাদায় থেকে উদ্ধারের জন্যই হোক, তার কাছে টাকা চাইতে গেলে বিপন্ন প্রার্থীকে লাঞ্ছিত হয়ে ফিরে আসতেই হবে। কিন্তু সেই আবার পতিতপাবনের বেনামে যার যা প্রয়োজন তার কাছে সেই টাকা পৌঁছে দিচ্ছে। লোকে তার কাছে বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে গিয়ে চরম ঘৃণা ও বিদ্বেষে তার নামে নিন্দা ছড়ায়। তাতেই নিবারণ এক অদ্ভুত আনন্দ অনুভব করে। এই আশ্চর্য মানুষটিকে চেনে তার স্ত্রী সুধাময়ী। তার কাছেই নিবারণ তার অন্তরকে উদ্‌ঘাটিত ক'রে বলে, 'লোকের দুঃখ-কষ্ট দেখে-শুনে আর ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে ইচ্ছে করে না।' মানুষের দুঃখ-কষ্টে এই ভাবে যে কাতর হয়, লোকসমাজে সে-ই যেচে কৃপণতার দুর্নাম কুড়িয়ে বেড়ায়—এমন মানুষ উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনাতেও সুলভ নয়।

৭

এই উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনা ও কবিত্বকলাই উপেন্দ্রনাথকে বাংলার কথা-সাহিত্যে তাঁর নিজস্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বামাবর্ত বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের কুরূপতা ও কদর্যতা, নগ্নতা ও বীভৎসতার সন্ধান করা তাঁর কবি-স্বভাবের বিরোধী। মানুষের প্রতি প্রেমে ও বিশ্বাসে তিনি অচলপ্রতিষ্ঠ। জীবনের মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে তাঁর প্রাণচেতনা পরিপূর্ণ হয়ে আছে। জীবনের মহত্ত্ব ও মহিমার প্রতি এই অটুট বিশ্বাসই উপেন্দ্রনাথের সাহিত্যের মুখ্য ফলশ্রুতি। তাই লোকসমাজে যে কৃপণের শিরোমণি, তারই বাহ্যিক নির্মমতার অন্তরালে তলিয়ে গিয়ে তিনি করুণার অফুরন্ত ফল্গুধারাকে আবিষ্কার করেন। আমাদের গৃহজীবনে যেখানে ঈর্ষা ও সন্দেহ, অবিশ্বাস ও সংশয় মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়ায় সেখানে ত্যাগে ও নিষ্ঠায়, সেবা ও তিতিক্ষায় জীবনের কল্যাণী-মূর্তির পরিচয়কেই

তিনি সামাজিকের কাছে উজ্জ্বল ক'রে তোলেন। এদিক দিয়ে তাঁর "পরিচয়" গল্পটি মহত্তর ব্যঞ্জনায় শুধু তমিস্রারই অন্তরের সত্যপরিচয় বহন ক'রে আনে নি, উপেন্দ্রনাথেরও শিল্পলক্ষ্মীর শাশ্বত পরিচয় ব'য়ে এনেছে। চিরন্তনী পুত্রবধূর প্রতি চিরন্তনী শাশুড়ীর অবচেতন ঈর্ষাই এ গল্পের বিষয়বস্তু। পিতার উইলকে আশ্রয় ক'রে মাতাপুত্রের মধ্যে যে দুর্নিরীক্ষ্য ব্যবধান রচিত হয়েছিল, পুত্র যখন মায়ের পছন্দের বিরুদ্ধে নিজেই নিজের পাত্রী নির্বাচন ক'রে বসল তখন কেশাগ্র-সূক্ষ্ম একটা অভিমানের মধ্য দিয়ে সেই ব্যবধান দিনে দিনে বাড়তে লাগল। তারপর শুরু হ'ল সংসারের কর্তৃত্ব নিয়ে বধূর সঙ্গে শাশুড়ীর অহংসৃষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ব্যক্তিত্বশালিনী সুশিক্ষিতা বধূ সংসারে নিজের আসন সহজেই দখল ক'রে নিলে। কিন্তু কর্ত্রীত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে সম্মানের রত্ন-বেদিকাও জননীর পক্ষে দুর্বিষহ হ'ল। তাঁর মনে হ'ল, এ সংসারে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়েছে, মানে মানে স'রে পড়াই ভাল। কাশীতে স্বেচ্ছানির্বাসনই তিনি বেছে নিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বধূর কল্যাণী-মূর্তিরই হ'ল জয়। শাশুড়ী তাঁর ভুল বুঝতে পেরে পুত্রের সংসারে জননীর আপন আসনটিতে ফিরে এলেন। উপেন্দ্রনাথের নিপুণ তুলিতে আমাদের পরিবার-জীবনের অন্তরঙ্গ চিত্রটি স্বভাবতই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে, "পরিচয়" গল্পে সে চিত্র যেমন স্বাভাবিক, তেমনি প্রাণস্পর্শী হয়েছে।

সংসার-চিত্রেরই আর একটি দিক "হেমাঙ্গিনীর সুটকেস" গল্পে করুণ-বাৎসল্যে অপরূপ হয়ে উঠেছে। এ গল্পে উপেন্দ্রনাথ শুধু কবি ও দরদীমাত্রই নন, এখানে কথাশিল্পী চিরন্তন জীবনশিল্পী হয়ে উঠেছেন। একটা সামান্য খেয়াল বা 'হবি'কে আশ্রয় ক'রে মাতৃহৃদয়ের গভীরতম রহস্য-উন্মীলনে এখানে উপেন্দ্রনাথের শিল্পসাধনা অসামান্যতা লাভ করেছে। হেমাঙ্গিনীর একটা আবাল্য শখ বা খেয়াল ছিল পুতুলের সাজসজ্জা সংগ্রহ করা। বিবাহিত জীবনে দুর্ভাগ্যবশত ছাব্বিশ বৎসর পেরিয়েও সে নিঃসন্তানা। কিন্তু তার সুটকেস পূর্ণ হয়ে আছে শিশুদের ব্যবহারের উপযোগী জিনিসপত্রে। খুকীর জন্য ফ্রক, খোকার জন্য কোট; খুকীর জন্য ডলি-পুতুল, খোকার জন্য ঠেলাগাড়ি; খুকীর রিবন, খোকার বেল্ট। এ সব স্বতন্ত্র প্রয়োজনের বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদি তো আছেই,

তদুপরি জাঙ্গিয়া, বীভ, অয়েল ক্লথ, ফিডিং বট্‌ল, বেবি-সুদার, ঝুনঝুনি, ঝিনুক প্রভৃতি সাধারণ সামগ্রীরও অন্ত নেই। অর্থাৎ মাতৃত্বের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষারাশি হেমাঙ্গিনী পুঞ্জীভূত করেছে তার সুটকেসে। অবশেষে দৈবক্রমে তার অন্তরের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাই যেন হ'ল জয়যুক্ত, তার কোলে এল সন্তান। কিন্তু তার কামনার মধ্যেই তার জীবনের ট্রাজেডির বীজ বুঝি লুকিয়েছিল। শিশুর সাত মাস বয়সে হ'ল কঠিন অসুখ। জীবনের আশা যখন প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে তখন হেমাঙ্গিনীর নিজেরই মনে হ'ল, সেই তো তার শিশুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। সে তো তার সন্তানের জন্য সাত মাসেরই সব ব্যবস্থা পূর্ণ ক'রে রেখেছে। তার সুটকেসে তার সংগৃহীত সামগ্রীর মধ্যে তার পরের তো কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই খুকু স্বপ্নে তাকে যেন ব'লে গেল, 'মা, তোমার সুটকেসে আমার কাপড় শেষ হয়েছে, এবার আমি চললাম।' মাতৃহৃদয়ের এই মর্মান্তিক চেতনায় গল্পটিতে করুণরস উৎসারিত হয়েছে। মায়ের কোলে শিশুর মৃত্যুকে আশ্রয় ক'রে করুণ-বাৎসল্যের এমন চিত্র বাংলা-কথাসাহিত্যে আর আছে ব'লে আমাদের জানা নেই। তা ছাড়া মনোবিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত অবচেতনাবাদ শিল্পলোকে যে কি অপরূপ মূর্তি পরিগ্রহ করতে পারে "হেমাঙ্গিনীর সুটকেস" তারও একটি দুর্লভ নিদর্শন। জীবনের হাসিকান্নার গভীরতম স্তরে তলিয়ে গিয়ে মর্মবিদারী বেদনার মধ্যে জীবনসত্যকে উপলব্ধি করা এবং সাহিত্যে তাকে শিল্পসুন্দর ক'রে প্রকাশ করার যে মহৎ সাধনা, উপেন্দ্রনাথ যে সেখানেও চরম সিদ্ধির অধিকারী হয়েছেন "হেমাঙ্গিনীর সুটকেস"ই তারই অন্যতম সার্থক উদাহরণ।

বঙ্গবাসী কলেজ
চৈত্র, ১৩৬১

জগদীশ ভট্টাচার্য

বিভ্রম

১

প্রথম চাকরি পাইলাম শিমলা পাহাড়ে।

বিবেচনা এবং পরামর্শ উভয়েই উপদেশ দিল, অজ্ঞাত বিদেশের হালচাল একটু না বুঝিয়া প্রথমবারেই সদ্যঃপরিণীতা স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া সমীচীন হইবে না। 'পথি নারী বিবর্জিতা'র দিন অবশ্য গত হইয়াছে। তথাপি সুন্দরী তরুণী স্ত্রী সুদীর্ঘ পথে বিপজ্জনক না হইলেও সুবিধাজনকও নহে। কারণ তাঁহার সমস্ত ভার আমাকে বহন করিতে হইবে; মায় কলিকাতা হইতে শিমলা এগারো শত মাইল পথ তাঁহাকে নিরাপদে লইয়া যাইবার দায়িত্বের মানসিক ভার পর্যন্ত। কিন্তু আমার দিকের কোন ভার, এমন কি আমার ছাতাটির ভারও, তাঁহাকে বহিতে দেওয়া শোভন হইবে না।

স্ত্রী কিন্তু ধরিয়া বসিলেন, তাঁহাকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে হইবে।

কহিলাম, প্রস্তাবটা খুবই উৎসাহোদ্দীপক, কিন্তু যা-হয় একটা গৃহের ব্যবস্থা না করিয়া গৃহলক্ষ্মীকে লইয়া গিয়া রাখিব কোথায়?

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি থাকবে কোথায়?"

"আমি?—আমি প্রথমে গিয়ে সরকারী ব্লকে উঠব। তারপর তোমার থাকবার মতো একটা বাড়ি ঠিক করব।"

"কত দিন লাগবে? ছ মাস?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম, "ক্ষেপেছ? ছ মাসে তো আমার কলকাতায় ফিরে আসবার সময় হবে। মাসখানেকের মধ্যে ঠিক করব।"

প্রসন্নমুখে স্ত্রী কহিলেন, "আর সঙ্গে-সঙ্গে আমাকে নিয়ে যেতে হবে।"

কহিলাম, "তথাস্তু।"

২

তখন এপ্রিল মাসের প্রথম। দুর্জয় শীত। আপিসের পরিশ্রম হইতে যেটুকু অবসর পাইতাম, সেটুকু পুস্তক পাঠ করিয়া এবং বাড়িতে পত্র

লিখিয়া কাটাইতাম। শিমলার প্রশান্ত এবং বিরাট সৌন্দর্য আমার চক্ষে ঠিক ভাল লাগিত না; তাহার গুরুত্ব এবং গাম্ভীর্য যেন আমার হৃদয়কে চাপিয়া ধরিয়া থাকিত। বক্রগতিতে পার্বত্য পথ চলিয়া গিয়াছে, তাহার উপর দিয়া উটের শ্রেণী এবং বয়েল গাড়ি চলিয়াছে; চালকদের গম্ভীর বদন এবং বৃহৎ দেহ দেখিয়া আমার মনে হইত, যেন কোন রঙ্গালয়ে উপবেশন করিয়া প্রবাস-দৃশ্য দেখিতেছি। আমিও যে সেই দৃশ্যের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রাণী তাহারই মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছি, তাহা ঠিক অনুভব করিতে পারিতাম না। ধূমাস্পষ্ট গিরিশ্রেণীর দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে যেন দেখিতাম, পর্বত এবং উপত্যকা ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গিয়া তৎপরিবর্তে কলিকাতার একটি জনাকীর্ণ পল্লী প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল; সেই পল্লীর মধ্য দিয়া একটি সংকীর্ণ গলি এবং তাহার পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকার গবাক্ষে দুইটি উৎসুক চক্ষু। কিন্তু সে ক্ষণিকের মোহ। রিক্‌শার শব্দে চমকিত হইয়া দেখিতাম, সেই পর্বত এবং সেই উপত্যকা তাহাদের গাম্ভীর্য এবং নির্জনতা লইয়া প্রকাশ রহিয়াছে। কোথায়ই বা কলিকাতার গলি এবং কোথায়ই বা উৎসুক দুইটি চক্ষু! একটি তপ্ত দীর্ঘশ্বাস শিমলার শীতবায়ুতে মিশিয়া মিলাইয়া যাইত।

সেদিন রবিবার। অপিসের উপদ্রব ছিল না। ভৃত্য টেবিলের উপর চায়ের পেয়ালা রাখিয়া গেল। সেই তপ্ত তরল পদার্থটুকু নিঃশেষ করিবার পর কি করিয়া সময় নষ্ট করিব মনে মনে চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে শুনিলাম—"বাবুজী, ফুল।"

চাহিয়া দেখিলাম, ফুলের গুচ্ছ হস্তে লইয়া একটি পাহাড়ী বালিকা আমার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহার পরনে নীল বর্ণের পায়জামা এবং কুর্তি এবং গাত্রে একখানি পীত বর্ণের অঙ্গাবরণ। বিসদৃশ পরিচ্ছদের মধ্য হইতে সবল সুগঠিত দেহ এবং সরল সপ্রতিভ মুখ সুন্দর দেখাইতেছিল। তাহার বয়স ষোল-সতের বৎসরের অধিক হইবে না।

তাহার হস্ত হইতে ফুলের গুচ্ছটি লইয়া দেখিলাম, পাহাড়ী গোলাপ এবং ফার্ন দিয়া প্রস্তুত। টেবিলের উপর তোড়াটি রাখিয়া মনিব্যাগ হইতে একটি দুয়ানি লইয়া বালিকাকে দিলাম। বালিকা দুয়ানি

দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। আমাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিয়া বলিল, "বাবুজী, ইহার মূল্য এক পয়সা মাত্র। আপনি আট পয়সা দিতেছেন!"

তাই ত! দর-দস্তুর না করিয়া একেবারে আট পয়সা দেওয়া উচিত হয় নাই। কিন্তু একবার দিয়া ফিরাইয়া লইতেও ইচ্ছা হইল না। বলিলাম, "তা হোক, তুমি আট পয়সাই লও।"

কিন্তু সে কিছুতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। অন্যায় মূল্য সে কিছুতেই গ্রহণ করিবে না। অগত্যা একটা রফা করিতে হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি দুয়ানিটি লইয়া যাও, তাহার পরিবর্তে আমাকে আট দিন ফুল দিয়া যাইও।"

আমার প্রস্তাব তাহার মনঃপূত হইল। "অচ্ছী বাৎ"—বলিয়া দুয়ানিটি লইয়া সে চলিয়া গেল।

৩

পরদিন হইতে প্রত্যহ প্রাতে বালিকাটি ফুল দিতে আসিত। আমাকে যেদিন সম্মুখে পাইত আমার হস্তে দিয়া যাইত, যেদিন আমাকে দেখিতে পাইত না টেবিলের উপর রাখিয়া যাইত।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিতাম, বালিকাটির যেমন সপ্রতিভ ভঙ্গী, তেমনই অবাধ গতি। সে যেমন সহজভাবে আমার সহিত কথা বলিত, তেমনই অবলীলাক্রমে আমার ঘরে প্রবেশ করিত।

সেরূপ সহজ সপ্রতিভতার সহিত ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে অধিক বিলম্ব হয় না। আমি বাংলা দেশের হিন্দীতে তাহার সহিত কথা কহিতাম, সে পাহাড়ী হিন্দীতে তাহার উত্তর দিত। কতকটা সেও আমার প্রশ্ন বুঝিত না এবং কতকটা আমিও তাহার উত্তর ভুল বুঝিতাম। কিন্তু মোটের উপর আমাদের কথাবার্তা একরকম চলিয়া যাইত।

তাহার নাম জানকী। খড-এর অর্ধপথে তাহাদের বাড়ি। তাহার পিতা জঙ্গল দফতরের (Forest Office) জমাদার। তাহারা তিনটি ভগিনী এবং চারিটি ভাই। তাহার বড় ভাই তিন মাস হইল সরকারে চাকরি পাইয়াছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি আপাদমস্তক শীতবস্ত্রে আবৃত হইয়া বসিয়া থাকিতাম দেখিয়া

জান্‌কী বলিত, "বাবুজী, তোমার এখনই এত ঠাণ্ডা বোধ হয়, বরফে তুমি কি করিয়া থাকিবে?"

'বরফ' অর্থাৎ শীতকাল। শীতকালে শিমলায় তুষারপাত হয় বলিয়া সহজকথায় শীতকালকে 'বরফ' বলিয়া থাকে।

আমি বলিতাম, "বরফ পড়িবার দুই মাস পূর্বেই আমি কলিকাতা চলিয়া যাইব।"

জান্‌কী আশ্চর্য হইয়া বলিত, "বাবুজী, তুমি বরফে থাকিবে না?"

বলিয়া সে বরফের গল্প আরম্ভ করিত। সে কি সুন্দর! যখন পাহাড় পর্বত গাছপালা সমস্ত বরফে একেবারে সাদা হইয়া যায়, তাহার উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া ঝক্‌ঝক্ করিতে থাকে, তখন তাহারা কি আনন্দের সহিত বরফের উপর বেড়াইয়া বেড়ায়—বরফ লইয়া খেলা করে! সেই বরফকে বাবুজীর এত ভয়!

তাহার উত্তরে আমি কলিকাতার গল্প করিতাম। শিমলার মতো ত্রিশটা শহর একত্র করিলেও কলিকাতার মতো বড় হয় না—সেখানে কত লোক, কত গাড়ি, কত আনন্দ! যে 'হাওয়াগাড়ি' শিমলায় একটা দেখিলে জান্‌কী অবাক হইয়া চাহিয়া থাকে, সে হাওয়াগাড়ি কলিকাতার পথে গণিয়া শেষ করা যায় না। মাঠে মনুমেণ্ট, পথে ট্রাম-গাড়ি, গঙ্গায় জাহাজ।

সমস্ত শুনিয়া জান্‌কী বিস্মিত হৃদয়ে কলিকাতার ঐশ্বর্য হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিত। সকলের চেয়ে তাহার আশ্চর্য লাগিত হাওয়া-গাড়ির কথা শুনিয়া। এখানে যত রিক্‌শা আছে, কলিকাতায় তাহার অধিক সংখ্যক হাওয়াগাড়ি আছে, কি আশ্চর্য! কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, কলিকাতায় শীতকালে বরফ পড়ে না। জান্‌কী মাথা নাড়িয়া বলিত, "বাবুজী, শিমলাই ভাল।"

এমনই করিয়া দিনে দিনে জান্‌কীর সহিত আলাপ ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশ ফুলের তোড়া মাত্র উপলক্ষ হইল—গল্প করাই প্রধান ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। প্রত্যুষে উঠিয়া বারান্দায় নিস্তেজ রৌদ্রকিরণে বসিয়া সম্মুখের পর্বতগুলির দিকে চাহিয়া থাকিতাম। কালো কালো পাহাড়গুলা দেখিয়া মনে হইত, যেন রূপকথার দৈত্যগণ তাহাদের বিরাট দেহ লইয়া অলসভাবে লেজ গুটাইয়া বসিয়া রহিয়াছে।

মনের মধ্যে কেমন একটা পীড়া অনুভব করিতাম। প্রভাতসূর্যোদ্ভাসিত প্রসন্ন আকাশের তলায় হিমজর্জর পর্বতগুলা কেমন খাপছাড়া বলিয়া মনে হইত। এমন সময়ে একমুখ হাস্য এবং একতোড়া ফুল লইয়া জান্‌কী আসিয়া উপস্থিত হইত—"বাবুজী, ফুল!"

ফুলের প্রসঙ্গ সেই পর্যন্ত শেষ—তাহার পর জান্‌কী গল্প করিতে বসিয়া পড়িত।

এই সরল-হৃদয় সপ্রতিভ পাহাড়ী বালিকাটিকে আমার ভাল লাগিত। কঠিন বন্ধুর পর্বতের মধ্যে চতুর্দিকের গাঢ়নিবদ্ধ গাম্ভীর্য এবং কঠোরতার সহিত তাহাকে একেবারে স্বতন্ত্র বলিয়া মনে হইত। তাহার মধ্যে যে প্রফুল্লতা এবং চাপল্য তাহাকে নিরন্তর উদ্বেল করিয়া রাখিত, তাহার উপমা পর্বতের মধ্যে আমি আর কোনও পদার্থে পাইতাম না—একমাত্র গিরিনির্ঝর ছাড়া। মনে হইত, সে যেন নির্মম পাহাড় ভেদ করিয়া তরল প্রস্রবণ নির্গত হইয়াছে। তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ না হইয়া উপায় নাই,—গল্প বলিতে সে যেমন মজবুত, গল্প শুনিতেও তাহার তেমনই আগ্রহ। তাহার কথা শ্রবণ করা এবং তাহার সহিত কথা কওয়া—এই দুই প্রক্রিয়ার একমাত্র পরিণতি হইতেছে হৃদ্যতা।

দুয়ানির হিসাব যেদিন শেষ হইল, তাহার পরদিন ফুল লইয়া আসিলে আমি জান্‌কীকে বলিলাম, "জান্‌কী, তোমার দু আনার ফুল দেওয়া হয়ে গেছে। আজ থেকে আবার নূতন হিসাব।" বলিয়া তাহাকে পুনরায় একটি দুয়ানি প্রদান করিলাম।

দুয়ানিটি আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া জান্‌কী বলিল, আর তাহাকে পয়সা দিতে হইবে না, আজ হইতে সে বিনামূল্যেই ফুল দিয়া যাইবে।

আমি বলিলাম, "তাও কি হয়—!"

কিন্তু তাহাই হইল। সে বলিল, ফুল বিক্রয় করা তাহার ব্যবসায় নহে—ফুল এবং পাতা বিনামূল্যেই সে পর্বতগাত্র হইতে লইয়া আসে, অতএব পয়সা না লইলেও তাহার ক্ষতি নাই। ফুলের পরিবর্তে 'বাবুজী'র অনুগ্রহই তাহার পক্ষে যথেষ্ট।

পীড়াপীড়ি করিয়া দেখিলাম, ফুলের মূল্য প্রদান করিলে জান্‌কীকে ক্ষুণ্ণ করাই হইবে এবং পীড়াপীড়ি করিলেও তাহাকে রাজী করিতে পারা যাইবে না। অগত্যা বিনামূল্যেই ফুল লাভ করিতে লাগিলাম।

দিনের পর দিন শেষ হইয়া তিন মাস কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে জানকী একদিনও আমাকে ফুল দিয়া যাইতে ভুলে নাই। যেদিন প্রাতে ঝড়বৃষ্টির জন্য আসিতে পারে নাই, সেদিন বৈকালে আসিয়া দিয়া গিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, এই তিন মাসের মধ্যে সে আমার সহিত এত অধিক ঘনিষ্ঠতা করিয়া লইয়াছে, যাহার মাত্রা আমার মনে হয়, ক্রমশ সঙ্গতির সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সে শুধু ফুল দিতে আসে না, সে আমার জন্য আসে; ফুল তাহার উপলক্ষ—আমিই তাহার লক্ষ্য।

কি আশ্চর্য! এই দুরন্ত পাহাড়ী বালিকার হৃদয়েও সেই প্রেম স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছে। এ শুধু হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াই ক্লান্ত হয় না—এ আবার ভালও বাসে! ক্ষুধার সময়ে আহার এবং নিদ্রার সময়ে নিদ্রালাভ করিয়াই ইহার বাসনা সমাপ্তি লাভ করে না—তাহারও সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলে!

কিন্তু আমি ত এই পর্বত-বালিকাকে ভালবাসি নাই—একান্ত সহৃদয়তা ভিন্ন আমি তো আর কিছুই ইহাকে দান করি নাই। আমার নিকট হইতে এমন কি পদার্থ সে লাভ করিয়াছে, যাহার বিনিময়ে তাহার হৃদয় লইয়া সে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে! আমি স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম, সে ফুল লইয়া আমার উপাসনা করিতে আসিত।

এই হৃদয়ের খেলা দেখিয়া আমি মনে মনে কৌতুক অনুভব করিতাম। কেমন ধীরে ধীরে অথচ অনন্যগতিভরে এই উদ্দাম এবং চঞ্চল হৃদয়খানি আমার নিকটে আসিয়া ধরা দিল! কিসের প্রভাবে? কিসের আকর্ষণে? আমার মধ্যে এমন কি শক্তি আমার অগোচরে বিরাজ করিতেছে, যাহার অদৃশ্য প্রভাব হইতে এই বালিকা কোনক্রমেই পরিত্রাণ লাভ করিল না! সময়ে সময়ে আত্মমহিমায় কেমন একটা প্রচ্ছন্ন আনন্দের অস্তিত্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু তাহা হউক, ইহাকে রোধ করিতে হইবে, ইহাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে না। এই অপরিণতবুদ্ধি বালিকা যে মিথ্যা মোহকে আশ্রয় করিয়া দিন দিন নিজেকে বিপদের পথে লইয়া যাইতেছে, আমার কর্তব্য তাহা হইতে তাহাকে রক্ষা করা। এই হৃদয়সংঘাতের মধ্যে

আমার পক্ষে বিশেষ আশঙ্কার কিছুই নাই; কিন্তু বেচারী জান্‌কী একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িবে যখন তাহাকে এই অপরিণামদর্শিতার মূল্য দিতে হইবে। আমার নিকট হইতে সহৃদয়তার অধিক যতটুকু সে আশা করিবে, ততটুকুর জন্য তাহাকে ভবিষ্যতে আঘাত সহ্য করিতেই হইবে।

স্থির করিলাম, জান্‌কীকে সাবধান করিয়া দিব। কিন্তু কি তাহাকে বলিব, কেমন করিয়া সাবধান করিব? সে ত একদিনও প্রকাশ করিয়া বলে নাই সে আমাকে ভালবাসে। এরূপ স্থলে কেমন করিয়া বলি, আমাকে ভালবাসিও না—ভুল করিও না। বিশেষত, সে যখন আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অবাধে গল্প করিতে থাকে, তখন নির্বিবাদে তাহার গল্প শুনা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। তখন তাহাকে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিতে যাওয়া নিতান্ত খাপছাড়া হইয়া পড়ে।

কিন্তু ক্রমশ অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, একটা কোন প্রতিকার না করিলেই নয়। দুই-একজন বন্ধুবান্ধব জান্‌কীর বিষয়ে লক্ষ্য করিতে ভুলিল না এবং তদুপলক্ষে আমাকে পরিহাস করিতেও ছাড়িল না। ভৃত্য এবং পাচকও যেন জান্‌কীকে লইয়া তাহাদের মধ্যে কিছু বলাবলি করে। আমার সন্দেহ হয়, তাহারা আমারই বিষয়ে আলোচনা করে। সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা আমি একজন বিবাহিত ব্যক্তি, জান্‌কীকে এ বিষয়ে প্রশ্রয় দেওয়া আমার পক্ষে কোনক্রমেই উচিত হয় না।

অবশ্য এ কথা বলিলে জান্‌কীর মনে নিশ্চয়ই কষ্ট দেওয়া হইবে; কিন্তু উপায় নাই। প্রয়োজনস্থলে আঘাত না করাই অন্যায়, কষ্ট না দেওয়াই নিষ্ঠুরতা।

স্থির করিলাম, জান্‌কীকে স্পষ্ট কিছু না বলিয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠতা বন্ধ করিব। ফুলের মূল্য গ্রহণ না করিলে তাহার নিকট হইতে ফুল লইব না। বিনামূল্যে ফুল গ্রহণের সুযোগে তাহার সহিত যে হৃদ্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, মূল্য দিয়া ফুল গ্রহণ করিলে তাহা সহজেই অপসৃত হইবে।

সেদিন প্রভাতে এক পসলা শ্রাবণের বর্ষণ খাইয়া কেলুগাছগুলি সজীব হইয়া উঠিয়াছিল, এবং ছিন্ন মেঘের অবকাশ দিয়া সূর্য্যের কিরণ আকাশ এবং পর্বতকে পরিপ্লুত করিয়া ফেলিয়াছিল।

ফুল লইয়া জান্‌কী আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং তাহার পশ্চাতে একজন পাহাড়ী যুবক পৃষ্ঠে মস্তবড় বোঁচকা লইয়া আমাকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, আজিকার ফুলের তোড়াটি সকল দিন অপেক্ষা বৃহৎ—নানাবিধ পুষ্পলতায় গ্রথিত। নিমেষের মধ্যে আমার মনকে প্রস্তুত করিয়া লইলাম এবং কর্তব্যজ্ঞানকে সচেষ্ট করিয়া তুলিলাম।

বলিলাম, "জান্‌কী, ফুলের দাম তুমি যদি না লও ত আর আমি ফুল লইব না।"

জান্‌কীর প্রফুল্লমুখ সহসা ম্লান হইয়া গেল।—"কেন বাবুজী ?"

আমি কহিলাম, "তা বলিতে পারি না, কিন্তু দাম তোমাকে লইতেই হইবে।"

একটু দুঃখিতস্বরে জান্‌কী কহিল, "বাবুজী, আমি যদি কোনো অপরাধ করিয়া থাকি আমাকে ক্ষমা করিবেন। আপনাকে আর বিনামূল্যে ফুল লইতে হইবে না, আপনাকে আমি আজ শেষ ফুল দিতে আসিয়াছি।"

কৌতূহল সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন ?"

জান্‌কী কহিল, "আমি আজ বিদেশ যাইতেছি, এখান হইতে এক বেলার পথ। ইনি আমার স্বামী।"

জান্‌কীর মুখ রক্তিম হইয়া উঠিল।

আমি কহিলাম, "জান্‌কী, তোমার বিবাহ হইয়াছে একদিনও বল নাই ত! কতদিন তোমার বিবাহ হইয়াছে ?"

জান্‌কী কহিল, "পাঁচ বৎসর।"

দেখিলাম, বর্ষার অনুজ্জ্বল সূর্যকিরণের মধ্যে জান্‌কীর মুখখানি অম্লান পবিত্রতায় নির্মল হইয়া উঠিয়াছে।

স্বামীর প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া জান্‌কী নীরবে ইঙ্গিত করিল। সেই ইঙ্গিতে পাহাড়ী যুবকটি তাড়াতাড়ি আমার সম্মুখে আসিয়া পুনরায় আমাকে অভিবাদন করিল এবং করজোড়ে কহিল, "বাবুজীর যদি অনুগ্রহ হয়, একবার আমাদের গ্রামে বেড়াইতে যাইবেন—পথ ভাল—আমি স্বয়ং আসিয়া লইয়া যাইব।"

আমি কহিলাম, "ছুটি পাইলে আমি তোমাকে তোমার শ্বশুরের দ্বারা সংবাদ দিব।"

জান্‌কী এবং তাহার স্বামী সকৃতজ্ঞ নেত্রে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

বিদায়কালে জান্‌কী বলিল, "বাবুজী, আপনার দয়া এবং ভালবাসার কথা আমার চিরকাল মনে থাকিবে। আপনি আমাকে যে দোয়ানিটি দিয়াছিলেন, সেটি আমি আপনার দয়ার নিদর্শনস্বরূপ রাখিয়া দিয়াছি, খরচ করি নাই।" বলিয়া একটি ক্ষুদ্র কৌটা হইতে দুয়ানিটি বাহির করিয়া আমাকে দেখাইল।

জান্‌কী এবং তাহার স্বামী খডের পথে নামিয়া গেল। যতক্ষণ তাহাদের দেখা গেল, আমি তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

তখন আকাশ আরও মেঘমুক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং চতুর্দিক রৌদ্রপাতে আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

জান্‌কীর সরল স্নেহপূর্ণ আচরণকে বিকৃত রূপ দিয়া তাহাকে শোধন করিবার সাধু সঙ্কল্পের আত্মপ্রসাদে কিছু পূর্বে মনে মনে নিজের পিঠ ঠুকিতেছিলাম। সেই শূন্যগর্ভ অহমিকা হইতে সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে মুক্তিলাভ করিয়া মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু যখন মনে হইল, কাল হইতে "বাবুজী ফুল" বলিয়া একখানি সরল অন্তঃকরণ আর আমার নিকট আসিয়া দাঁড়াইবে না, তখন একটা সূক্ষ্ম বেদনায় মনটা পীড়িতও হইতে লাগিল।

সেই দিন আপিসে গিয়া বলিলাম, "সাহেব,,আমাকে দশ দিনের ছুটি দাও, স্ত্রীকে আনিতে যাইব।"

সাহেব বলিলেন, "তথাস্তু।"

প্রমাণ

১

তিনটি প্রাণী লইয়া, সংসারটি কালস্রোতে সুখের তরণীর মতো ভাসিয়া চলিতেছিল। স্বামী সুধাময়, স্ত্রী অরুণা এবং কন্যা করুণা। সুধাময়ের বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর, মার্চেন্ট আপিসে বড় চাকরি করে; শরীর একটু রুগ্ন এবং অলস, মনটি কিন্তু বিশেষভাবে প্রবণ এবং প্রবল, অর্থাৎ গিরিনদীর মতো অতি অল্প বৃষ্টিতেই বহিতে আরম্ভ করে এবং যখন বহিতে আরম্ভ করে তখন খরস্রোতে যুক্তি ও তর্ককে উপলখণ্ডের মতো ভাসাইয়া লইয়া চলে। স্ত্রী অরুণার বয়স পঁচিশ বৎসর। গত পাঁচ বৎসর হইতে যাহারা তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে, তাহাদের মনে হয় সে যেন যৌবনের সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যেখান হইতে তাহার পতনের কোন লক্ষণ নাই। কেবলমাত্র একটি সন্তানের মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে। মনের তুষ্টি এবং দেহের স্বাস্থ্য উভয়ের সাহচর্যে তাহার নিটোল প্রসন্ন মূর্তিখানি সুদক্ষ চিত্রকরের অঙ্কিত চিত্রের মতো চিত্তাকর্ষক। কন্যা করুণা তাহার জননীর বাল্য মূর্তিখানি সম্পূর্ণভাবে বহন করিয়া কৈশোরের সীমান্ত অতিক্রম করিবার উপক্রম করিতেছিল। সে তাহার জনক-জননীর একমাত্র সন্তান হইয়া তাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসার ষোল আনার অধিকারিণী—এই অভ্রান্ত জ্ঞানটির দ্বারা তাহার মনের মধ্যে একটি সুমিষ্ট অভিমান সঞ্চারিত হইয়াছিল।

সেদিন ছুটির দিন ছিল। শীতের মধ্যাহ্নে আহারের পর শয্যার উপর অর্ধশায়িত হইয়া সুধাময় ইংরাজী সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল এবং অদূরে একটা বেতের চেয়ারের উপর বসিয়া অরুণা নিবিষ্টমনে একটা লেসের উপর রেশমের ফুল তুলিতেছিল। করুণা বাড়ি ছিল না; স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীর গুরুতর অসুখ শুনিয়া দেখিতে গিয়াছিল।

সংবাদপত্রের একটা বিশেষ অংশ সুধাময়ের দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণ করিল। বড় বড় অক্ষরে হেড-লাইন:—"আমেরিকা-প্রত্যাগত

জ্যোতিষী স্বামী বিমলানন্দ এম. এ.র অদ্ভুত কাহিনী"। তাহার নিম্নের মুদ্রিত বিবরণ পাঠ করিয়া সুধাময় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। উঃ, কি আশ্চর্য ক্ষমতা! হিন্দুগণ যে জ্যোতিষশাস্ত্রকে অঙ্কশাস্ত্রের স্তরে লইয়া গিয়াছিল, এতদিনে এই মহাপুরুষ তাহা সপ্রমাণ করিলেন। যে সংশয়ী জাতি হিন্দুর ফলিত জ্যোতিষশাস্ত্রকে এতদিন 'বুজরুগি' বলিয়া পরিহাস করিয়া আসিয়াছে, তাহারাই এখন তাহার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে; বলিতেছে, এই মহাজ্ঞানীর নিকট অদৃষ্ট সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হইয়া ভূত এবং ভবিষ্যৎ ঠিক বর্তমানের মতোই প্রত্যক্ষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুধাময় শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

স্বামীর ঔৎসুক্য লক্ষ্য করিয়া অরুণা কহিল, "অত মন দিয়ে কি পড়ছ?"

সুধাময় কহিল, "কলিকাতায় বিমলানন্দ স্বামী নামে একজন জ্যোতিষী এসেছেন। অদ্ভুত তাঁর ক্ষমতা! তিনি যা গণনা করেন তার একটিও ভুল হয় না। ইনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন—সেখানকার একজন পাদরি সাহেব বলেছেন যে, একজন পণ্ডিতের অঙ্ক কষায় ভুল হতে পারে, কিন্তু এঁর জ্যোতিষ গণনায় ভুল হবার যো নেই। তা ছাড়া, আরও অনেক সাহেব এঁর গণনা দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছে।"

দন্তের সাহায্যে সুতা কাটিয়া অরুণা বলিল, "কি দেখে গণনা করেন?"

"কোষ্ঠী দেখে, হাতের রেখা দেখে, কপালের রেখা দেখে, যেমন ক'রে বলবে তেমনি ক'রে গণনা করবেন, অথচ গণনার ফল ঠিক এক হবে। আমেরিকার একজন লোকের কপালের রেখা দেখে ইনি গণনা করেন—তার পর দশ দিন পরে সেই লোকের মুখ ঢেকে হাতের রেখা দেখানো হয়। তিনি হাতের রেখা দেখে যা গণনা করেছিলেন, তা আগেকার গণনার সঙ্গে একেবারে হুবহু মিলে গিয়েছিল।"

অরুণা আর কিছু না বলিয়া নিজের কার্যে মন নিবিষ্ট করিল।

সুধাময় কহিল, "গোটা কুড়িক টাকা দাও, আর বেরবার কাপড় দাও—এ সুযোগ ছাড়া হবে না।"

অরুণা কহিল, "স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে না কি?"

"হ্যাঁ। আর চার দিন পরে তিনি জাপান রওনা হবেন। হুগ

সাহেবের বাজারের দক্ষিণে আছেন। এগারোটা থেকে আটটা পর্যন্ত লোকজনের সঙ্গে দেখা করেন।"

"তা টাকা কি হবে?"

"আধ ঘণ্টা গণনা করবার জন্যে তাঁর ফি দশ টাকা।"

মৃদু হাস্য করিয়া অরুণা কহিল, "যখনই শুনেছি আমেরিকা ফেরত, তখনই বুঝেছি পাকা ব্যবসাদার। যে স্বামী ব'লে নিজেকে পরিচয় দেয়—তার এত টাকার প্রয়োজন কি? আধ ঘণ্টায় দশ টাকা?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সুধাময় কহিল, "বল কি! যিনি এত বড় একজন মহাত্মা ব্যক্তি, তাঁর কি কোন মহৎ উদ্দেশ্য নেই তুমি মনে কর? এ টাকা ইনি নিজের জন্যে নিচ্ছেন না—এই টাকা নিয়ে ইনি কাশীতে হিন্দু কলেজ অব্ অ্যাস্ট্রলজি খুলবেন, এবং এত বড় একটা মৃতপ্রায় শাস্ত্রকে জীবন দান করবেন।"

সুধাময়ের কথা শুনিয়া অরুণা শুধু একটু মৃদুহাস্য করিল—কিছু বলিল না। জ্যোতিষ সম্বন্ধে তাহার স্বামীর অন্ধ বিশ্বাস এবং অনুরাগের কথা সে সম্পূর্ণ অবগত ছিল; প্রতিনিয়ত পুঁথি বগলে পথে পথে ঘুরিয়া ভাগ্য-নির্ণয় করিবার নামে যাহারা লোক ঠকাইয়া বেড়ায়, তাহাদের মধ্যে ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি আছে বলিয়া যাহার দৃঢ় বিশ্বাস, আমেরিকা-প্রত্যাগত ইংরাজী-সার্টিফিকেটপ্রাপ্ত স্বামীজী সম্বন্ধে তাহার ধারণা টলাইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, তাহা অরুণা নিঃসংশয়ে জানিত।

সুধাময়কে টাকা দিবার সময় অরুণা জিজ্ঞাসা করিল, "আমার সম্বন্ধে কি জিজ্ঞাসা করবে শুনি?"

স্নেহভরে পত্নীর নাসিকায় অঙ্গুলির মৃদু আঘাত দিয়া সুধাময় কহিল, "জিজ্ঞাসা করব, কতদিনে তোমার একটি খোকা হবে।"

অরুণা কহিল, "সে খবরের জন্যে আমি একটুও ব্যস্ত নই, ভগবানের কৃপায় করুণ বেঁচে থাক্—তা হ'লেই হ'ল।"

"তবে কি জিজ্ঞাসা করব?"

স্বামীর মুখের উপর প্রশান্ত দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া সহাস্যমুখে অরুণা কহিল, "জিজ্ঞাসা ক'রো, কবে তোমার পায়ে মাথা রেখে আমি মরতে পাব!"

সুধাময় কহিল, "তার চেয়ে জিজ্ঞাসা করব কতদিনে তোমার বৈধব্য-যোগ—"

ত্বরিতবেগে অরুণা সুধাময়ের মুখ চাপিয়া ধরিল ; কহিল, "ফের যদি ওসব কথা বলবে ত ভাল হবে না বলছি !"

হাসিতে হাসিতে সুধাময় প্রস্থান করিল।

২

প্রকাণ্ড অট্টালিকার নিম্নতলের দুইটি কক্ষ ভাড়া লইয়া বিমলানন্দ স্বামী দোকান সাজাইয়াছেন। সুধাময়কে অন্বেষণ করিতে হইল না। সুবিস্তৃত সাইন্‌বোর্ডের উপর অতি বৃহৎ অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা— "জ্যোতিষী বিমলানন্দ স্বামী এম-এ"। এত বৃহৎ এবং উজ্জ্বল যে, কোন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে বিফল হয় না। নামের উভয় পার্শ্বে রাশি-চক্র এবং গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণে অঙ্কিত এবং দ্বারের উভয় পার্শ্বে দুইটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সাইন্‌বোর্ডে স্বামীজীর জ্ঞান ও গরিমার কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত। দ্বারের নিকট তকমা-পরা ভৃত্য বসিয়া হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করিতেছে ; ব্যবস্থা এমন সুন্দর যে, কেহ যে হ্যাণ্ডবিল না লইয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইবে তাহার উপায় নাই। এমন কি সুধাময়কেও একটি হ্যাণ্ডবিল হাতে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হইল।

প্রথম কামরাটি স্বামীজীর আপিস। সেখানে নানাজাতির এবং নানাশ্রেণীর দর্শনপ্রার্থী বসিয়া আছে, পার্শ্বের ঘরে স্বামীজী বসিয়া গণনা করিতেছেন—যেমন যাহার ডাক পড়িতেছে, যাইতেছে।

সুধাময় প্রবেশ করিতেই একটি কর্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি গণনা করাবেন কি ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"কতক্ষণ সময় নেবেন ?"

"আধ ঘণ্টা।"

হস্ত প্রসারিত করিয়া কর্মচারী কহিল, "দশ টাকা দিন।"

সুধাময় ব্যাগ হইতে একটি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া প্রদান করিল।

কর্মচারী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার নাম ?"

নাম বলিতে গিয়া সুধাময় একটু ইতস্তত করিয়া কি ভাবিয়া প্রকৃত নাম গোপন করিল ; কহিল, "বিনোদবিহারী গুপ্ত।"

কর্মচারী তখনই বিনোদবিহারী গুপ্তর নামে দশ টাকার একখানি রসিদ লিখিয়া সুধাময়কে দিল। সুধাময় পড়িয়া দেখিল, তাহার মধ্যে তাহার সময় নির্ধারিত রহিয়াছে ৫॥টা হইতে ৬টা। তখন বেলা ২॥টা মাত্র।

সুধাময় কহিল, "আর একটু আগে আমার সময় দিতে পারেন না কি ?"

কর্মচারী হাসিয়া কহিল, "আগেকার সমস্ত সময় বুক্‌ড্ (booked) হয়ে রয়েছে। কে নিজেকে অসুবিধায় ফেলে আপনাকে সময় দেবে বলুন ? আপনি ইচ্ছে করলে বাড়ি ঘুরে আসতে পারেন কিংবা অন্য কোথাও যদি কাজ থাকে—"

সুধাময় কহিল, "না, তা হ'লে অপেক্ষাই করি।"

"যেমন আপনার সুবিধা।"—বলিয়া কর্মচারী অন্যত্র চলিয়া গেল।

সুধাময় বসিয়া হ্যাণ্ডবিলখানি পড়িতে লাগিল। হ্যাণ্ডবিলটি স্বামীজীর ক্ষমতা এবং কীর্তি-কাহিনীর সম্পূর্ণ বিবরণী। খবরের কাগজে ইহার দশভাগের একভাগও প্রকাশিত হয় নাই। হ্যাণ্ডবিলখানি পাঠ করিতে করিতে বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে সুধাময়ের মন ভরিয়া উঠিল। আর কিছুক্ষণ পরেই এই যাদুকরের মন্ত্রপ্রভাবে তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের যবনিকা উন্মোচিত হইয়া যাইবে এবং এতদিন ধরিয়া যাহাকে সে অদৃষ্ট মনে করিয়া নিগূঢ় রহস্যের মধ্যে নিহিত জানিত, তাহা তাহার চক্ষের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিবে।

স্বামীজীর ঘরের মধ্যে বেল বাজিয়া উঠিল এবং তাহার পরেই একটি ইংরাজ-মহিলা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরে একটি ইংরাজ অপেক্ষা করিতেছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন দেখলে ?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ইংরাজ-রমণী বলিল, "The most wonderful man! An awful conjurer!"

শুনিয়া সুধাময় মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর দীর্ঘ অপেক্ষার পর

যখন তাহার ডাক পড়িল, তখন মন্ত্রাভিভূতের মতো সে স্বামীজীর কক্ষে প্রবেশ করিল।

৩

একটি শ্বেত পাথরের টেবিলের সম্মুখে, চেয়ারের উপর বিমলানন্দ স্বামী বসিয়া আছেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ দেহ, চক্ষু দুইটি দীপ্ত প্রভায় জ্বলিতেছে এবং সমস্ত মুখের মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রতিভার চিহ্ন পরিস্ফুট। সুধাময়ের মনে হইল, গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টির দ্বারা স্বামীজী যেন তাহার জীবনের সমস্ত অতীত এবং ভবিষ্যৎ দেখিয়া লইতেছেন—যেন সে অতল-স্পর্শী দৃষ্টি হইতে কোন-কিছু গোপন রাখিবার উপায় নাই। বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে সুধাময় স্বামীজীকে অভিবাদন করিতে ভুলিয়া গেল।

সুধাময়ের আপাদ-মস্তক গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়া বিমলানন্দ কহিলেন, "নাম ভাঁড়িয়েছ কেন? তোমার যা লক্ষণ এবং ইঙ্গিত, তাতে তোমার নাম বিনোদবিহারী গুপ্ত হ'তেই পারে না। তুমি আমাকে পরীক্ষা করতে এসেছ দেখছি। কিন্তু বাপু, তোমরা আধুনিক শিক্ষালাভ ক'রে অ্যাস্ট্রলজিকে যে লোক ঠকাবার একটা উপায় ব'লে মনে কর, সেটা একটা মস্ত ভুল। আর সমস্ত উপায়েই লোক ঠকানো যায়, শুধু জ্যোতিষ গণনার দ্বারা যায় না। কারণ যে তোমার অতীত জীবনের ঘটনা বলার স্পর্ধা করছে, সে তোমাকে ঠকাচ্ছে কি ঠকাচ্ছে না, সে বিষয়ে তোমার কোন সংশয় থাকবার কারণ থাকে না।"

অপ্রতিভ হইয়া সুধাময় কহিল, "আমার অপরাধ হয়েছে; আমাকে ক্ষমা করুন। আমার নাম সুধাময় বসু।" বিস্ময়ে ও ভক্তিতে সুধাময় বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল।

বিমলানন্দ মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "তুমি অপরাধ কর নি; যারা জ্যোতিষ গণনায় ভুল করে, তারাই অপরাধ করে। তাদের দোষেই জ্যোতিষ শাস্ত্রে লোকের আস্থা নেই। ব'স।"

স্বামীজীর সম্মুখে চেয়ারের উপর সুধাময় বসিল।

"কোষ্ঠী দেখাবে,—না, হাতের রেখা দেখব?"

সুধাময় কহিল, "আপনার যা ইচ্ছা। কোষ্ঠীও এনেছি।"

স্বামীজী কহিলেন, "হাতই দেখি—কোষ্ঠীর গণনায় ভুল হ'তে পারে, হাতের রেখা মিথ্যা কথা বলে না।"

সুধাময় হাত বাড়াইয়া দিল। স্বামীজী হাতের রেখা দেখিয়া কাগজে গণনা করিতে লাগিলেন। প্রথমে জন্মরাশি নক্ষত্র, তাহার পর জন্মবৎসর, জন্মদিন—সমস্ত গণনা করিলেন। তাহার পর জীবনের অতীত ঘটনা দুই-একটি বলিতে লাগিলেন।

মুগ্ধ সুধাময় কহিল, "আপনি মহাত্মা ; আপনার গণনায় কোন ভুল হয় নি।"

স্বামীজী কহিলেন, "তুমি বিবাহিত, তোমার স্ত্রী জীবিত, কিন্তু তুমি নিঃসন্তান। তোমার সন্তান হয় নি, কখনও হবেও না।"

একটু বিস্মিত হইয়া সুধাময় কহিল, "একটু ভুল হচ্ছে।"

স্বামীজী পুনরায় গণনা করিলেন, "না, ভুল হয় নি। তোমার স্ত্রী জীবিত। কিন্তু তুমি নিঃসন্তান।"

সুধাময় একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "আজ্ঞে, আমার একটি মেয়ে আছে।"

"জীবিত ?"

"জীবিত।"

"প্রতারণা ক'রো না।"

সুধাময় কহিল, "আপনি সর্বজ্ঞ। আপনার নিকট প্রতারণা করা বৃথা।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিমলানন্দ কহিলেন, "কই, দেখি তোমার কোষ্ঠী!"

সুধাময় পকেট হইতে কোষ্ঠী বাহির করিয়া দিল। বিমলানন্দ কোষ্ঠী লইয়া গণনা আরম্ভ করিলেন। বিস্তৃত সূক্ষ্মভাবে গণনা করিতে লাগিলেন। দীর্ঘ সময়ের পর কোষ্ঠীর গণনা শেষ হইলে, সুধাময়ের ললাটের রেখা পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন। তাহার পর এক খণ্ড কাগজে কি লিখিয়া একটা খামে মুড়িয়া সুধাময়ের হস্তে দিয়া কহিলেন, "বাইরে গিয়ে পড়ো।" তাহার পর বেল বাজাইয়া দিলেন।

সুধাময় কহিল, "আমার একটা প্রশ্ন আছে।"

মৃদু হাসিয়া স্বামীজী কহিলেন, "তা হ'লে কাল এসো। আধ ঘণ্টার স্থলে তোমায় প্রায় চল্লিশ মিনিট হ'য়ে গিয়েছে। আমার আপত্তি না

থাকতে পারে, কিন্তু যাঁকে বসিয়ে রেখেছি তাঁর আপত্তি বেড়ে উঠছে।"

সুধাময় কহিল, "দু মিনিটের বেশি লাগবে না।"

কিন্তু ততক্ষণে কক্ষে আর এক ব্যক্তি আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। স্বামীজী সুধাময়ের কথার উত্তর না দিয়া তাহার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন।

তখন অগত্যা স্বামীজীকে অভিবাদন করিয়া সুধাময় বাহিরে ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইল। খামখানা ছিঁড়িয়া কাগজ বাহির করিয়া গ্যাসের আলোকে পাঠ করিল। তাহাতে লেখা ছিল, "আমার গণনায় কোন ভুল নাই—তোমার ধারণা ভুল।"

সেই খামের মধ্য হইতে কালসর্প বাহির হইয়া দংশন করিলেও সুধাময় বোধহয় সেরূপ বিহ্বল হইত না। এই কয়েকটি অক্ষরের মধ্যে গুপ্তভাবে যে তীব্র বিষ সঞ্চিত ছিল, তাহার তাড়নায় সুধাময়ের সমস্ত দেহ ঝিমঝিম করিয়া আসিল। গ্যাসের উজ্জ্বল আলোক তাহার চক্ষে নিমেষের মধ্যে স্তিমিত হইয়া গেল এবং তাহার ভাবহীন অনুদ্দিষ্ট দৃষ্টির সমক্ষে রাজপথ এবং নিউমার্কেটের দৃশ্যাবলী স্বপ্নরাজ্যের অর্থবিহীন নিঃশব্দতায় কেবলমাত্র নড়িতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া সম্মুখস্থ ঠিকাগাড়ি হইতে দুইজন সহিস আসিয়া যখন "বাবু গাড়ি চাই, গাড়ি চাই" করিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল, তখন সুধাময়ের চেতনা অল্প ফিরিয়া আসিল এবং কিছু মনে মনে স্থির না করিয়াই সহসা পশ্চিম দিক লক্ষ্য করিয়া সে চলিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পায়ে যেন কেহ পাথর বাঁধিয়া দিয়াছে, কোনমতেই পা চলিতে চাহে না।

চৌরঙ্গী রোড পার হইয়া, ট্রামের রাস্তা পার হইয়া, পুষ্করিণীর পাশ দিয়া, মাঠ ভাঙিয়া সুধাময় পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিল। পথ আর শেষ হয় না। শীতকালের অন্ধকার রাত্রি, মাঠে লোকজনের ভিড় নাই; সেই নির্জন মাঠ ভাঙিয়া সুধাময় কোথায় চলিয়াছিল, তাহা সে নিজেই জানে না। তাহার মনের মধ্যে যে উদ্দাম ঝটিকা গর্জন করিতেছিল, তাহার ভীষণতার মধ্যে তাহার সমস্ত অনুভূতি ডুবিয়া গিয়াছিল। অবশেষে দীর্ঘ সময় এবং দীর্ঘ পথ অতিবাহিত করিয়া মাতালের মতো টলিতে টলিতে সে যখন গঙ্গার ধারে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি

আটটা বাজিয়া গিয়াছে। সম্মুখে একটা জেটিতে একটি মাত্রও লোক ছিল না। সুধাময় তাহার উপর গিয়া বসিল। পায়ের নীচে গঙ্গা বহিয়া যাইতেছিল, মাথার উপর আকাশে অসংখ্য তারকা হাসিতেছিল এবং শীতের তীব্র উত্তুরে বাতাস সজোরে বহিতেছিল। সেইরূপ অবস্থায় বসিয়া প্রায় দুই ঘণ্টা সুধাময় কত কি ভাবিল, কিন্তু মনের অশান্ত ভাবের উপশম হইল না। বিমলানন্দ স্বামীর অভ্রান্ত জ্ঞান আজ তাহার সুখের মূলে যে নির্মমভাবে দংশন করিয়াছে, তাহা হইতে আর কোন ক্রমে নিস্তার নাই। আমেরিকাবাসী পাদরির কথা সুধাময়ের মনে পড়িল— "অঙ্ক কষায় ভুল হইতে পারে, কিন্তু বিমলানন্দের গণনায় ভুল হইতে পারে না।"

অধীর হৃদয়ে সুধাময় সেখান হইতে উঠিয়া স্ট্রাণ্ড্ রোডে আসিয়া দাঁড়াইল। একটা খালি গাড়ি যাইতেছিল দেখিয়া তাহাতে চড়িয়া বসিল।

সুধাময় গৃহে পৌছিলে অরুণা কহিল, "কি কাণ্ড বল দেখি? সেই দুপুরবেলা বেরিয়েছ, আর এই দুপুররাতে ফিরলে! আমাদের মনে কি ভাবনা হয় না?"

অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করিয়া কি বলিয়া সুধাময় সরিয়া গেল। অরুণা পিছনে পিছনে গিয়া কহিল, "কি হয়েছে তোমার, মুখ অত ভার কেন? অসুখ করে নি ত?"

কথার উত্তর না দিয়া সুধাময় একটা ঈজি-চেয়ারে শয়ন করিল।

অরুণা কহিল, "গণক্‌কার গুণে বুঝি কোন মন্দ খবর দিয়েছে। তাই যদি দিয়ে থাকে তাতে মন খারাপ ক'রে কি হবে? ওদের সব কথাই মিথ্যা হয়।"

সুধাময় উচ্চকণ্ঠে কহিল, "যাও যাও। আমার সমুখ থেকে স'রে যাও। বিরক্ত ক'রো না।"

এক মুহূর্ত অরুণা নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে সরিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে করুণা তাহার জননীর মূর্তি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। মুখ রক্তবর্ণ, চক্ষু দুইটা ফুলিয়াছে এবং সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা এবং অশান্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"কি হয়েছে মা তোমার ?"

"কিছু হয় নি।"

"তবে জিনিসপত্তর গুছচ্ছ কেন ?"

অরুণার দুই চক্ষু হইতে তপ্ত অশ্রু ঝরঝর করিয়া ঝরিতে লাগিল।

কাল রাত্রে যে ভীষণ অশ্রাব্য কথা শুনিয়া সে ভগবানের নিকট চির-বধিরতা প্রার্থনা করিয়াছিল, সেই শ্রবণ-পথে এই সুমধুর সহানুভূতির সুর প্রবেশ করিয়া অরুণাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

জননীর বেদনায় করুণার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল ; কহিল, "মা, তুমি কাঁদছ কেন ? শীঘ্র বল কি হয়েছে !"

অশ্রু মুছিয়া অরুণা কহিল, "করুণ, আমি আজ এ বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাব। তুমি লক্ষ্মীমেয়ের মতো তোমার বাবার খাওয়া-পরা দেখো, সেবা-যত্ন ক'রো। আমি জিনিসপত্তর গুছিয়ে তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব, আর তোমাকে চাবি দিয়ে যাব। তুমি এবার থেকে সব দেখবে শুনবে। বুঝলে ত ?"

সজোরে মাথা নাড়িয়া করুণা কহিল, "আমি সে সব কথা শুনতে চাই নে, তুমি কেন যাচ্ছ বল।"

অরুণা কহিল, "ছেলেমানুষের সব কথা শুনতে নেই। এইটুকু জেনে রাখ, এখানে কোন কারণে আমার থাকা চলবে না। তোর মা যদি আর না ফেরে, হ্যাঁ করুণ, তুইও কি তোর মাকে ভুলে যাবি ?" অরুণা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

করুণা কাঁদ কাঁদ স্বরে কহিল, "যাও ! তুমি যদি ওসব কথা বলবে ত আমি বাবার কাছে গিয়ে জেনে আসব কি হয়েছে।"—বলিয়া করুণা তাহার পিতার উদ্দেশে চলিল।

ব্যস্ত হইয়া অরুণা ডাকিল, "করুণ, অ করুণ ! শুনে যাও।" কিন্তু করুণা ফিরিল না—চলিয়া গেল।

পাঁচ মিনিট পরে করুণা ফিরিয়া আসিল ; চক্ষে অশ্রু, অভিমানে কণ্ঠ নিরুদ্ধ।

তাহাকে সাদরে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া অরুণা কহিল, "করুণ, কি হয়েছে মা ?"

জননীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া করুণা ফুলিতে লাগিল। অরুণা তাহার

মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিল। তাহার পর কিছু পরে মুখ তুলিয়া ধরিয়া দেখিল, উচ্ছ্বসিত অশ্রুর প্রবাহে করুণার মুখ ভাসিয়া গিয়াছে।

"কি হয়েছে করুণ?"

করুণা কহিল, "মা, আমিও তোমার সঙ্গে যাব।"

"কেন মা?"

"বাবা আমার মুখ দেখবে না বলেছে।"

এত দুঃখেও, ঘৃণায় ও ক্রোধে অরুণার চক্ষু অগ্নিকণিকার মতো জ্বলিয়া উঠিল; কহিল, "যত দিন আমি না ফিরব, ছেড়ে থাকতে পারবে?"

"পারব।"

"আচ্ছা, তবে তুমিও চল। তবে মনে রেখো করুণ, দুদিন পরে এখানে ফেরবার জন্যে অধীর হ'লে চলবে না।"

করুণা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া কহিল, "মা, তবে আমার জিনিস-পত্তর গুছিয়ে নিই?"

অরুণা কহিল, "না না, সে হবে না। এখান থেকে কোন জিনিস নিয়ে যেতে পারবে না। পড়েছ ত, পরের দ্রব্য নিলে চুরি করা হয়!"

বেলা যখন নয়টা, তখন অরুণা কন্যাকে লইয়া সুধাময়ের নিকট উপস্থিত হইল। সুধাময় ঈজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া, মাথমুণ্ডু কত কি ভাবিতেছিল। সারা রাত্রির অনিদ্রা ও উত্তেজনায় তাহার মূর্তি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল।

ধীর অবিচলিত কণ্ঠে অরুণা কহিল, "আমাদের গাড়ি এসেছে।" তাহার পর চাবির গুচ্ছ চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া কহিল, "এই চাবির রিং রইল—এতে সব চাবি আছে। গয়নার বাক্স লোহার সিন্ধুকে রইল। আর আমার কাছে সংসার-খরচের যে নগদ টাকা ছিল, সে টাকা ও হিসেব দেরাজের মধ্যে রেখেছি।"

তাহার পর একটু থামিয়া কহিল, "করুণের আর আমার সেভিংস্ ব্যাঙ্কের পাস-বুক লোহার সিন্ধুকে রইল।"

তাহার পর স্বামীর প্রতি একবার গভীর মর্মস্পর্শী দৃষ্টিপাত করিয়া, গলবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

করুণা ঘাড় বাঁকাইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে প্রণাম করিল না। অভিমানে তাহার মন আচ্ছন্ন হইয়া ছিল।

অরুণা কহিল, "এস করুণ, আর দেরি করা নয়।" শেষের কথা কয়েকটি বলিতে অরুণার কণ্ঠ কাঁপিয়া গেল। যে শক্তির বলে প্রাণপণে সে এতক্ষণ নিজেকে সম্বরণ করিয়া রাখিয়াছিল, সহসা তাহা ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

মাতা ও কন্যা উভয়ে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

সুধাময় কাঠের মতো ঈজি-চেয়ারে নীরব নিস্পন্দ হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার অন্তরের নিভৃত প্রদেশ হইতে দুইটি সামান্য কথা বারংবার উঠিতেছিল 'শুনে যাও'। কিন্তু যেন যাদুমন্ত্রবলে তাহার জিহ্বা অসাড় হইয়া গিয়াছিল। কোনরূপেই মুখ দিয়া বাহির হইল না। শুধু মনে হইল, কে যেন তাহার হৃদয়ের মধ্যে গলিত লৌহ ঢালিয়া দিয়া চলিয়া গেল। অব্যক্ত অসহ্য যন্ত্রণায় হতচেতনের মতো সুধাময় পড়িয়া রহিল। তাহার পর কিছুক্ষণ পরে রাজপথে যখন গুম্‌গুম্‌ করিয়া গভীর মর্মভেদী শব্দে একটা গাড়ি চলিয়া যাওয়ার শব্দ শুনা গেল, তখন সুধাময় দুই হস্তে সজোরে বুকের দুই দিকের পাঁজর টিপিয়া ধরিল।

অরুণা প্রথমে বউবাজারে তাহার এক দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের বাড়ি গিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দিনই তাহার পিতৃদত্ত একখানা অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া তাহার এক আত্মীয়কে সঙ্গে লইয়া রাত্রের গাড়িতে তাহার ভ্রাতার নিকট লাহোর যাত্রা করিল।

৪

বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন মনে করিল, সুধাময়ের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটিয়াছে, নহিলে সহসা স্ত্রী-কন্যা শ্যালকের নিকট পাঠাইয়া দিয়া দিবারাত্র জ্যোতিষ-চর্চা লইয়া উন্মত্ত হইবে কেন? শুধু আপিসের কাজটুকু ছাড়া আহার-নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগ করিয়া সে অহর্নিশ জ্যোতিষের পিছনে লাগিয়াছে। ক্লান্তি নাই, আলস্য নাই, বিরক্তি নাই; দিবারাত্র সুধাময় বহুবিধ পুস্তকের মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করিয়া গণনা করিতেছে। বিলাত ও আমেরিকা হইতে এমন মেল

আসিত না, যাহাতে তাহার পুস্তক না আসিত। এ সকল দেখিয়া লোকে মনে করিত, সে নিশ্চয় পাগল হইবে। বিমলানন্দ স্বামী তাহার মনের মধ্যে যে কি আগুন জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল, তাহার সন্ধান ত কেহ জানিত না!

একটা কথা মনে করিয়া সুধাময় কিছুই স্থির করিতে পারিত না। বিমলানন্দের গণনায় ভুল হইতে পারে—এ কথা সেদিন তাহার মনে স্থান পায় নাই বটে, কিন্তু তথাপি অরুণার নিকট সুধাময় যে প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহাতে অরুণা কোনমতেই স্বীকার হইল না কেন? সুধাময় যখন বিমলানন্দের গণনার সত্যাসত্য পরীক্ষা করিবার জন্য বিমলানন্দেরই দ্বারা অরুণার হস্তরেখা গণনা করাইবার প্রস্তাব করে, তখন দৃপ্ততেজে জ্বলিয়া উঠিয়া অরুণা কহিয়াছিল, "আমাকে এত সামান্য মনে ক'রো না যে, নিজেকে এরূপ ঘৃণিতভাবে পরীক্ষায় ফেলে নিজের আত্মমর্যাদাকে অপমান করব। এর জন্যে তুমি যদি আমাকে ত্যাগ কর, তাতেও আমি রাজি আছি!" অরুণা যে কেবল আত্ম-সম্ভ্রমেরই জ্ঞানে সে পরীক্ষায় সম্মত হয় নাই, সে কথা সুধাময় কল্পনা করিতে পারিত না।

এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে একবার সুধাময় তাহার শ্যালকের নামে কিছু টাকা পাঠাইয়াছিল। কুপনে সুধাময় লিখিয়াছিল 'কর্ত্তব্যের অনুরোধে মাসহারা'। কিন্তু সেই মনিঅর্ডার যখন পৃষ্ঠে তীব্র বিদ্রূপ ও তিরস্কার বহন করিয়া ফেরত আসিল, তখন হইতে সুধাময় সম্পূর্ণভাবে নীরব হইয়া গিয়াছিল।

একদিন আপিস হইতে আসিয়া সুধাময় দেখিল, খামে মোড়া এক-খানা চিঠি আসিয়াছে। ডাকমোহর লক্ষ্য করিয়া দেখিল, লাহোরের ছাপ। একবার মনে হইল, চিঠিখানা না খুলিয়া মনিঅর্ডার ফেরতের পাল্টা জবাব দিলে হয়। কিন্তু কি ভাবিয়া খামখানা ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। সুধাময় মনে যাহা অনুমান করিয়াছিল, চিঠি খুলিয়া দেখিল তাহা নহে। সে চিঠি করুণার, অরুণার বা তাহার শ্যালকের নহে; একজন ইংরাজ ডাক্তারের। নিম্নে নাম স্বাক্ষর রহিয়াছে—ই. এম. বেনেট্। পত্রের মর্ম এইরূপ—

"আপনি বোধ হয় অবগত নহেন, আপনার কন্যা মিস্ করুণা

সাংঘাতিকভাবে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। জীবনের আশা তাহার নাই বলিলেই চলে। তবে কোন অবস্থাতেই রোগীকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে বলিয়া আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি; আপনি পত্র পাঠ আমার লিখিত মতো ব্যবস্থা করিবেন, বিলম্ব করিবেন না। আপনার কন্যার যে বিশেষ কারণে এবং বিশেষ প্রকারের ক্ষয়রোগ হইয়াছে বলিয়া আমি সন্দেহ করিতেছি, তাহা কদাচিৎ কাহারও হইতে শুনা যায়। যদি আমার অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে আমার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। কোন ডাক্তারী বহিতে আমি ইহার উল্লেখ দেখিয়াছিলাম বলিয়া মনে পড়ে। আমার সন্দেহ হওয়ায় মিস্ করুণাকে রণ্ট্‌জেন-রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। তাহার শরীরের কোন একটা বিশেষ স্থলে একটা বিকৃতি আছে। সেই বিকৃতিই তাহার এই ক্ষয়রোগের মূল। এখন এই রোগের আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এ রোগ যেমন কদাচিৎ হইতে দেখা যায়, তেমনি বংশানুগতভাবে ভিন্ন অন্যপ্রকারে হয় না; অর্থাৎ যাহার এই রোগ হইবে, বুঝিতে হইবে, তাহার পিতায় অথবা মাতার কাহারও এই রোগ নিশ্চয় আছে। আপনার পত্নীকে রণ্ট্‌জেন-রে দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাঁহার কোন লক্ষণ নাই। আমার অনুমান সত্য হইলে আপনার শরীরে অল্পই হউক বা অধিকই হউক একটা নিদর্শন পাওয়া যাইবে। সেরূপ কিছু পাওয়া গেলে রোগ নির্ণয় সম্বন্ধে আমার আর কোন সন্দেহ থাকিবে না। বুঝিব, আপনার নিকট হইতেই আপনার কন্যা এই বিকৃতি লইয়া জন্মিয়াছিল, তাহার পর মানসিক কষ্ট বা শারীরিক অসুস্থতা এমনই কোন কারণের জন্য সেই বিকৃতি সহসা বাড়িয়া উঠিয়া আপনার কন্যার স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়াছে; এবং তদনুযায়ী চিকিৎসা করিব। এই পত্রের সহিত ডাক্তারের অবগতির জন্য একটা নোট লিখিয়া পাঠাইলাম। আপনি অবিলম্বে মেডিক্যাল কলেজের কোন অভিজ্ঞ ডাক্তারের দ্বারা আপনার দেহ পরীক্ষা করাইয়া আমাকে ফলাফল জানাইবেন; বিলম্ব করিবেন না, মনে রাখিবেন আপনার কন্যার পক্ষে এখন একদিন এক বৎসরের স্বরূপ।"

পত্র পাঠ করিয়া সুধাময় কিছুক্ষণ দুই বাহুর মধ্যে মাথা গুঁজিয়া। বসিয়া রহিল। এই মর্মান্তিক ঘটনার মধ্য হইতে যে নিদারুণ সত্য নিজেকে প্রকাশ করিবার উপক্রম করিতেছিল, তাহা যদি ঘটিয়া যায়

তাহা হইলে? তাহা হইলে জ্যোতিষ শাস্ত্রের সমস্ত বহিতে আগুন লাগাইয়া নিজেকে পুড়াইয়া মারিলেও উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

সুধাময় তখনই ডাক্তারের পত্র লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। মেডিক্যাল কলেজের একজন বিশিষ্ট অধ্যাপকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরদিন প্রাতে তাহার পরীক্ষার ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

পরদিন প্রাতে ডাক্তার সুধাময়ের হস্তে পরীক্ষার রিপোর্ট দিয়া কহিলেন, "না, আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনার নিকট হ'তেই আপনার কন্যা এ রোগ সঞ্চয় করেছে।"

শুনিয়া সুধাময়ের হৃদয় নিস্পন্দ হইয়া আসিল। সে অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আমি যদি হঠাৎ কোন গুরুতর মনঃকষ্ট পাই, আমার রোগও সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যেতে পারে না কি?"

সুধাময়কে দুর্বলচিত্ত মনে করিয়া ডাক্তার একটু হাসিয়া কহিলেন, "না, আপনি সর্বদা প্রফুল্লচিত্ত থাকবেন।"

ডাক্তার রণ্ট্‌জেন-রের দ্বারা সুধাময়ের ব্যাধিরই সন্ধান পাইয়াছিলেন সেই ব্যাধির আরও নিম্নস্তরে যে গভীর মর্মান্তিক যন্ত্রণা নিহিত ছিল তাহার সন্ধান পান নাই।

এক বৎসর পূর্বে নিউমার্কেটের সম্মুখে সন্ধ্যার সময় গ্যাসের আলোক সুধাময়ের চক্ষে ততটা নিষ্প্রভ মনে হয় নাই, যতটা আজ মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইয়া দিবালোককে সে স্তিমিত দেখিল।

এই এক বৎসর কি অসহ্য যন্ত্রণার মধ্য দিয়া সে কাটাইয়াছে! নিরানন্দ, স্নেহহীন, প্রেমহীন জীবন মহাপাপের নির্মম প্রায়শ্চিত্ত প্রতিনিয়ত ধীরে ধীরে করিয়া লইতেছিল; আজ সহসা নিদারুণভাবে সেই প্রায়শ্চিত্ত উদ্‌যাপনের অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। যাহা অসত্য, যাহা অসম্ভব, যাহা অস্বাভাবিক তাহারই উপর নির্ভর করিয়া সুধাময় যাহাকে অস্বীকার করিয়াছিল, এইরূপ মর্মান্তিক উপায়ে সে প্রমাণ করিতে বসিয়াছে, সে সুধাময়ের পর নহে, সে তাহার নিতান্ত আপনার, সে তাহারই দেহের রক্তমাংসে গঠিত। শুধু তাহাই নহে, একই ব্যাধির ছাপে সেই রক্তমাংস চিহ্নিত।

সেই দিনই আপিসে ছুটি লইয়া রাত্রের ট্রেনে সুধাময় লাহোর যাত্রা করিল।

কিন্তু তিন দিনের দীর্ঘ পথ কষ্টে এবং উদ্বেগে অতিক্রম করিয়া সে যখন করুণার রোগশয্যা-পার্শ্বে উপনীত হইল, তখন করুণার অভিমানক্লিষ্ট জীবনের দুঃখভোগের আর বেশি বাকি ছিল না। সকল ব্যাধিকে যাহা নিরাময় করে, সকল যন্ত্রণার যাহাতে অবসান হয়, সেই মৃত্যুর মধুর আবেশে করুণা তখন জীবন-পারের স্বপ্ন দেখিতেছিল।

সুধাময়কে দেখিয়া তাহার মুখে মৃদু হাসি এবং চক্ষে অশ্রু দেখা দিল। তাহাতে যে কতখানি অভিমান মিশাইয়া ছিল তাহা সুধাময় মর্মে মর্মে অনুভব করিল।

তাহার পর?

তাহার পর দুই ঘণ্টা পরে যখন করুণার ক্লান্ত নয়ন দুইটি সুগভীর নিদ্রাভরে ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া গেল, তখন অব্যক্ত অদ্ভুত বেদনায় সুধাময় ও অরুণা সেই নীরব নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহকে জড়াইয়া ধরিয়া পরস্পর মিলিত হইল।

গিরিকা

সারাদিন পরিশ্রমের পর গৃহে ফিরে জলযোগান্তে দক্ষিণের বারান্দায় একটা ঈজি-চেয়ারে শুয়ে গোষ্ঠবিহারী মিত্র মুখে গড়গড়ার নলটা দিয়েছেন, এমন সময় স্ত্রী মন্দাকিনী উপস্থিত হ'য়ে বললেন, "একটা কথা আছে।"

পাটের দালালি ক'রে গোষ্ঠবিহারী যে অর্থ সঞ্চয় করেছেন, তাতে একটা বড় জমিদারি কিনে রাজাবাহাদুর খেতাবের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। স্ত্রী মন্দাকিনী আধুনিক চলনের নারী; পুত্রকন্যার উচ্চশিক্ষার দিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি। গোষ্ঠবিহারীর দুই পুত্র, এক কন্যা। জ্যেষ্ঠ প্রভাতনাথ গ্ল্যাস্‌গোয় এঞ্জিনীয়ারিং পড়ছে; কনিষ্ঠ প্রদোষনাথ হেয়ার স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাসে, এবং কন্যা মণিমালা বেথুন কলেজে থার্ড ক্লাসে পড়ে।

স্ত্রীর কথা শুনে গোষ্ঠবিহারী বুঝলেন, কথা মানে অনুরোধ; বললেন, "কি কথা বল?"

একটু চিত্তদ্রাবক হাসি হেসে মন্দাকিনী বললেন, "মণির ম্যাট্রিক দেবার তো আর বছর তিনেক রইল; তার পড়ার একটু ভাল ব্যবস্থা না করলে ভাল ক'রে পাস করবে কেমন ক'রে? মণির স্কুলের একটি টিচারকে দিয়ে আমি একটি মেয়ে যোগাড় করেছি। মেয়েটি প্রাইভেটে বি. এ. দেবে। ভারি চমৎকার মেয়ে, রূপে যেমন লক্ষ্মীপ্রতিমা, কথাবার্তা তেমনি মিষ্টি। দেখবে?"

"বাড়িতে আনিয়েছ নাকি?"

"আনিয়েছি।"

গড়গড়ায় দুটো লম্বা লম্বা টান দিয়ে গোষ্ঠবিহারী বললেন, "মাইনে কত দিতে হবে?"

মন্দাকিনী বললেন, "যোগ্যতা হিসেবে সে এমন কিছুই নয়। খাওয়া, থাকা আর মাসে মাসে কুড়ি টাকা হাত-খরচ।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে গোষ্ঠবিহারী বললেন, "থাকা! সে আমাদের বাড়িতে থাকবেও নাকি?"

"থাকাটাই তো তার সব চেয়ে বেশি দরকার। মামার বাড়ি থেকে লেখাপড়া করত—মামা কিছুদিন হ'ল মারা যাওয়ায় কলকাতার পাট উঠে গেছে। আত্মীয় বলতে আছে এক দূর-সম্পর্কের জেঠা—তিনি জবাব দিয়েছেন আশ্রয় দিতে পারবেন না,—বোধ হয় পাছে বিয়ের খরচ ঘাড়ে পড়ে সেই ভয়ে। কোন ভদ্রপরিবারে আশ্রয়ই তার সব চেয়ে বেশি দরকার।"

গোষ্ঠবিহারী আর কিছু না ব'লে গড়গড়ায় আবার বড় বড় টান দিতে লাগলেন। লক্ষণ শুভ অনুমান ক'রে মন্দাকিনী মেয়েটিকে এনে হাজির করলেন।

নত হয়ে গোষ্ঠবিহারীর পদধূলি গ্রহণ ক'রে মেয়েটি যখন সোজা হ'য়ে দাঁড়াল, তার কমনীয় মূর্তির অপরিসীম মাধুর্যে গোষ্ঠবিহারীর চিত্ত দীপ্ত হ'য়ে উঠল।

"তোমার নাম কি মা?"

সুমিষ্ট কণ্ঠে মেয়েটি বললে, "গিরিকা। গিরিকা বসু।"

গোষ্ঠবিহারী মনে মনে বললেন, গিরিকা না হ'য়ে গিরিজা হ'লে মনে হ'ত উমাই বুঝি ঘরে এল! মুখে বললেন, "আচ্ছা মা, তুমি মণিকে পড়াবে।"

স্থির হ'য়ে গেল পরদিন জিনিস-পত্র নিয়ে গিরিকা আসবে।

সন্ধ্যার পর প্রদোষ বাড়ি ফিরতেই মণিমালা তার কাছে উপস্থিত হ'য়ে বললে, "শুনেছ ছোড়দা, আমার টিচার আমাদের বাড়িতেই থাকবেন। একটু আগে এসেছিলেন। কাল একেবারে জিনিস-পত্র নিয়ে আসবেন। নাম কি জান?—গিরিকা, গিরিকা বসু।"

অবহেলা ভরে প্রদোষ বললে, "গিরিকা আবার মেয়েমানুষের নাম হয়! যা-তা।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে মণিমালা বললে, "যা-তা কি গো? বেশ মিষ্টি নাম।"

প্রদোষ বললে, "একটুও মিষ্টি নয়—বিশ্রী। তা হ'লে দেশের মধ্যে গিরিডিও খুব মিষ্টি নাম?" ব'লে হেসে উঠল।

অপ্রস্তুত হ'য়ে মণিমালা বললে, "মিষ্টিই তো।"

"মধুপুরের চেয়েও মিষ্টি?"

আর তর্ক চলল না,—মুখ অত্যন্ত গম্ভীর ক'রে মণিমালা বললে, "খবরদার ছোড়দা, গিরিকাদিদির কাছে গিরিডির নাম মুখে এনো না।"

উৎফুল্ল নেত্রে প্রদোষ বললে, "মুখে আনব না? খুব আনব। বলব, গিরিকা বসুর বাড়ি গিরিডি নগরী।"

"চললুম মাকে বলতে।"—ব'লে মণিমালা সক্রোধে প্রস্থান করলে।

পাঁচ মিনিট পরে প্রদোষ চেঁচিয়ে উঠল, "ইঁদুর! ইঁদুর! নেঙটি ইঁদুর! গিরিকা মানে নেঙটি ইঁদুর।"

দূর থেকে প্রদোষের হাতে একটা মোটা অভিধান দেখে মণিমালা আরক্ত মুখে ছুটে এল। "কক্ষনো নয়।"

"এই দেখ্!"

প্রদোষের তর্জনীর উপরের লেখা পাঠ ক'রে মণিমালার মুখ পাংশু হ'য়ে গেল। সত্যিই গিরিকা মানে নেঙটি ইঁদুর। পর-মুহূর্তেই সে চেঁচিয়ে উঠল, "হাত সরাও, দেখব নীচে কি লেখা আছে।"

শক্ত ক'রে অভিধানের উপর হাত চেপে রেখে প্রদোষ বললে, "এই তো—নেঙটি ইঁদুর।"

খপ ক'রে প্রদোষের হাত থেকে অভিধানখানা টেনে নিয়ে লুকানো অংশ প'ড়ে মণিমালা ব'লে উঠল, "তবে?"

"তবে আবার কি? নেঙটি ইঁদুরও ত হয়।"

"নেঙটি ইঁদুরের কথাও তুমি গিরিকাদিদিকে বলবে নাকি?"

"বলব না? বলব, গিরিকা বন্ধুর ঘর গিরিড়ি বিবর। বিবর মানে গত্তো।"

রুষ্ট মুখে মণিমালা বললে, "জানি। কিন্তু দেখ ছোড়দা, তুমি যদি গিরিকাদিদির কাছে গিরিড়ি কিংবা ইঁদুরের নাম মুখে আন তা হ'লে আর যদি কখনো তোমার পিঠ চুলকে দিই!"

এ দণ্ডটা প্রদোষের পক্ষে সত্যই গুরুদণ্ড; বললে, "আচ্ছা, আজ যদি আধ ঘণ্টা পিঠ চুলকে দিস তা হ'লে বলব না। কিন্তু পাকা আধ ঘণ্টা —ঘড়ি ধ'রে।"

মণিমালা স্বীকৃত হ'ল। বললে, "ছোড়দা, তুমিও গিরিকাদিদির কাছে একটু একটু প'ড়ো না?"

বিস্ময়ে প্রদোষ আকাশ থেকে প'ড়ে বললে, "মেয়েমানুষের কাছে আমি পড়ব কি রে!"

"মেয়েমানুষ কি? বি. এ. পড়েন।"

কথাটা শুনে প্রদোষ একটু দ'মে গেল—পর-মুহূর্তেই জোর ক'রে বললে, "পড়ুক বি. এ.,—ও মেয়েমানুষের বি. এ.।"

বিস্মিত হ'য়ে মণিমালা বললে, "বি. এ. আবার মেয়েমানুষের বেটাছেলের কি?"

বিজ্ঞভাবে প্রদোষ বললে, "মেয়েমানুষের বি. এ. সহজ হয়। আচ্ছা, তুই তো থার্ড ক্লাসে পড়িস, বল দেখি It is too hot today—এর কারেক্ট্ ইংরিজি কি হবে?"

মণিমালা মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। বললে, "এ ত এখনি আমি ব'লে দিতে পারি ছোড়দা, কিন্তু আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি I have an important business to do-র কারেক্ট্ ইংরিজি কি, তুমি কি বলবে বল দেখি?"

জিজ্ঞাসা করলে যে সবিশেষ বিপদ তাতে প্রদোষের সন্দেহ ছিল না; বললে, "তোর ত বড় আস্পর্ধা বেড়েছে দেখছি! তুই আমাকে জিজ্ঞাসা করিস!"

সহাস্য মুখে মণিমালা বললে, "আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করব না।"

২

পরদিন স্কুল থেকে এসে বই রাখতে গিয়ে প্রদোষ দেখলে, তার পড়বার ঘরে চেয়ারের উপর ব'সে টেবিলের উপর হেলান দিয়ে গিরিকা জানলার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার মুখের বাঁ দিকের মাত্র আধখানা দেখা যাচ্ছে—কিন্তু তারই শক্তি কত! এক পা চৌকাঠের ভিতরে আর এক পা বাইরে রেখে প্রদোষ থমকে দাঁড়াল।

একটু যা পায়ের শব্দ হয়েছিল তাইতে গিরিকা ফিরে দেখলে, একটি ষোল-সতের বছরের লম্বা ছিপছিপে সুশ্রী শ্যামবর্ণ ছেলে হাতে একগোছা বই নিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখোচোখি হ'তেই প্রদোষের মুখ লাল হ'য়ে উঠল।

মৃদু হেসে গিরিকা বললে, "ঘরখানি অধিকার ক'রে বসেছি। বড় অসুবিধে হবে—না?

একটু বিমূঢ় ভাবে স্খলিত কণ্ঠে প্রদোষ বললে, "না, এমন কি আর—"

গিরিকা বললে, "হ'লে উপায়ই বা কি? আশ্রয় যখন দিয়েছ, তখন কষ্ট সহ্য করতেই হবে।"

প্রদোষের মুখ লাল হ'য়ে উঠল, বললে, "না, না, কষ্ট কি?"

গিরিকা বললে, "দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ভেতরে এসে ব'স না? বাড়ির সকলেরই সঙ্গে আলাপ হয়েছে, খালি তোমাকেই এ পর্যন্ত দেখি নি, তোমার কথা কিন্তু অনেক শুনেছি মণিমালার কাছে। ঘরে এস।"

মোটের উপর সমস্ত ব্যাপারটায় প্রদোষের ভারি সঙ্কোচ বোধ হচ্ছিল, কিন্তু এ আহ্বান প্রত্যাখ্যানও করতে পারলে না। ঘরে প্রবেশ ক'রে একখানা চেয়ার একটু দূরে টেনে নিয়ে বসল।

গিরিকা আর কোন কথা না ব'লে চুপ ক'রে ব'সে রইল। এক মিনিট, দু মিনিট, তিন মিনিট কেটে গেল টুঁ শব্দটি নেই। প্রদোষ বিস্ময়ে অধীর হ'য়ে মনে মনে বলতে লাগল, আচ্ছা লোক যা হোক! ঘরে ডেকে এনে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন! এ রকম চুপ ক'রে কতক্ষণ ব'সে থাকা যায়! তারপর হঠাৎ তার মনে হ'ল প্রতিবারে গিরিকাই যে কথা আরম্ভ করবে তারই বা কি মানে আছে, সেও তো আরম্ভ

করতে পারে, বিশেষত তাদেরই গৃহে, এমন কি তারই ঘরে গিরিকা যখন অতিথি।

একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে সে বললে, "তুমি আজ দুপুরবেলা এলে?"

ফিরে তাকিয়ে গিরিকা বললে, "হ্যাঁ।" সমস্ত মুখখানা তার কৌতুকের মিষ্ট হাস্যে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল; ঠিক যেন সন্ধ্যা-শ্যামল ফুলবাগানের উপর অকস্মাৎ এক ঝলক সার্চলাইটের আলো এসে পড়ল। প্রদোষের অসঙ্কোচ 'তুমি' সম্বোধন এতই তার মিষ্টি লেগেছিল।

ঘরের এক পাশে একটা খাট পেতে তার উপর গিরিকার শয্যা রচিত হয়েছিল। খাটের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে প্রদোষ বললে, "এই ঘরেই রাত্রে শোবে?"

স্মিতমুখে গিরিকা বললে, "হ্যাঁ।"

"বি. এ. দেবে এবার?"

হেসে ফেললে গিরিকা; বললে, "হ্যাঁ। কিন্তু সে-সব কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন, যার উত্তর তুমি নিজেই জান? এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা কর, যার উত্তরে নতুন কথা শুনতে পাবে।"

লজ্জিত হ'য়ে প্রদোষ শুধু একটু হাসলে, কিছু বললে না। একটু পরেই সে যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াল।

গিরিকা বললে, "এরই মধ্যে চললে? আর একটু বসবে না?"

প্রদোষ বললে, "মুখ হাত ধুয়ে জল-টল খেয়ে আবার না-হয় আসব অখন।"

ব্যস্ত হ'য়ে গিরিকা বললে, "ও মা, সত্যি! সে কথা আমার একেবারেই খেয়াল হয় নি। যাও, যাও শীগগির যাও।"

বইগুলো হাতে তুলে নিয়ে প্রদোষ গমনোদ্যত হ'ল, তারপর কি মনে ক'রে পিছন ফিরে গিরিকার দিকে তাকিয়ে বললে, "বইগুলো খানিকক্ষণের জন্যে এখানে রাখলে কোন অসুবিধে হবে?" বোধহয় মনের গোপনে মতলব ছিল আর একবার গিরিকার ঘরে আসবার পথ রেখে যাওয়া।

গিরিকা বললে, "খানিকক্ষণের জন্যে কেন, বরাবরের জন্যে রাখলেও কোন অসুবিধে হবে না। টেবিলের ওপর রেখে যাও।"

টেবিলে বইগুলো স্থাপিত ক'রে প্রদোষ প্রস্থান করলে।

পিছন থেকে গিরিকা ডাকলে, "প্রদোষ! প্রদোষবাবু!"

দ্বারের কাছ থেকে ফিরে এসে প্রদোষ বললে, "কি?"

অত্যন্ত গম্ভীরমুখে গিরিকা বললে, "বই রেখে যাচ্ছ যাও, কিন্তু এ ঘরে নেঙটি ইঁদুরের উপদ্রব আছে।"

প্রদোষ বললে, "নেঙটি ইঁদুর? না, না—একেবারেই—" তারপর হঠাৎ খেয়াল হ'তে আসল কথাটা বুঝতে পেরে প্রদোষের মুখের কথাটা মুখেই র'য়ে গেল, মুখ একেবারে টকটকে লাল হ'য়ে উঠল।

গিরিকা হাসতে হাসতে বললে, "যাও, যাও, তোমার কোন ভয় নেই। গিরিডি বিবরের নেঙটি ইঁদুর তোমার বই কাটবে না—হয়ত একটু ঘাঁটবে।"

ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে ব্যথিত স্বরে প্রদোষ বললে, "গিরিকা, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ?"

হাসতে হাসতে গিরিকা বললে, "ওমা, তাও কি কখন করি! পরিচয় পাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে অভিধান খুলে নামের মানে বার করে, তার ওপর কখনও রাগ হয়?"

"এ সত্যি কথা?"

"একেবারে খাঁটি সত্যি।"

"গিরিকার কিন্তু ভাল মানেও আছে।"

"নেঙটি ইঁদুরই গিরিকার সব চেয়ে ভাল মানে। তুমি এখন যাও, মুখ বড্ড শুকিয়ে গেছে।"

আর কোন কথা না ব'লে প্রদোষ ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল, তারপর ত্বরিত বেগে মণিমালার কাছে উপস্থিত হ'য়ে একেবারে তার বিলম্বিত বেণী টেনে ধ'রে বললে, "স্টুপিড!"

এই অতর্কিত আক্রমণে কাতর হ'য়ে মণিমালা আর্তস্বরে ব'লে উঠল, "আঃ, লাগছে! ছাড়ো, ছাড়ো।"

আর একটু টান দিয়ে প্রদোষ বললে, "ছাড়ি, কি ছিঁড়ি দেখাচ্ছি! কেন তুই গিরিকাকে নেঙটি ইঁদুরের কথা বলেছিস বল্?"

প্রদোষের কথা শুনে মণিমালা হেসে ফেললে; বললে, "এরই মধ্যে সে কথা শোনা হয়েছে? বিউনি ছাড়, বলছি।"

বেণী ছেড়ে দিয়ে সক্রোধে প্রদোষ বললে, "বল্।"

স্মিতমুখে মণিমালা বললে, "কথায় কথায়। কিন্তু গিরিকাদিদি ত সে কথায় একটুও রাগ করেন নি।"

তর্জন ক'রে প্রদোষ বললে, "আর যদি করত ?"

"তা হ'লে তোমার কি ক্ষতি হ'ত বল ?"

প্রশ্ন কঠিন। উত্তর দেবার কোন চেষ্টা না ক'রে বিকৃত স্বরে প্রদোষ মণিমালার প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করলে, "তা হ'লে তোমার কি ক্ষতি হ'ত বল ?"

প্রদোষের ক্রোধের অভিব্যক্তি দেখে মণিমালা ভুরু কুঁচকে হাসতে লাগল।

দেখে প্রদোষের পিত্ত উঠল জ্ব'লে, "মেয়েমানুষের বি. এ. পাসের কথাও বলেছিস ?"

পরিতাপের ব্যথায় মণিমালার মুখ ম্লান হ'য়ে গেল। দুঃখার্তস্বরে বললে, "যাঃ! একেবারে ভুলে গেছি!"

অত্যন্ত কঠোর ভাব প্রকাশ করবার চেষ্টা ক'রে প্রদোষ বললে, "খবরদার ও-কথা বলবি নে।"

ততোধিক তাচ্ছল্যভাবে মণিমালা বললে, "নিশ্চয়ই বলব। তুমি মেয়েমানুষের বিদ্যে হয় না ব'লে নিন্দে করবে,—আর আমি বলব না ? তুমি বল, গিরিকাদিদির কাছে রোজ এক ঘণ্টা ক'রে পড়বে, তা হ'লে বলব না।"

প্রদোষ স-রবে আস্ফালন ক'রে উঠল, "কক্ষনো পড়ব না। বেটা-ছেলে হ'য়ে মেয়েমানুষের কাছে পড়ব ? তার চেয়ে পড়া ছেড়ে দিয়ে পানের দোকান ক'রে বসব সেও ভাল।"

"তা হ'লে ব'লে দেব।"

দিস ব'লে; আমি ভয় করি নে। বাড়িতে ভদ্রলোক এসেছে—"

মণিমালা হেসে গড়িয়ে পড়ল,—"ভদ্রলোক কি ছোড়দা ? ভদ্রমহিলা।"

"আচ্ছা—আচ্ছা, ভদ্রমহিলা।"

এমন সময় দেখা গেল, অদূরে সেই ভদ্রমহিলাই হাসতে হাসতে অগ্রসর হচ্ছেন। আর মুহূর্ত মাত্র বিলম্ব না ক'রে ক্রুদ্ধ অথচ চাপা

গলায় প্রদোষ বললে, "আধ ঘণ্টা ক'রে পড়ব। খবরদার ও-কথা বলিস নে।"

"জব্দ!"

মণিমালার প্রতি একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রে প্রদোষ স'রে পড়ল।

৩

মাস খানেক পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় মন্দাকিনী তাঁর স্বামীকে হাসতে হাসতে বলছিলেন, "হ্যাগা, তোমার ছেলে যে গিরিকাকে নিয়ে ক্ষেপে উঠল! এ কি ব্যাপার বল দেখি? প্রেম নয় তো?"

গড়গড়ায় একটা লম্বা টান দিয়ে গোষ্ঠবিহারী বললেন, "কি বল তার ঠিক নেই! গিরিকা হ'ল পদোর চেয়ে তিন বছরের বড়।"

একটু হেসে মন্দাকিনী বললেন, "হ'লেই বা। এ কি তোমার তোলবাটখারা? বয়সের হিসেবে এর হিসেব সব সময় চলে না।"

নলটা মুখ থেকে খুলে নিয়ে গোষ্ঠবিহারী বললেন, "বেগতিক দেখ ত মেয়েটাকে না হয় ছাড়িয়ে দাও।" এটা কিন্তু অন্তরের কথা নয়।

মন্দাকিনী বললেন, "ও-কথা মুখে আনলে তোমার ছেলেমেয়ে দুজনে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেবে। তা ছাড়া, মেয়েটা সত্যিই ভাল। ও যে মেয়ে তাই সয়, অন্য মেয়ে হ'লে পদোর সেবাযত্নের পীড়নে চাকরি ছাড়ত। তা ছাড়া, এই এক মাসে মণির যা উন্নতিটা করিয়েছে তা যদি দেখতে!"

স্বামী-স্ত্রীতে যখন এইরূপ আলোচনা চলছিল, তখন গিরিকার ঘরে প্রদোষ ঐকান্তিক আগ্রহে গিরিকাকে জিজ্ঞাসা করছিল, "আচ্ছা গিরিকা, তুমি সর্বদা অত কি ভাবো?"

স্মিতমুখে গিরিকা বললে, "এমনি—যা-তা।"

"যা-তা? মিছিমিছি ভাবো!"

"না, সত্যি সত্যি ভাবি।"

ব্যগ্র হ'য়ে প্রদোষ বললে, "না, সে কথা বলছি নে। কিছু নিয়ে ভাবো কি-না তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"কখনও কিছু নিয়ে ভাবি, কখনো বা কিছু দিয়ে ভাবি।"

সবিস্ময়ে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "দিয়ে ভাবা আবার কি ?"

গিরিকা হেসে বললে, "নিয়ে ভাবার উল্টো।"

একটু চুপ ক'রে থেকে প্রদোষ বললে, "তোমার সব কথা আমি বুঝতে পারি নে গিরিকা।"

"তার মানে আমার সব কথা বোঝাবার ক্ষমতা নেই।"

"কিংবা আমার সব কথা বোঝবার ক্ষমতা নেই।"

গিরিকা হেসে বললে, "তাও হ'তে পারে।"

"আচ্ছা গিরিকা, তোমার কিছু খেতে ইচ্ছে হয় ?"

"হয়।"

অধীর ঔৎসুক্যে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "হয় ?—কি খেতে ইচ্ছে হয় ?"

কোন একটা ভাল হোমিওপ্যাথিক ওষুধ—নাক্সভমিকা টু হানড্রেড, কিংবা ডাল্‌কামারা থার্টি—এই রকম একটা কিছু।"

সভয়ে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "তোমার কোন অসুখ আছে নাকি ?"

"আছে বইকি।"

ব্যগ্র হ'য়ে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "কি অসুখ ? শরীরের—না, মনের ?"

"খানিকটা শরীরের, খানিকটা মনের।"

ভ্রুকুঞ্চিত ক'রে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "সে আবার কি রকম ?"

গিরিকা হেসে বললে, "মনের জন্যে খানিকটা শরীরের, আর শরীরের জন্যে খানিকটা মনের।"

"তাতে কষ্ট কি রকম হয় ?"

"কখনো পেট জ্বালা করে, কখনো বুক জ্বালা করে।"

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে প্রদোষ বললে, "আচ্ছা, তোমার একলা থাকতে ভাল লাগে—না, লোকজন থাকলে ভাল লাগে ?"

গিরিকা বললে, "কোন কোন লোক থাকার চেয়ে একলা থাকতে ভাল লাগে, আবার একলা থাকার চেয়ে কোন কোন লোক থাকলে ভাল লাগে।"

প্রদোষ দেখলে, কথার এ মোড়ে আর বেশিদূর অগ্রসর হওয়া

নিরাপদ নয়। জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা, কথা কইতে ভাল লাগে—না, চুপ ক'রে থাকতে ভাল লাগে ?"

গিরিকা হেসে বললে, "রোগের লক্ষণ নির্ণয় করছ নাকি প্রদোষ ? কারুর কারুর সঙ্গে কথা কওয়ার চেয়ে চুপ ক'রে থাকতে ভাল লাগে, আবার চুপ ক'রে থাকার চেয়ে কারুর কারুর সঙ্গে কথা কইতে ভাল লাগে।"

এ মোড়ও নিরাপদ নয়। একবার ভারি ইচ্ছা হ'ল জিজ্ঞাসা করে—সে কোন্ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে, কিন্তু সাহস হ'ল না। উঠে প'ড়ে বললে, "চললুম গিরিকা।"

প্রদোষের মনের কথা বুঝতে পেরে গিরিকা হাসিমুখে বললে, "এরই মধ্যে চললে ? আমি তো বলি নি প্রদোষ, তুমি থাকলে বা তুমি কথা কইলে আমার ভাল লাগে না।"

অপ্রতিভ হ'য়ে প্রদোষ বললে, "না, না, সে জন্যে নয়—এমনি।" তারপর সাহস পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা গিরিকা, আমি কোন্ দলের ? আমি থাকলে, আমি কথা কইলে, তোমার ভাল লাগে—না, ভাল লাগে না ?"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে গিরিকা বললে, "তুমি একেবারে ভিন্ন দলের প্রদোষ। তুমি থাকলে মনে হয় কখন যাবে, আবার গেলে মনে হয় কখন আসবে। তুমি কথা কইলে মনে হয় কখন থামবে, আবার থামলে মনে হয় কখন কথা কইবে।"

এই গোলমেলে কথার অর্থ নিরূপণের জন্যে এক মিনিট নির্নিমেষে তাকিয়ে থেকে বিমূঢ়ভাবে প্রদোষ বললে, "এ রকম কেন মনে হয় ?"

গিরিকা হেসে বললে, "বোধহয় মনের কোনো রকম ব্যাধির জন্যে।"

"এ সারে কি করলে ?"

"হয়ত এক ডোজ ডাল্‌কামারা খেলে।"

পরদিন বেলা বারোটার সময় একজন বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার এসে উপস্থিত। ইনি গোষ্ঠবিহারীর গৃহ-চিকিৎসক। গোষ্ঠ-বিহারী আপিসে, প্রদোষ মণিমালা স্কুলে, বাড়িতে কেবল মন্দাকিনী আর গিরিকা। কারো সর্দি মাথাধরা পর্যন্ত নেই ; কাকে দেখবার জন্যে

ডাক্তার এসেছেন মন্দাকিনী জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালেন। উত্তর এল, গিরিকাকে।

চক্ষু কপালে তুলে গিরিকা বললে, "দেখ দেখি মা, প্রদোষের এ কি কাণ্ড! ঠাট্টা ক'রে কাল কি বলেছিলাম, একেবারে ডাক্তারকে খবর দিয়ে হাজির।"

সহাস্য-মুখে মন্দাকিনী বললেন, "তোমার কোনো অসুখ-টসুখ আছে না-কি?"

"কিছু না, খুব চমৎকার আছি।"

মন্দাকিনী হাসতে লাগলেন; বললেন, "ওর কাণ্ডই ঐ রকম। যা হোক, ডাক্তার যখন বাড়িতে এসেছেন একবার দেখাও।"

ত্রস্তভাবে গিরিকা বললে, "সে কি মা! কি দেখাব?"

সহাস্য-মুখে মন্দাকিনী বললেন, "পেট কামড়ায়, চোঁয়া ঢেঁকুর ওঠে—এমনি যা হয় কিছু ব'লো।"

প্রথমে গিরিকা প্রবলভাবে আপত্তি করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ডাক্তারের সামনে তাকে উপস্থিত হ'তেই হ'ল। মন্দাকিনী বললেন, "না হ'লে বড় খারাপ দেখায়।"

গিরিকার নাড়ী দেখে, পেট টিপে ডাক্তার বললেন, "একবার জিভটা দেখাও ত মা।"

রাগে গিরিকার পিত্ত জ্ব'লে যাচ্ছিল, কিন্তু উপায় কি?—জিভ দেখালে। জিভ দেখতে গিয়ে ডাক্তার ঔৎসুক্যভরে ব'লে উঠলেন, "ব'সো ব'সো মা, তোমার টন্‌সিল দুটো দেখি।" একটু চেঁচিয়ে বললেন, "একটা চামচে।"

অন্তরালে দাঁড়িয়ে মন্দাকিনী যুগপৎ করুণা এবং কৌতুকে মথিত হচ্ছিলেন; একটা চামচে পাঠিয়ে দিলেন।

ডাক্তার চামচেটা গিরিকার গলার ভিতর চেপে ধরা মাত্র গিরিকা খক্‌ ক'রে কেশে উঠল।

পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে মুখ মুছে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার কি হয় মা?"

একটু চুপ ক'রে থেকে গিরিকা বললে, "পেট কামড়ায়।"

"খাবার আগে—না, খাবার পরে?"

"খাবার আগে।"

"ওপর পেট—না, তলপেট ?"

"তলপেট।"

"ডান দিক—না, বাঁ দিক ?"

"ডান দিক।"

এইভাবে আরও অনেকগুলি প্রশ্ন ক'রে ডাক্তার বললেন, "আচ্ছা মা, তুমি ডাল্‌কামারার কথা বলেছ কেন ? আমি ত ডাল্‌কামারার কোন লক্ষণ পাচ্ছি নে।"

ডাক্তারের কথায় গিরিকার মুখ টকটকে লাল হ'য়ে উঠল।

এক মুহূর্ত উত্তরের জন্যে অপেক্ষা ক'রে ডাক্তার বললেন, "ডাল্‌কামারা এখন থাক্। আমি অন্য একটা ওষুধ দিচ্ছি—খেয়ে কেমন থাক এক সপ্তাহ পরে খবর দিয়ো—তারপর দরকার হ'লে আবার ওষুধ দেব।"

ওষুধের বাক্স খুলে একটা ওষুধ তুলে নিয়ে ডাক্তার বললেন, "একবার হাঁ কর ত মা।"

স্তম্ভিত হ'য়ে গিরিকা ক্ষণকাল ডাক্তারের দিকে চেয়ে থেকে হাঁ করলে। তার জিভের উপর ডাক্তার কয়েক ফোঁটা ওষুধ ফেলে দিলেন।

গিরিকার চক্ষু সজল হ'য়ে উঠল, তা সে ওষুধের ঝাঁজে, কি ক্রোধের ঝাঁজে বলা কঠিন।

স্কুল থেকে এসেই প্রদোষ গিরিকার ঘরে উপস্থিত হ'ল। টেবিলের উপর ঝুঁকে গিরিকা একটা বই পড়ছিল।

পিছন থেকে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "ডাক্তার দেখে কি বললেন গিরিকা ?"

ফিরে তাকিয়ে গিরিকা তর্জন ক'রে উঠল, "যাও যাও, প্রদোষ, তুমি ভারি ছেলেমানুষ। কে তোমাকে বলেছিল ডাক্তার ডাকতে ?"

"কেউ বলে নি, আমি নিজেই ডেকেছিলাম। ডাক্তার কি করলেন বল না ? ডাল্‌কামারাই দিলেন ?"

ঠিক তেমনিভাবে গিরিকা তর্জন ক'রে বললে, "আরে, রেখে দাও তোমার ডাল্‌কামারা। কোথা থেকে এক মানুষ-মারা ডাক্তার এনেছিলে, আধ শিশি স্পিরিট জিভে ঢেলে দিলে, দম আটকে মরি আর কি !"

দু-দুবার তাড়না খেয়ে প্রদোষের চোখ ছলছলিয়ে এল। দুঃখিত স্বরে বললে, "আমি বুঝতে পারি নি—আমাকে মাপ কর গিরিকা।"

গিরিকার চোখের কোণে হাসি উছলে উঠল; বললে, "মাপ করব কেন প্রদোষ? তোমার ডাক্তারের ওষুধ ভাল। এরই মধ্যে উপকার পেয়েছি। সমস্ত দিন খালি মনে হয়েছে, কখন তুমি আসবে—আর এখন একটুও মনে হচ্ছে না, কখন তুমি যাবে। তা ছাড়া মনে হচ্ছে, আজ সমস্ত সন্ধ্যেটা তোমার সঙ্গে গল্প ক'রে কাটাব।"

"সত্যি?"

"একেবারে।"

"আচ্ছা, আধ ঘণ্টার মধ্যে আসছি।" ব'লে উৎফুল্ল মুখে প্রদোষ প্রস্থান করলে।

৪

এমনি ভাবে একটি অপরূপ ছন্দের মধ্য দিয়ে এ দুটি প্রাণীর নিত্যকার জীবন প্রবাহিত হ'য়ে চলল। মন্দাকিনী মাঝে মাঝে বলেন, "কিছু বুঝি নে বাপু। শেষকালে একটা কিছু গোলযোগ না ঘটে!" গোষ্ঠবিহারী বলেন, "ওগো, না, না, তাও কখনো হয়? গিরিকার চেয়ে বয়সে তিন বছরের ছোট।"

মাস চার-পাঁচ পরে একদিন হঠাৎ হায়দ্রাবাদ থেকে একেবারে দুখানি চিঠি এসে হাজির, একখানা গোষ্ঠবিহারীর নামে গিরিকার জেঠামহাশয়ের, অপরখানা গিরিকার নামে গিরিকার জেঠাইমার। উভয় পত্রের মর্ম,—গিরিকার সমস্ত বিবরণ শুনে হায়দ্রাবাদ কলেজের একটি প্রোফেসার বিনা পণে গিরিকাকে জীবনসঙ্গিনী করতে প্রস্তুত; মধ্যে কার্তিক মাস, অগ্রাণ মাসে বিবাহ—অতএব গোষ্ঠবিহারী যেন অন্তত অগ্রাণ মাসের প্রথম সপ্তাহে গিরিকাকে হায়দ্রাবাদ পাঠিয়ে দেন।

এ কথা শুনে প্রদোষের মুখ শুকিয়ে গেল—সে গিরিকার কাছে উপস্থিত হ'য়ে তার হাত চেপে ধ'রে কাতরকণ্ঠে বললে, "তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না গিরিকা। তোমার যাওয়া হবে না।"

গিরিকা হাসতে লাগল; বললে, "তুমি যদি আমার চেয়ে তিন বছরের ছোট না হ'তে প্রদোষ, তা হ'লে আমি না হয় তোমাকে বিয়ে ক'রে তোমার কাছেই থাকতাম। কিন্তু তা ত আর হবার নয়। এমন চমৎকার সম্বন্ধটি হাতছাড়া ক'রে শেষকালে আমার কপালে এমনটি আর যদি না জোটে? তখন?"

ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে প্রদোষ বললে, "কিন্তু বিয়ে যে তোমাকে করতেই হবে, তার কি মানে আছে? তুমি যদি বিয়ে না কর—এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি গিরিকা, আমিও কক্ষনো বিয়ে করব না।"—ব'লে আবার গিরিকার হাত চেপে ধরলে।

এবার আর গিরিকা হাসতে পারলে না, তার দুই চক্ষু সজল হ'য়ে উঠল; স্নিগ্ধকণ্ঠে বললে, "সত্যি প্রদোষ, বিয়ে ছাড়াও যে এত বড় একটা উপায় আছে, তা আমার মনেই হয় নি। কিন্তু এতেও অনেক ভাববার কথা আছে।"

ব্যগ্রভাবে প্রদোষ জিজ্ঞাসা করলে, "আবার কি ভাববার কথা?"

"প্রথমত ধর, মণি ত চিরকালই পড়বে না—আমার খরচ-পত্র চলবে কি ক'রে?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে প্রদোষ বললে, "শোন কথা! আমিই কি চিরকাল পড়ব? আমি উপার্জন করব না?"

এবার আবার গিরিকার মুখে হাসি দেখা দিলে, বললে, "হ্যাঁ, সেও একটা ভাববার কথা বটে। যাক, এখন স্কুলের সময় হয়েছে, স্কুলে যাও, পরে দুজনে মিলে সব কথা ভেবে দেখলেই হবে।"

পরদিন অতি প্রত্যুষে গিরিকার দ্বারে আঘাত পড়ল—"গিরিকা! গিরিকা!"

ঘুম ভেঙে তাড়াতাড়ি দোর খুলে গিরিকা দেখলে, উৎফুল্ল মুখে প্রদোষ দাঁড়িয়ে।

বিস্মিত হ'য়ে গিরিকা বললে, "কি প্রদোষ; এত সকালে, ব্যাপার কি বল দেখি?"

সহাস্য-মুখে প্রদোষ বললে, "সমস্ত রাত্রে পাঁচ মিনিটও কি ঘুমিয়েছি? খালি ভেবেছি। কিন্তু অবশেষে হয়েছে গিরিকা, এখন তুমি রাজি হ'লেই হয়।"

সবিস্ময়ে গিরিকা বললে, "কি হয়েছে, কি হয়, কিছুই তো বুঝতে পারছি নে প্রদোষ। এস, ঘরে এস।"

ঘরে গিয়ে প্রদোষ আর গিরিকা মুখোমুখি দুটো চেয়ার অধিকার ক'রে বসল। উষার অনুজ্জ্বল কিরণে সমস্ত ঘরটা মনোরম হ'য়ে উঠেছিল।

প্রদোষ বললে, "দাদা দিন পনেরো পরে দু মাসের জন্যে আসছে শুনেছ ত?"

"শুনেছি।"

"দাদার সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে তোমাকে আমার ছাড়তে হয় না; দাদাকে বিয়ে করতে তুমি রাজি আছ কি-না? দাদাকে তোমার পছন্দ হয়?"

গিরিকা হাসতে লাগল; বললে, "পছন্দ হয় না? অমন বর, এমন ঘর—খুব পছন্দ হয়। কিন্তু তোমার দাদার যে আমাকে পছন্দ হবে তার কি মানে আছে?"

ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে প্রদোষ বললে, "ঈস! তোমাকে দাদার পছন্দ হবে না?" একদৃষ্টে একটুখানি গিরিকার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, "পেলে বেঁচে যাবে, আর বলে কি না—পছন্দ হবে তার কি মানে আছে?"

শুনে গিরিকা হাসতে লাগল; বললে, "বেশ ত। তোমার বউ না হয়ে বউদিদি হ'লেও আমি খুশি হব। তখন তোমাকে প্রদোষ ব'লে না ডেকে লক্ষ্মণ ব'লে ডাকব।"

প্রসন্নমুখে প্রদোষ বললে, "আচ্ছা তা ডেকো, কিন্তু এ কথা কাউকে এখন ব'লো না। প্রথম কথা হবে একেবারে দাদার সঙ্গে।"

হাসিমুখে গিরিকা বললে, "আমার বিয়ের কথা আমি কি কাউকে বলতে পারি? কিন্তু তার জন্যে দুঃখ নেই, তুমি নিজেই এখনি সকলকে ব'লে দেবে অখন।"

ব্যগ্রকণ্ঠে প্রদোষ বললে, "আমি? দেখো, কক্ষনো না।"

৫

প্রভাত কলকাতায় পৌঁছবার দিন গিরিকার ঘরে গিয়ে প্রদোষ বললে, "দাদাকে আনতে আমরা স্টেশনে যাচ্ছি গিরিকা, তুমি যাবে?"

হাসিমুখে গিরিকা বললে, "তা কখনো যেতে পারি? সম্বন্ধ করছ তাঁর সঙ্গে, লজ্জা করবে যে!"

একটা স্বচ্ছ সরল হাস্যে প্রদোষের মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। "সত্যি?"

"সত্যি।"

"কম ছেলেমানুষ তো নও!"

গিরিকা হেসে বললে, "আমি যে মেয়েমানুষ প্রদোষ।"

প্রভাত এসে পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরে গিরিকার সঙ্গে তার সাধারণ পরিচয় হ'য়ে গেল। এক সময়ে গিরিকাকে প্রদোষ চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলে, "দাদাকে পছন্দ হয়েছে?"

"খুব।"

"রাজি ত?"

"রাজি।"

সেদিন গোলমালে কোন সুবিধে হ'ল না। পরদিন সকালবেলা সুযোগমতো প্রভাতের কাছে উপস্থিত হ'য়ে প্রদোষ বললে, "দাদা, একবার গিরিকার ঘরে চল।"

বিস্মিত হ'য়ে প্রভাত বললে, "কেন রে?"

"একটা দরকারি কথা আছে।"

"কি কথা?"

"চল না, সেখানেই শুনবে।"

প্রদোষের পিছনে পিছনে প্রভাত ঔৎসুক্যভরে গিরিকার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। গিরিকা তখন তার এসরাজটি নিয়ে ধীরে ধীরে ভৈরবীর একটা মিঠে টান দিচ্ছিল।

ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রদোষ বললে, "গিরিকা, দাদা এসেছেন।"

তাড়াতাড়ি এসরাজটি বিছানায় রেখে উঠে দাঁড়িয়ে আরক্ত মুখে গিরিকা বললে, "আসুন।" একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে, "বসুন।"

বিমূঢ়ভাবে চেয়ারে উপবেশন ক'রে প্রভাত জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা পদো?"

প্রদোষ বললে, "গিরিকার হায়দ্রাবাদে বিয়ের কথা হচ্ছে, যার মুখে তুমি কাল শুনেছ। গিরিকাকে ছেড়ে আমি কিন্তু থাকতে পারব না দাদা।"

প্রভাত একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখলে, গিরিকার সঙ্কুচিত দেহ একটা চেয়ারের মধ্যে মিলিয়ে যাবার উপক্রম করছে। তারপর প্রদোষের দিকে চেয়ে বললে, "তা আমাকে কি করতে বলিস?"

"গিরিকাকে বিয়ে করতে বলি।"

সবিস্ময়ে প্রভাত ব'লে উঠল, "বলিস কি রে!"

প্রদোষ বললে, "হ্যাঁ, তাই বলি। কেন, গিরিকাকে তোমার পছন্দ হয় না না-কি?" তারপর গিরিকার দিকে ফিরে গিরিকার অবস্থা দেখে একটু হেসে বললে, "গিরিকার লজ্জা হয়েছে। গিরিকা, এদিকে মুখ ফেরাও, দাদা তোমাকে দেখবে।"

কিন্তু এ অনুরোধেও গিরিকা যেমন ছিল তেমনি মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইল দেখে গিরিকার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রদোষের বিস্ময়ের সীমা রইল না। প্রভাতের দিকে চেয়ে সে বললে, "দাদা, গিরিকার চোখে জল। গিরিকা কাঁদছে।"

প্রদোষের কথা শুনে প্রভাত তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে গিরিকার কাছে গিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "গিরিকা, মনে যদি কষ্ট পেয়ে থাকো, কিংবা অপমানিত বোধ ক'রে থাকো, তা হ'লে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু তা যদি না হয় তা হ'লে—তা হ'লে—"

সমস্ত কথাটা শোনবার জন্যে প্রদোষের আগ্রহের অন্ত ছিল না। অধীরভাবে বললে, "তা হ'লে কি, বলো না?"

"তা হ'লে যে প্রস্তাব প্রদোষ এখনই করেছে আমরা দুই ভাইয়ে একান্তভাবে সে বিষয়ে তোমার সম্মতি ভিক্ষা করছি। তুমি কি রাজি আছ গিরিকা?"

চাপা গলায় ব্যগ্রভাবে প্রদোষ বললে, "আছে। আছে। আমাকে কালই বলেছে রাজি আছে।" তারপর গিরিকার দিকে ঝুঁকে বললে,

"আচ্ছা, দাদার কাছেও একবার বল না গিরিকা। আর বলতে যদি লজ্জা করে, তা হ'লে দেখ—আমার দিকে চেয়ে দেখ।"

আরক্ত মুখে গিরিকা অপাঙ্গে প্রদোষের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

নিজের দক্ষিণ হস্ত গিরিকার দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে প্রদোষ বললে, "আমার হাত তুমি ছুঁলেই আমরা বুঝব তুমি রাজি আছ।"

"ছোঁও—ছোঁও—ছোঁও"—প্রদোষের হাত ধীরে ধীরে গিরিকার হাতের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল। হঠাৎ একটা কোনো মুহূর্তে দেখা গেল, গিরিকার হাত প্রদোষের হাতকে চেপে ধরেছে—আলগা ভাবে নয়, একেবারে সজোরে,—বোধহয় কতকটা স্নায়বিক উত্তেজনার বশে।

"পদো, তোর বউদিদিকে বল্, আজকে আমার সুপ্রভাত।" ব'লে প্রভাত ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর ঘণ্টা দুই পরে গিরিকার ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রদোষ ডাকলে, "বউদিদি!"

আরক্ত-স্মিত মুখে গিরিকা বললে, "কি ভাই লক্ষ্মণ?"

"বাবা আর মা তোমাকে আশীর্বাদ করতে আসছেন।"

বিপরীত

১

বিয়ের মাস দুই পরে পাকাভাবে স্বামীর ঘর করতে এসে লতিকা দেখলে, বিয়ের সময়ে যে-সব আত্মীয় স্বজন কুটুম্বে তার স্বামীর সুবৃহৎ পুরী পূর্ণ ছিল, শরৎকালের ক্ষণস্থায়ী মেঘের মতো তারা অন্তর্হিত হয়েছে। আছে কেবল একুশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে, প্রয়োজনকালে তার স্বামী নিশীথ যাকে 'তারা' ব'লে ডাকে। বাড়িতে মানদা নামে একজন পুরনো পরিচারিকা ছিল; সংসার-পরিচালনার স্থূল দিকটা তার হাতে থাকত। মানদার কাছ থেকে লতিকা কথায় কথায় জেনে নিলে, তারা তার স্বামীর সংসার-আকাশে সকাল সাঁঝের শুকতারা নয়, সর্বক্ষণের সে ধ্রুবতারা। কারণ তার অনিমিষ দৃষ্টির স্নিগ্ধ কিরণ কোনদিন কোনও আত্মীয়ের গৃহে অস্তমিত হয় না। এ কথাও সে

বিমূঢ়ভাবে চেয়ারে উপবেশন ক'রে প্রভাত জিজ্ঞাসা করলে, "কি কথা পদো?"

প্রদোষ বললে, "গিরিকার হায়দ্রাবাদে বিয়ের কথা হচ্ছে, মার মুখে তুমি কাল শুনেছ। গিরিকাকে ছেড়ে আমি কিন্তু থাকতে পারব না দাদা।"

প্রভাত একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখলে, গিরিকার সঙ্কুচিত দেহ একটা চেয়ারের মধ্যে মিলিয়ে যাবার উপক্রম করছে। তারপর প্রদোষের দিকে চেয়ে বললে, "তা আমাকে কি করতে বলিস?"

"গিরিকাকে বিয়ে করতে বলি।"

সবিস্ময়ে প্রভাত ব'লে উঠল, "বলিস কি রে!"

প্রদোষ বললে, "হ্যাঁ, তাই বলি। কেন, গিরিকাকে তোমার পছন্দ হয় না না-কি?" তারপর গিরিকার দিকে ফিরে গিরিকার অবস্থা দেখে একটু হেসে বললে, "গিরিকার লজ্জা হয়েছে। গিরিকা, এদিকে মুখ ফেরাও, দাদা তোমাকে দেখবে।"

কিন্তু এ অনুরোধেও গিরিকা যেমন ছিল তেমনি মুখ ফিরিয়ে ব'সে রইল দেখে গিরিকার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে প্রদোষের বিস্ময়ের সীমা রইল না। প্রভাতের দিকে চেয়ে সে বললে, "দাদা, গিরিকার চোখে জল। গিরিকা কাঁদছে।"

প্রদোষের কথা শুনে প্রভাত তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে গিরিকার কাছে গিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "গিরিকা, মনে যদি কষ্ট পেয়ে থাকো, কিংবা অপমানিত বোধ ক'রে থাকো, তা হ'লে তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। কিন্তু তা যদি না হয় তা হ'লে—তা হ'লে—"

সমস্ত কথাটা শোনবার জন্যে প্রদোষের আগ্রহের অন্ত ছিল না। অধীরভাবে বললে, "তা হ'লে কি, বলো না?"

"তা হ'লে যে প্রস্তাব প্রদোষ এখনই করেছে আমরা দুই ভাইয়ে একান্তভাবে সে বিষয়ে তোমার সম্মতি ভিক্ষা করছি। তুমি কি রাজি আছ গিরিকা?"

চাপা গলায় ব্যগ্রভাবে প্রদোষ বললে, "আছে। আছে। আমাকে কালই বলেছে রাজি আছে।" তারপর গিরিকার দিকে ঝুঁকে বললে,

"আচ্ছা, দাদার কাছেও একবার বল না গিরিকা। আর বলতে যদি লজ্জা করে, তা হ'লে দেখ—আমার দিকে চেয়ে দেখ।"

আরক্ত মুখে গিরিকা অপাঙ্গে প্রদোষের দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

নিজের দক্ষিণ হস্ত গিরিকার দিকে প্রসারিত ক'রে দিয়ে প্রদোষ বললে, "আমার হাত তুমি ছুঁলেই আমরা বুঝব তুমি রাজি আছ।"

"ছোঁও—ছোঁও—ছোঁও"—প্রদোষের হাত ধীরে ধীরে গিরিকার হাতের দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল। হঠাৎ একটা কোনো মুহূর্তে দেখা গেল, গিরিকার হাত প্রদোষের হাতকে চেপে ধরেছে—আলগা ভাবে নয়, একেবারে সজোরে,—বোধহয় কতকটা স্নায়বিক উত্তেজনার বশে।

"পদো, তোর বউদিদিকে বল্, আজকে আমার সুপ্রভাত।" ব'লে প্রভাত ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এর ঘণ্টা দুই পরে গিরিকার ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রদোষ ডাকলে, "বউদিদি!"

আরক্ত-স্মিত মুখে গিরিকা বললে, "কি ভাই লক্ষ্মণ?"

"বাবা আর মা তোমাকে আশীর্বাদ করতে আসছেন।"

বিপরীত

১

বিয়ের মাস দুই পরে পাকাভাবে স্বামীর ঘর করতে এসে লতিকা দেখলে, বিয়ের সময়ে যে-সব আত্মীয় স্বজন কুটুম্বে তার স্বামীর সুবৃহৎ পুরী পূর্ণ ছিল, শরৎকালের ক্ষণস্থায়ী মেঘের মতো তারা অন্তর্হিত হয়েছে। আছে কেবল একুশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে, প্রয়োজনকালে তার স্বামী নিশীথ যাকে 'তারা' ব'লে ডাকে। বাড়িতে মানদা নামে একজন পুরনো পরিচারিকা ছিল; সংসার-পরিচালনার স্থূল দিকটা তার হাতে থাকত। মানদার কাছ থেকে লতিকা কথায় কথায় জেনে নিলে, তারা তার স্বামীর সংসার-আকাশে সকাল সাঁঝের শুকতারা নয়, সর্বক্ষণের সে ধ্রুবতারা। কারণ তার অনিমিষ দৃষ্টির স্নিগ্ধ কিরণ কোনদিন কোনও আত্মীয়ের গৃহে অস্তমিত হয় না। এ কথাও সে

জানতে পারলে, তারা তার স্বামীর এমন কোন আত্মীয় নয় যাতে এই নিরন্তর অবস্থিতির একটা ভাল রকম যুক্তি থাকতে পারে।

লতিকার মনে পড়ল, তার বাপের বাড়ির আমবাগানে একটা কলমের আমগাছকে একটা বুনোলতা এমন আচ্ছন্ন ক'রে ধরেছে যে, আমগাছের কোন অস্তিত্বই চোখে পড়ে না। ফুলের সময়ে বসন্তকালে লতার দেহ অজস্র নীল ফুলে ফুলে ভ'রে যায়, কিন্তু ফলের সময়ে গ্রীষ্মকালে গাছ থেকে একটাও আম পাওয়া যায় না। বাপের বাড়ির আমগাছের অবস্থায় শ্বশুরবাড়ির স্বামীকে দেখে সে সিদ্ধান্ত করলে তারা থাকতে স্বামীবৃক্ষ থেকে কোনদিন কোন সুফলের সম্ভাবনা নেই।

তখন যে-আকাশে তারা ধ্রুবতারার মতো কিরণ বর্ষণ করত, সেখানে লতিকা একটি ঘন মেঘের মতো কালো হ'য়ে উঠল।

২

সকালে চা-পান ক'রে নিশীথ দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটি ঈজি-চেয়ারে শুয়ে মেঘদূতের উত্তরমেঘে নিমগ্ন ছিল। তারা পূব দিকের ফুলবাগানে মালীকে নিয়ে বৃক্ষপরিচর্যা করছিল।

নিশীথের কাছে এসে মুখ ভার ক'রে লতিকা বললে, "একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ?"

কাব্যের বইখানা ধীরে ধীরে মুড়ে পাশের ছোট টেবিলে রেখে নিশীথ বললে, "কর ; কিন্তু তার আগে আর একটা কাজ কর না ?"

"কি ?"

অদূরে একখানা চেয়ার দেখিয়ে নিশীথ বললে, "ওই চেয়ারটি টেনে নিয়ে কাছে এসে ব'স।"

নিশীথের টেবিলের উপর ডান হাতখানা রেখে লতিকা বললে, "থাক্, বসতে হবে না। আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তারা তোমার কে ?"

লতিকার দিকে মুখ তুলে চেয়ে সহজভাবে নিশীথ বললে, "তারা ? —তারা আর কে আমার ?—তারা আমার সঙ্গিনী।"

সঙ্গিনী! বিস্ময়ে, ক্রোধে, লজ্জায়, বিরক্তিতে লতিকার মুখ লাল হ'য়ে উঠল। "স্ত্রীলোক সঙ্গিনী তোমার?"

মৃদু হেসে নিশীথ বললে, "স্ত্রীলোক ব'লেই ত সঙ্গিনী। তারা স্ত্রীলোক না হ'য়ে পুরুষ হ'লে আমার সঙ্গী হ'ত।"

"তবে আবার বিয়ে করলে কেন?"

"আবার ত করি নি, একবারই করেছি।"

তীক্ষ্ণকণ্ঠে লতিকা বললে, "সে কথা বলছি নে। তারা থাকতে বিয়ে করলে কেন?"

"বিয়ের পথে তারাকে বাধা ব'লে মনে হয় নি ব'লে।"

এ উত্তরে মনে মনে জ্ব'লে উঠে লতিকা বললে, "আমি যদি বলতাম, আমার একজন পুরুষ সঙ্গী আছে।"

কাব্য বইখানা ধীরে ধীরে খুলতে খুলতে নিশীথ বললে, "তা হ'লে তোমার কাছ থেকে তার ঠিকানা জেনে নিয়ে মাঝে মাঝে তাকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়াতাম।"

আর কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন মনে ক'রে লতিকা সরোষে চ'লে গেল।

৬

এর পর থেকে লতিকা কেবলই ভাবতে লাগল, কি ক'রে লতাপাশ থেকে বৃক্ষকে মুক্ত করা যায়! সে লক্ষ্য করতে লাগল, কোন্ কোন্ জায়গায় লতা শিকড় ফেলেছে, সেখানে নির্মম হ'য়ে ছুরি চালাতে হবে।

নিশীথ ফুল ভালবাসে—তারা বাগানে ফুল ফোটাবার ব্যবস্থা করে। একদিন নার্সারির মালীকে ডাকিয়ে তারা নূতন নূতন ফুলগাছের ফরমাশ দিচ্ছে, নিশীথ একখানা কাগজে সেগুলো লিখে নিচ্ছে—এমন সময় সেখানে লতিকা এসে দাঁড়াল। একটু অপেক্ষা ক'রে সে বললে, "এ-সব ফুলগাছ কোথায় লাগাবে?"

লতিকার দিকে চেয়ে হাসিমুখে তারা বললে, "কেন, তোমার উত্তর দিকের বসবার ঘরের পূব দিকে যে জমিটা তৈরি হয়েছে সেখানে।"

মুখ ভার ক'রে লতিকা বললে, "ও মা! সেখানে গুচ্ছের বাজে

ফুলগাছ লাগাবে? আমি যে মনে মনে ঠিক করেছি, সেখানটায় আলু লাগাব। আমার বাপের বাড়ি এ সময়ে—"

বাপের বাড়ির উদাহরণ শেষ হবার আগেই নিশীথ বললে, "কিন্তু আলু ত বাজারে কিনতে পাওয়া যায় লতি?"

চোখ কুঁচকে লতিকা বললে, "ফুলও ত বাজারে কিনতে পাওয়া যায়!"

এ অকাট্য যুক্তিতে হার মেনে নিশীথ গাছের ফর্দখানার দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইল।

লতিকা বললে, "এত সব বাজে জিনিসেও তোমরা সময় আর পয়সা নষ্ট করতে পার! যাতে সংসারে দু-পয়সার সাশ্রয় হয় তাতে ত কারও দৃষ্টি দেখতে পাই নে!"

তারার দিকে চেয়ে নিশীথ মৃদুস্বরে বললে, "আমাদের মতে ত সংসার এতদিন চলেছে—এবার লতির মতে কিছুদিন চলুক না তারা?"

তারা হেসে বললে, "বেশ ত।"

সেদিন থেকে ফুলগাছ কেনা বন্ধ হ'য়ে গেল। ক্রমশ তরকারির ক্ষেত এত বাড়তে লাগল আর ফুলগাছের জমি এত কমতে লাগল যে, পুরনো মালী এসে তারাকে বললে, "আমি ফুলেরই পাট জানি, ফলের পাট জানি নে। আমি অন্য জায়গায় চাকরি পেয়েছি।"

তারা বললে, "যে ক'টা ফুলের গাছ আছে সেগুলোর তা হ'লে কি দশা হবে নিতাই?"

চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে নিতাই বললে, "যে ভাবে লাউ আর কুমড়োর গাছ বেড়ে আসছে মা, আর দিন দশেক পরে তাদের ভাবনা ভাবতে হবে না।"

মালী প্রণাম ক'রে চ'লে গেল। নিশীথের বসবার ঘরের ফুলদানিতে শেষ ফুলের তোড়া শুকিয়ে উঠতে লাগল।

*   *   *   *

নিশীথ ছবি ভালবাসে। শহরে চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে গিয়ে তারা আর নিশীথ দুজনে মিলে কয়েকটা ভাল ভাল ছবির নাম লিখে নিয়ে এল—কিনতে হবে।

মুখ ভার ক'রে লতিকা জিজ্ঞাসা করলে, "দাম পড়বে কত?"

নিশীথ বললে, "হাজার দুই টাকা।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে লতিকা বললে, "কি সর্ব্বনাশ! কতকগুলো নেকড়ার টুকরো কিনে দু হাজার টাকা জলে ফেলতে হবে! তারপর সেগুলো নিয়ে এখন কিছুদিন ধ'রে নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ ক'রে যত বাজে আলোচনা চলবে ত? তার চেয়ে হাজার খানেক টাকার রূপোর বাসন গড়াও যা কাজে-কর্ম্মে উপকার দেবে।"

মৃদুকণ্ঠে নিশীথ বললে, "রূপোর বাসন ত এক সিন্দুক আছে লতি।"

ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে লতিকা বললে, "আর ছবিই কি এক বাড়ি নেই?"

তাও ত বটে! তারার দিকে নিরুপায় দৃষ্টি ফেলে নিশীথ বললে, "তা হ'লে রূপোর বাসনই হোক তারা?"

হাসি মুখে তারা বললে, "বেশ ত। তাই হোক।"

পরদিন বাসন গড়াবার জন্যে সেকরা ডাকা হ'ল।

*   *   *   *

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তারা নিশীথকে গান শোনায়, নিশীথ গান ভালবাসে। সেদিন তারা বীণ্ বাজিয়ে গাচ্ছিল—

"হৃদয় মাঝে কে আসিলে হে, মধুর সাজে!
ঝিনিকি ঝিনিকি ঝিনি ঝিনি নিনি হৃদয়-বীণা বাজে!"

পাশে একটা শোফায় অর্ধশায়িত অবস্থায় ডান হাত দিয়ে দুই চোখ ঢেকে স্তব্ধ হ'য়ে নিশীথ গান শুনছিল। সমস্ত ঘরটা ফিকে নীলচে আলোর ক্ষীণ প্রভায় সপ্ত স্বরকে আশ্রয় ক'রে কাঁপছিল।

লতিকা এসে একটা চকচকে সাদা আলো জ্বেলে দিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, "আচ্ছা, প্রতিদিন সন্ধ্যাগুলো এ রকম গান-বাজনায় নষ্ট ক'রে কি হয়? তাও যদি ঠাকুর-দেবতাদের ভাল গান হ'ত!—যত সব বাজে গান।"

গান থেমে গেল। নিশীথ চেয়ে দেখলে; চোখে তার হতাশার করুণতা ছলছল করছে।

বিস্ময়ের স্বরে লতিকা বললে, "আচ্ছা, এতে তোমরা সুখ পাও?"

নিশীথ বললে, "আমি ত পাই। তুমি পাও তারা?"

তারা বললে, "আমিও পাই।"

ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে লতিকা বললে, "আশ্চর্য! সন্ধ্যার সময়ে আমার বাপের বাড়িতে কি হয় জান?"

ভীত হ'য়ে নিশীথ বললে, "কি হয় ?"

সজোরে লতিকা বললে, "গীতা পাঠ হয়। আমার বাবা আপিস থেকে এসে জল খেয়ে সকলকে নিয়ে গীতা পড়তে বসেন। তোমরা গীতা পড়েছ ?"

অপ্রতিভ হ'য়ে নিশীথ বললে, "আমি ত পড়ি নি। তুমি পড়েছ তারা ?"

তারা বললে, "আমিও পড়ি নি।"

ঘৃণায় লতিকার নাক কুঁচকে উঠল। "এখনও পড় নি! জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বই গীতা তা পড় নি—অথচ বাজে বই মেঘদূত তা পাঁচবার পড়েছ! কাল থেকে গীতা পড়া হবে। রাজি ত ?"

তারার দিকে করুণ চক্ষে চেয়ে নিশীথ বললে, "কিছুদিন না হয় গীতা পড়াই হোক তারা ?"

হাসিমুখে ঘাড় নেড়ে তারা বললে, "হোক।"

পরদিন থেকে গীত বন্ধ হ'য়ে গীতা আরম্ভ হ'ল।

৪

ফুল ফোটে না, গান হয় না, নূতন ছবির আমদানি নেই—যে-সময় এতদিন লঘু-ছন্দে চলছিল তার পায়ে যেন লোহার শিকল পড়েছে! এই অভূতপূর্ব বিপদের মধ্যে প'ড়ে নিশীথ আর তারা সর্বদা পরস্পরের কাছে কাছে থাকে; একের দুঃখ লঘু করবার জন্যে অপরে নিরতিশয় ব্যগ্র। মুখে কারও কথা নেই, কিন্তু চোখে-চোখে সমবেদনা ব্যাকুল গতিতে ছুটোছুটি করে। সুখের দিনে কাজকর্মের নিরবসরে অনেক সময়ে তারা দূরে দূরে থাকত—দুঃখের দিনে কেউ কাউকে ছাড়তে চায় না।

ওষুধে রোগ বেড়ে গেল দেখে লতিকা রোষে ক্ষোভে পাগল হ'য়ে উঠল। তারাকে নির্জনে ডেকে সে চোখ লাল ক'রে বললে, "এ-রকম কাছে কাছে থাকতে তোমার লজ্জা করে না ?"

আকাশের দিকে তাকিয়ে সহজ সুরে তারা বললে, "কই, না।"

তর্জন ক'রে লতিকা বললে, "করা উচিত। এখন থেকে দূরে দূরে থেকো। থাকবে ত ?"

মৃদু হেসে তারা বললে, "থাকব।"

নিশীথকে নির্জনে ডেকে লতিকা বললে, "তুমি সর্বদা তারার কাছে কাছে থাক কেন ?"

নিশীথ বললে, "কোনো কাজ নেই ব'লে।"

"কাজ নেই ? কাজের কি অভাব—পুরুষমানুষ কাজ নেই বলতে লজ্জা করে না ?"

মাথা নত ক'রে নিশীথ বললে, "কি কাজ করব বল ?"

একটু ভেবে লতিকা বললে, "জমিদারি দেখ।"

"সে জন্যে ম্যানেজার ত রয়েছে।"

"ম্যানেজার ত অন্য সকলকে দেখে ; কিন্তু ম্যানেজারকে দেখে কে ? সে যদি চুরি করে ?"

নিশীথ বললে, "সে যদি চুরি করে ত আমি দেখতে আরম্ভ করলে জোচ্চুরি করবে।"

কঠিন স্বরে লতিকা বললে, "তা হ'লে তুমি দেখবে না ?"

একটু ভেবে নিশীথ বললে, "দিন কতক না হয় দেখি।"

সে-দিন থেকে তারা তরকারি-ক্ষেতের পাশে কড়াইসুঁটি ঝোপের পিছনে দিন কাটাবার মতো একটা আশ্রয় ক'রে নিলে। নিশীথ তার জমিদারি-সেরেস্তার কাছে একটা ঘর বেছে নিয়ে আপিস খুললে। জমাবন্দী, রোকড়, খতিয়ান, জমা-ওয়াশীল-বাকির মধ্যে সে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিলে।

লতিকা দূর থেকে দুজনের মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে ক'রে অস্থির হ'য়ে উঠল। যেটা সে মনে মনে আশা করেছিল, সেই বেদনার ছাপ দুজনের মধ্যে কারো মুখে দেখতে না পেয়ে সন্দেহের চেয়েও একটা কষ্টদায়ক জিনিসে সে পীড়িত হ'তে লাগল। তার মনে হ'ল, যে-যোগগুলো সে এতদিন ধ'রে ছিঁড়ছে সেগুলো তেমন কিছুই নয়; সকলের চেয়ে বড় কোনও যোগ এখনও তাদের মধ্যে রয়েছে—যা চোখে ধরা পড়ছে না। এই অজানা বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে স্থির করলে, লতাকে শুধু গাছ থেকে ছিন্ন করলেই হবে না, একেবারে মাটি থেকে সমূলে উপড়ে ফেলতে হবে।

কয়েক দিন পরে সে তারাকে বললে, "তোমার ত এখানে আর কিছু করবার নেই ?"

তারা হেসে বললে, "না, তা নেই।"

"তবে তুমি অন্য জায়গায় যাও না?"

"কোথায় যাব? আমার ত যাবার কোনো জায়গা নেই।"

দৃঢ়স্বরে লতিকা বললে, "না, তবু যাও।"

"কোথায়?"

"যেখানে হোক।"

একটু ভেবে তারা বললে, "তা হ'লে সে কাজটা তোমাকেই করতে হয়; কারণ যেখানে-হোক যাওয়ার চেয়ে যেখানে-হোক পাঠানো সহজ। তুমি আমাকে জোর ক'রে পাঠিয়ে দাও।"

"কি রকম জোর ক'রে?"

তারা হেসে বললে, "জোরের কি আর রকম আছে? হাত-পা বেঁধে টেনে হিঁচড়ে—ইচ্ছে যদি হয়, চুলের মুঠি ধ'রে—"

একটা কি কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে লতিকা বললে, "আচ্ছা, দেখি।"

লতিকার মনে পড়ল তার বাপের বাড়ির পাড়ায় কেশব নামে একজন যুবক আছে,—যার কাজ করবার সাহস আর শক্তির অন্ত নেই। কাজে একবার নামলে তখন আর তার শ্রেয়-হেয়র বিচার থাকে না। কাজ যত শক্ত হয়, শক্তি তার তত বেড়ে ওঠে।

সন্ধ্যার পর সে নিশীথকে বললে, "একদিন কথায় কথায় তোমাকে বলেছিলাম আমার যদি একজন পুরুষ সঙ্গী থাকত,—তা তোমার মনে আছে?"

নিশীথ বললে, "খুব আছে।"

"তার উত্তরে তুমি কি বলেছিলে মনে আছে?"

নিশীথ বললে, "তাও আছে।"

মুখ নীচু ক'রে নখ দিয়ে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে লতিকা বললে, "আমার একজন পুরুষ সঙ্গী আছে।"

"আছে?" নিশীথের মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। "এতদিন বলতে ইতস্তত করছিলে কেন? কি নাম তার?"

মুখ লাল ক'রে লতিকা নাম বললে।

"ঠিকানা?"

লতিকা ঠিকানা বললে।

উৎসাহের সঙ্গে নিশীথ বললে, "দেখ দেখি! এমন একটা বড় কথা লজ্জা ক'রে চেপে রেখেছিলে! আমি কালই তাকে নিমন্ত্রণ করব—কি বল ?"

লতিকা ঘাড় নেড়ে নিঃশব্দে সম্মতি জানালে।

৫

দু-তিন দিন পরে নিশীথের নিমন্ত্রণ পেয়ে কেশব এসে হাজির হ'ল। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে নিশীথ কেশবের হাত ধ'রে আদর ক'রে লতিকার কাছে নিয়ে গেল।

লজ্জায় আর ভয়ে লতিকার মুখ সন্ধ্যাকাশের মতো কতকটা লাল আর কতকটা কালো হ'য়ে উঠল। কম্পিত স্বরে সে শুধু বললে, "এস।"

হাসিমুখে নিশীথ বললে, "আমি এখন সেরেস্তায় চললাম। তোমরা দুজনে কথাবার্তা কও। দেখো লতি, কেশবের যেন অযত্ন না হয়।" তারপর কেশবের দিকে তাকিয়ে বললে, "বন্ধু, দয়া ক'রে যখন এসেছ, তখন সহজে ছাড়ছি নে। দু দিন পরেই যে কাজ আছে ব'লে ফিরে যাবার ফন্দি করবে, তা হবে না।" নিশীথ চ'লে গেল।

কেশবের মনে বিস্ময় ছাড়া আর কোনো জিনিসের স্থান হচ্ছিল না। বাপের বাড়িতে যে তাকে একদিনও চেয়ে দেখে নি, শ্বশুর-বাড়িতে সে তাকে ডেকে আনলে কেন, এই নিরতিশয় বিস্ময় থেকে প্রথমে মুক্তিলাভ করবার জন্যে সে লতিকাকে জিজ্ঞাসা করলে, "আমাকে আনিয়েছ কেন ?"

লজ্জায় লতিকার মুখ টকটকে হ'য়ে উঠল। ধীরে ধীরে বললে, "কাজ আছে।"

"কাজ আছে ?"—উৎসাহভরে কেশব জিজ্ঞাসা করলে, "কি কাজ ?"

"শক্ত কাজ।"

কেশব হাসতে লাগল। "শক্ত ত পাথর হয়; কাজ আবার শক্ত হয় না-কি—আমি জিজ্ঞাসা করছি, কি করতে হবে ?"

কতকটা নিজেকে সামলে নিয়ে লতিকা ধীরে ধীরে তার অভিসন্ধি ব্যক্ত করলে। বললে, "যেমন ক'রেই হোক সরাতে হবে। এ আমার অসহ্য হয়েছে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে কেশব জিজ্ঞাসা করলে, "ওদেরও কি তোমাকে অসহ্য হয়েছে?"

কেশবের প্রশ্নে আশঙ্কায় লতিকার মুখ কালো হ'য়ে উঠল; বললে, "তা ত ঠিক বুঝতে পারি নে। কিন্তু সে যাই হোক, এ কাজ তোমাকে যেমন ক'রেই হোক করতে হবে।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে কেশব বললে, "করতে ত হবেই; কিন্তু কেমন ক'রে করতে হবে সেটা দু দিন লক্ষ্য না করলে বুঝতে পারব না।"

কেশবের দিকে একটু এগিয়ে এসে ব্যগ্রস্বরে লতিকা বললে, "দু দিন কেন? দশ দিন হ'লেও কোন ক্ষতি নেই। শুধু শেষ পর্যন্ত করতে পারলেই হ'ল। তিনজনের এ-বাড়িতে বাস অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে।"

কেশবের মুখে এমন একটা অদ্ভুত রকমের নিঃশব্দ হাসি ফুটে উঠল,—যেমন লতিকা কোনদিন কারো মুখে দেখে নি। চাপা গলায় কেশব বললে, "বুঝতে পারছি তোমাদের তিনজনের একসঙ্গে এ বাস ঠিক যেন ত্র্যহস্পর্শ হয়েছে। ত্র্যহস্পর্শ তিথির পক্ষেও যেমন অশুভ, সাথীর পক্ষেও ঠিক তেমনি।"

উৎসাহভরে লতিকা বললে, "ঠিক বলেছ।"

কেশব বললে, "একটা কথা, যাকে নিয়ে যাব সে থাকবে কোথায়?"

"কেন, তোমার কাছে?"

৬

পাঁচ দিন পরে সন্ধ্যার সময়ে কেশব লতিকাকে ডেকে বললে, "আজ রাত্রে কাজ শেষ করতে হবে; প্রস্তুত থেকো।"

শুনে লতিকা শিউরে উঠল। "এত শীঘ্র!"

কেশবের মুখে সেই প্রথম দেখার দিনের মতো হাসি ফুটে উঠল; বললে, "শুভস্য শীঘ্রম্!"

পাংশুমুখে লতিকা বললে, "আমাকে প্রস্তুত থাকতে বলছ কেন? কি করতে হবে আমাকে?"

"তুমি রাত বারোটায় সময়ে বাড়ির পশ্চিম দিকের খিড়কির দোরের কাছে একবার এসে দাঁড়াবে।"

চঞ্চল হ'য়ে উঠে লতিকা বললে, "কেন, তাতে কি হবে? আমাকে ডাকবার ছল ক'রে তাকে সেখানে ডেকে নিয়ে যাবে নাকি?"

মাথা নেড়ে হাসতে হাসতে কেশব বললে, "তুমি আমাকে বিশ্বাস ক'রে কাজের ভার দিয়েছ ব'লেই আমি যে তোমাকে বিশ্বাস ক'রে কাজের কৌশল বলব, তেমন কাঁচা কাজ করি নে আমি। আমাকে দিয়ে যদি কাজ নিতে চাও, তা হ'লে জেরা ক'রো না।"

ব্যস্ত হ'য়ে লতিকা বললে, "না, না, আমি জেরা করছি নে। আমি তোমাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না—শুধু একটা ছাড়া।"

"কি?"

"সফল হবে ত?"

"নিশ্চয়। আজ তোমাদের ত্র্যহস্পর্শ কেটে যাবে—তিনজনের সঙ্গে এক মিশে দুইয়ে দুইয়ে ভাগ হবে। আজ তিথি কি জানো?"

"না। কি?"

"অমাবস্যা।"

ভীতস্বরে লতিকা বললে, "বড্ড অন্ধকার হবে যে!"

"অন্ধকারেই ত এ সব কাজের সুবিধে হয়। তুমি দেখছি কোন তন্ত্রেরই ধার ধার না। আচ্ছা, এখন যাও—যা বললাম তা যেন মনে থাকে।"

লতিকা এগিয়ে এসে তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে কেশবের কাঁধের কাছে স্পর্শ ক'রে বললে, "আর, আমি যা বলেছি তাও যেন মনে থাকে। যদি জোর করতে যায়, টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাবে,—এমন কি দরকার হ'লে চুলের মুঠি ধ'রেও। সে তাই বলেছিল।"

কেশব হাসতে লাগল; বললে, "ছেলেমানুষ তুমি! টেনে হিঁচড়ে কি নিয়ে যাওয়া যায়? তাতে আরও জোর বাড়িয়ে দেওয়া হয়।"

"তবে কি ক'রে নিয়ে যাবে?"

"সহজভাবে হাত ধ'রে। যদি জোর করে, তা হ'লে দু হাতে বুকের কাছে তুলে ধ'রে।"

লতিকা হেসে বললে, "তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে পারবে তুমি। দেখ, আর একটা কথা আছে—সঙ্গে একটা বড় রুমাল রেখো, যদি চেঁচাতে যায় মুখে পুরে দিও। কিছুতেই চেঁচাতে দিও না।"

কেশব বললে, "না, তা দেব না। কিন্তু বড় রুমাল ত আমার নেই—তুমি না হয় একটা এনে দাও।"

তেমন বড় রুমাল খুঁজে না পেয়ে লতিকা তাড়াতাড়ি নিশীথের একটা রেশমী গলাবন্ধ নিয়ে এল। "এতে হবে?"

গলাবন্ধটা খুলে দেখে কেশব বললে, "চমৎকার হবে। এ কার গলাবন্ধ? তোমার স্বামীর?"

"হ্যাঁ।"

কেশব হেসে বললে, "এর চেয়ে ভাল আর অন্য কোন জিনিস হ'তে পারে না। এ দিয়ে মুখ বাঁধলে মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরোনো উচিত হবে না।"

চিন্তিত মুখে লতিকা বললে, "দেখ, একটা কথা খালি আমার মনে হচ্ছে। ওদের দুজনকে পৃথক করবার জন্যে এ পর্যন্ত যা কিছু আমি করেছি, সব তাতেই যেন উল্টো ফল ফলেছে। ওদের মধ্যে যোগটা যেন বেড়েই গেছে। তুমি যা করছ, তাতে আরও বেশি ক'রে তাই হবে না ত?"

কেশবের মুখে আবার সেই অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল। লতিকা আর কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলে না।

৭

রাত্রি বারোটার সময়ে লতিকা এসে খিড়কির দোরের কাছে দাঁড়াল। উত্তেজনায় তার বুকের মধ্যে যেন কল চলছিল। দোরটা খুলে রেখে কাছেই কেশব লুকিয়ে ছিল। লতিকাকে দেখতে পেয়ে কাছে এল। হাতে সেই গলাবন্ধ।

রুদ্ধশ্বাসে লতিকা বললে, "সব ঠিক ত?"

লতিকার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কেশব বললে, "সব ঠিক।" তারপর নিমেষের মধ্যে বাঁ হাত দিয়ে লতিকার গলা চেপে ধ'রে ডান

হাত দিয়ে তার মুখ বেঁধে ফেললে। একটু ধস্তাধস্তি হ'ল, কিন্তু কোনো ফল হ'ল না।

মুখ দিয়ে লতিকা কোনো কথা বলতে পারলে না। চোখ তার খোলা ছিল, কিন্তু চোখ দিয়ে সে কি ভাব প্রকাশ করছিল, নিবিড় অন্ধকারে তা কিছুমাত্র বোঝা গেল না।

লতিকার হাত ধ'রে টান দিয়ে কেশব বললে, "চল।"

লতিকা মাটিতে ব'সে পড়বার চেষ্টা করলে। তখন কেশব তার দুই বাহুর মধ্যে লতিকার দেহ তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে অন্ধকার ভেদ ক'রে এগিয়ে চলল।

কিছুদূরে এসে লতিকাকে নামিয়ে দিয়ে কেশব তার মুখের বাঁধন খুলে দিয়ে বললে, "তখন চেঁচাবার কোনো উপায় ছিল না—এখন চেঁচালে কোনো উপায় হবে না, বৃথা চেঁচাতে চেষ্টা ক'রো না।"

রোষে ক্ষোভে কম্পিত স্বরে লতিকা বললে, "এ তুমি কি ভুল করলে? তাকে না এনে আমাকে আনলে কেন?"

কেশব হেসে বললে, "একটুও ভুল করি নি। যে-কাজ যেমন ক'রে করলে পণ্ড হয় সে-কাজ তেমন ক'রে করাই ভুল। তাকে এনে ত্র্যহস্পর্শ ভাঙা যেত না।"

লতিকার হাত ধ'রে কেশব অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

পরাভব

১

বালিগঞ্জে প্রিয়শঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের বৃহৎ অট্টালিকা। রাজশাহী জেলায় বিস্তৃত জমিদারির ইনি মালিক। বিলেত থেকে পাস ক'রে এসে বছর তিন-চার কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারি করেছিলেন, তারপর দার্জিলিঙে ঘোড়া থেকে প'ড়ে চিরদিনের মতো একটি পা নষ্ট হ'য়ে সুদীর্ঘকাল পঙ্গুর জীবন যাপন করছেন।

লাঠিতে ভর দিয়ে পঙ্গু দেহটা কোন রকমে চলছিল, কিন্তু বছর দশেক পরে দুদিনের অসুখে স্ত্রী যখন ইহলোক পরিত্যাগ ক'রে গেলেন,

তখন মনটাও পঙ্গু হ'য়ে গেল। সে বিকলতার লাঠির ব্যবস্থা করতে আর প্রবৃত্তি হ'ল না।

কিছুকাল পরে শোকটা কতক সহজ হ'য়ে এলে সমস্ত মনটা পড়ল পুত্র বিনয় এবং কন্যা মায়াকে মানুষ ক'রে তোলবার দিকে। মায়াকে সৎপাত্রে অর্পণ ক'রে তার বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন; সে থাকে লাহোরে তার স্বামীর কাছে। নিজের জীবনে যে শখটা অপূর্ণ র'য়ে গেছে, পুত্রের জীবনে সেটা মেটাবার উদ্দেশ্যে তাকে বিলেত পাঠিয়েছেন ব্যারিস্টারি পাস ক'রে আসবার জন্যে। বিনয়ের দেশে ফিরে আসবার সময় নিকটবর্তী হয়েছে।

একতলার বারান্দায় একটা আরাম-কেদারায় শুয়ে প্রিয়শঙ্কর একটা দৈনিক খবরের কাগজ উল্টে-পাল্টে দেখছিলেন আর বারম্বার উদ্বিগ্ন নেত্রে গেটের দিকে দৃষ্টিপাত করছিলেন। মনটা যে একটা কিছুর প্রত্যাশায় চঞ্চল ছিল, তা শুধু আকৃতি থেকে নয়, খবরের কাগজের পাতা ওল্টানো থেকেও বোঝা যাচ্ছিল।

"উষা!"

একটি আঠার-উনিশ বছরের সুন্দরী তরুণী পিছন দিকে চেয়ারে ব'সে প্রিয়শঙ্করের মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল; ব্যগ্রভাবে একটু মুখ বাড়িয়ে বললে, "বাবা?"

"কই, এখনো ত দেবী সিং এল না! বিলেতের ডাক কাল আসবার কথা—আজ এখনও এল না, কিছু ত বুঝতে পারছি নে মা।"

উষা বললে, "বিলেতের চিঠি না থাকলেও অন্য চিঠি ত থাকবেই। দেবী সিং না ফেরা পর্যন্ত আপনি ব্যস্ত হবেন না বাবা। তা ছাড়া, কাকার কাছ থেকে এ মেলে আমার চিঠি নিশ্চয়ই আসবে।"

এই আশ্বাসে কতকটা আশ্বস্ত হ'য়ে প্রিয়শঙ্কর পুনরায় খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে আরম্ভ করলেন। উষাও তার পূর্বকাজে মন দিল।

এই উষা মেয়েটি প্রিয়শঙ্করের আত্মীয়াও নয়—আশ্রিতাও নয়। বছর খানেক আগে প্রিয়শঙ্করের এক বন্ধু সপরিবারে বিলেত যাবার সময় এই মেয়েটিকে প্রিয়শঙ্করের কাছে এনে বলেছিলেন, "ভাই প্রিয়, মাস চারেকের জন্যে তোমাকে এই ভারটি দিয়ে গেলাম। এটি আমার

ভাইঝি—চার মাস পরে বি. এ. পরীক্ষা হ'য়ে গেলে একে বিলেতে পাঠিয়ে দিও।" প্রিয়শঙ্কর স্বীকৃত হয়েছিলেন; কিন্তু একটি সুন্দরী অনূঢ়া বয়স্কা মেয়েকে স্ত্রীলোকবর্জিত সংসারে স্থান দেওয়া ভার ব'লেই তাঁর সেদিন মনে হয়েছিল। পরীক্ষার দু-তিন মাস পরে যখন উষাকে বিলেত পাঠিয়ে দেবার জন্যে অনুরোধ-পত্র এল, তখন কিন্তু উত্তরে প্রিয়শঙ্কর লিখলেন, "তুমি আমার বন্ধুই বটে! খোঁড়া মানুষকে লাঠি দিয়ে তারপর কেড়ে নিতে চাও? উষাকে রেখে যাবার সময় তুমি বলেছিলে, ভার দিয়ে গেলাম; কিন্তু ঠিক উল্টো—এই চার-পাঁচ মাসে সে আমার সমস্ত ভার হরণ করেছে—এমন কি আমার অভিশপ্ত জীবনের ট্রেডমার্ক কাঠের ক্রাচটা পর্যন্ত। সেটা অকেজো হ'য়ে প'ড়ে থাকে—আর উষা আমার বাঁ হাত ধ'রে আমাকে সমস্ত কম্পাউণ্ডটা ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। আর তুমি লেখ কি-না উষাকে পাঠিয়ে দাও? উষা তোমার পক্ষে তাঁবাদি হ'য়ে গেছে—অন্তত তোমার দেশে ফেরা পর্যন্ত।"

"বাবা, দেবী সিং আসছে।"

খবরের কাগজটা মাটিতে ফেলে দিয়ে চশমা খুলে রেখে প্রিয়শঙ্কর চেয়ে দেখলেন, একতাড়া চিঠি নিয়ে দেবী সিং আসছে। চিঠিগুলো হাতে নিয়ে চশমা প'রে এক এক ক'রে দেখতে দেখতে প্রিয়শঙ্কর বললেন, "এই যে বিনুর চিঠি এসেছে।" তার পর অন্য একখানা চিঠি নিয়ে বললেন, "এই নাও, তোমার কাকার চিঠি।"

বিনয়ের চিঠি প'ড়ে প্রিয়শঙ্করের মুখ প্রসন্ন হ'য়ে উঠল; বললেন, "উষা, আর এক সপ্তাহ পরে বিনয় রওনা হবে।"

উষা বললে, "তাই লিখেছেন?"

"হ্যাঁ। তা ছাড়া, আর একটা কথা লিখেছে, তাতে আমি ভারি খুশি হয়েছি।"

কোন কথা না ব'লে উষা জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইল।

"একটা কথা তুমি জান না মা—বিনু বিলেত যাবার কিছু পরে আমি একটা বেনামী চিঠি পাই যে, বিলেত যাত্রার কয়েক দিন আগে আমার অজ্ঞাতসারে বিনু বিয়ে ক'রে গেছে। সে চিঠি পেয়ে আমি বিনুকে চিঠি লিখি যে, এ কথা যদি সত্য হয় ত বুঝব, তুমি আমায় অগ্রাহ্য কর। অতএব আমিও তোমাকে অগ্রাহ্য করব। কিন্তু আশা করি, এ কথা

সত্য নয়। বিন্থু জানে, আমি স্নেহও যেমন করতে পারি শাসনও তেমনি করতে জানি। সে আমার চিঠি পেয়ে অতিশয় কাতরভাবে আমার কাছে প্রার্থনা জানায়-যে, তার ফিরে আসা পর্যন্ত যেন এ প্রসঙ্গ বন্ধ রাখি—সে ফিরে এলে কখনই সে আমার অসন্তোষের কারণ হবে না। এ কথাটা বড় গোলমেলে—এ কথায় আমার মনের খট্‌কা আরও বেড়ে গেল। কিন্তু তবু আমি তার এইটুকু প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম। এর দ্বারা সে ত আর মুক্তি পেল না, শুধু বিচারের দিনটাই পেছিয়ে গেল। সে যদি সত্যাই বিয়ে ক'রে থাকে—তা হ'লে এ কথা নিশ্চিত যে, কোন কারণেই আমি তাকে ক্ষমা করব না, তাকে পরিত্যাগ করব। সেই জন্যে এই ঘটনার পর থেকে আমার মনে একটা উদ্বেগ লেগেই আছে। কিন্তু এ চিঠি পেয়ে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করছি। যে চিঠিতে আমি তাকে তোমার কথা লিখেছিলাম—এ চিঠি তারই উত্তর। এ নিশ্চয়ই মনে হয় যে, সে কথা সত্যি হ'লে এ কথা কখনও সে লিখতে পারে না। এ কথা মিথ্যে যদি না হয় তা হ'লে সে কথা নিশ্চয়ই মিথ্যে। আমি তোমাকে চিঠিটা দেখাতে পারতাম, কিন্তু এখন না হয় থাক্।"

মৃদুস্বরে উষা বললে, "সব কথাই ত বললেন বাবা।"

ব্যগ্রস্বরে প্রিয়শঙ্কর বললেন, "না, সব কথা পরিষ্কার ক'রে বলি নি। তা হোক—এখন থাক্।" বাকি চিঠিগুলো উষার হাতে দিয়ে বললেন, "এ সব চিঠি পরে দেখব; এখন চল, একটু পুকুরের ধারে ঘুরে আসি।"

চিঠিগুলো ঘরে রেখে এসে উষা সযত্নে প্রিয়শঙ্করের বাঁ হাতটা নিজের ডান হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে তুলে দাঁড় করালে।

দাঁড়িয়ে উঠে প্রিয়শঙ্কর বললেন, "কি মুশকিল! এমন একটি লোক নেই যার সঙ্গে পরামর্শ করি!" চলতে চলতে বললেন, "তোমার কাকারা সব ভাল আছেন ত উষা?"

"আছেন।"

"তোমার বাবার কথা কিছু লিখছেন না ত?

"না।"

অল্প হেসে প্রিয়শঙ্কর বললেন, "তোমার কাকার চিঠি এলেই আমার হৃৎকম্প হয়।"

যথাসময়ে কেব্‌ল্‌ এল, বিনয় রওনা হয়েছে।

প্রিয়শঙ্কর ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। কোন্‌ ঘরে বিনয় বাস করবে, কোন্‌ ঘরে বসবে, কি কি সামগ্রী তার আসবার আগেই কিনে রাখতে হবে, ইত্যাদি আলোচনায় উষা হাঁপিয়ে উঠল।

"আমি সেদিন খোঁড়া পা নিয়ে আর স্টেশনে যাব না মা; তুমি গিয়ে তাকে অভ্যর্থিত করবে—তোমাকে দেখে সে ভারি খুশি হবে।"

উষা মৃদু হেসে বললে, "আচ্ছা বাবা, তাই হবে।"

"আর দেখ, তুমি নিজে সেদিন আইরিশ স্টু্টা রেঁধে রেখো—সে দেখবে বিলিতি খাবার বিলেতেই শুধু ভাল হয় না, এখানেও হয়।"

উষা বলে, "রাঁধব।"

"আর পিয়ানোটা ভাল ক'রে টিউন করিয়ে নাও, সন্ধ্যাবেলা তোমার গান শুনিয়ে তাকে খুশি করতে হবে।"

উষা চুপ ক'রে থাকে।

বিনয় পৌঁছবার আর মাত্র সাত দিন বাকি। যে সব জিনিস কিনতে হবে, গত রাত্রে উষাকে দিয়ে প্রিয়শঙ্কর তার একটা বৃহৎ ফর্দ করিয়েছেন—একটু পরে উষাকে নিয়ে সেই সব জিনিস কিনতে যাবেন। তিনি ব'সে থাকবেন গাড়িতে, উষা দোকানে দোকানে গিয়ে কিনবে এই বন্দোবস্ত।

প্রিয়শঙ্কর প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে আছেন উষার ঘরের পাশের ঘরে। উষা তাড়াতাড়ি বাথ-রুম থেকে নিজের ঘরে প্রবেশ ক'রে আরশির সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা একটু ঠিক ক'রে নিলে, তারপর দেরাজের ভিতর থেকে একটা সিঁদুর-কৌটো বার ক'রে চিরুনির ডগায় সিঁদুর নিয়ে সযত্নে মাথায় পরলে; তারপর ভাল ক'রে সেটি চুলের পাতার মধ্যে ঢেকে দিলে।

মধ্যেকার দরজা খোলা ছিল; ঘন পুরু সবুজ রঙের পর্দার অল্প ফাঁক দিয়ে প্রিয়শঙ্কর ব্যাপারটা দেখলেন।

"উষা!"

চমকে উঠে উষা তাড়াতাড়ি সিঁদুর-কৌটোটা দেরাজের মধ্যে রেখে দিলে, তারপর ত্বরিত পদে পর্দা ঠেলে এ ঘরে প্রবেশ ক'রে বললে, "বাবা?"

"কাছে এস, নীচু হও।"

ভয়ে উষার মুখ শুকিয়ে গেল; কিন্তু উপায় নেই, নিকটে এসে নত হ'ল।

চুলের পাতা তুলে ধ'রে প্রিয়শঙ্কর দেখলেন, সাধারণত যেখানে সিঁদুর পরা হয় না এমন একটি গুপ্তস্থানে একটি টকটকে সিঁদুর-রেখা জল-জল করছে।

"তোমার বিয়ে হয়েছে উষা?"

উষার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না—মুখ তার মৃতের ন্যায় রক্তহীন হ'য়ে গেছে।

"এ কথা আমাকে বল নি কেন? এ প্রতারণা তুমি আমার সঙ্গে কেন করলে উষা? আমি তোমার কাছে কি এমন অপরাধ করেছি?"

উষার দুই চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে জল ঝ'রে পড়ল। নত হ'য়ে হাঁটু গেড়ে ব'সে প্রিয়শঙ্করের দুই পা জড়িয়ে ধ'রে সে কাতর ভাবে বললে, "বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন।"

হাত দিয়ে জোর ক'রে উষার হাত ছাড়িয়ে দিয়ে প্রিয়শঙ্কর বললেন, "আহা-হা! ক্ষমা যেন আমি করলাম, কিন্তু তুমি যে আমার সমস্ত মতলব নষ্ট ক'রে দিলে তার এখন কি হয়? তুমি কি বুঝতে পার নি—" তারপর যা বলতে যাচ্ছিলেন তা বন্ধ ক'রে বললেন, "যাক, সে কথা যাক। তুমি তো ক্ষমা চেয়ে খালাস হ'লে, সে ছেলেটাও এসে হয়ত বলবে—আমি বিয়ে করেছি, ক্ষমা কর বাবা।"

খানিকক্ষণ অত্যন্ত বিকৃত মুখে ব'সে থেকে বললেন, "এখন বিনুর আসার কথা মাথায় উঠল। তোমার ব্যবস্থা কি করব তাই হ'ল ভাবনা। তোমার ত এ পুরুষের বাড়িতে থাকা আর চলে না, বিশেষত বিনু আসার পরে। তোমাকে এই সপ্তাহেই বিলেত পাঠিয়ে দিই।"

প্রিয়শঙ্করকে নিরস্ত করতে উষা অনেক চেষ্টা করলে; কিন্তু কোন ফল হ'ল না। অগত্যা স্থির হ'ল উপস্থিত উষা বোম্বায়ে তার এক আত্মীয়ের গৃহে গিয়ে উঠবে, তারপর সেখান থেকে সুবিধামতো প্যাসেজ বুক ক'রে বিলেত যাত্রা করবে। পরদিন বম্বে মেলে বোম্বাই যাওয়া স্থির হ'ল।

উষার সঙ্গে প্রিয়শঙ্কর জোর ক'রে এত টাকা দিয়ে দিলেন যে, বিলেত গিয়ে ফিরে আসার পক্ষেও তা যথেষ্ট।

বিদায়কালে উষা গলবস্ত্র হ'য়ে প্রিয়শঙ্করকে প্রণাম করতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদতে লাগল। স্খলিত কণ্ঠে প্রিয়শঙ্কর বললেন, "উষা, আমার ক্রাচটা? এখন থেকে ত আবার দরকার হবে।"

তাড়াতাড়ি লাঠিটা এনে প্রিয়শঙ্করের হাতে দিয়ে আবার একবার প্রণাম ক'রে উষা গাড়িতে গিয়ে বসল।

গাড়ি ছাড়তে প্রিয়শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে বললেন, "সাবধানে যেয়ো মা।" তারপর লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে ঘরে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

বোম্বাই পর্যন্ত উষাকে পৌঁছে দেবার জন্যে যে লোককে প্রিয়শঙ্কর সঙ্গে দিয়েছিলেন, সে স্টেশন থেকে ফিরে এল। অনাবশ্যক বোধে উষা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

৩

উষা চ'লে যাওয়ার পর তিন দিন প্রিয়শঙ্কর ভাল ক'রে কারো সঙ্গে কথা কন নি, ভাল ক'রে খান নি, এমন কি খবরের কাগজ পর্যন্ত পড়েন নি।

প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন বিনয়ের আসার দিন স্টেশনে যাবেন না, কিন্তু শেষকালে যাওয়াই স্থির করলেন—পাছে পিতাকে স্টেশনে দেখতে না পেয়ে বিনয় দুঃখিত হয়।

যথাসময়ে বম্বে মেল এসে উপস্থিত হ'ল। প্ল্যাটফর্মের যেখানে প্রিয়শঙ্কর দাঁড়িয়ে ছিলেন, বিনয়ের গাড়ি সে স্থান অতিক্রম ক'রে একটু এগিয়ে দাঁড়াল। বিনয় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ছিল।

প্রিয়শঙ্কর বিনয়ের গাড়ির সম্মুখে উপস্থিত হলেন। বিনয় গাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি নেমে প্রিয়শঙ্করের পদধূলি গ্রহণ ক'রে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করতে লাগল। কুলিরা জিনিসপত্র নামাতে আরম্ভ করলে। জিনিস নামানো হ'য়ে গেছে—কুলিরা জিনিস মাথায় ক'রে যাবার জন্যে প্রস্তুত, কিন্তু তবুও বিনয়ের নড়বার কোনও লক্ষণ নেই—অন্যমনস্ক হ'য়ে অসংলগ্নভাবে অনাবশ্যক কথাবার্তা কইতেই লাগল।

প্রিয়শঙ্কর বললেন, "এবার চল বিনু, যাওয়া যাক। গাড়িতে আর কোনো জিনিস আছে নাকি?"

প্রিয়শঙ্করের সঙ্গে এসেছিল পুরনো চাকর জয়রাম, সে বললে, "গাড়ির মধ্যে উষাদিদিমণি রয়েছেন।"

প্রিয়শঙ্কর চমকে উঠলেন—"সে কি!"

এ কথা উষার কানে গিয়েছিল, সে আরক্তমুখে গাড়ি থেকে নেমে প্রিয়শঙ্করের পদধূলি গ্রহণ ক'রে দাঁড়াল।

বিনয়ের দিকে তাকিয়ে প্রিয়শঙ্কর বললেন, "এ কি কাণ্ড বিনু!"

সভয়ে বিনয় বললে, "বাবা, আমাকে ক্ষমা করুন। উষা আপনার পুত্রবধূ।"

শূন্য বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রিয়শঙ্কর ক্ষণকাল নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন, তারপর হঠাৎ তাঁর হাত থেকে ক্রাচটা মাটিতে প'ড়ে গেল।

ক্ষিপ্রবেগে ছুটে গিয়ে উষা প্রিয়শঙ্করকে ধ'রে ফেললে। পর-মুহূর্তে দেখা গেল, উষার বাহুতে ভর দিয়ে প্রিয়শঙ্কর তাঁর মোটরের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।

পরিচয়

১

অর্থনীতি এবং অঙ্কশাস্ত্রের একটা কঠিন পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে শক্তিনাথ কলিকাতার কাস্টম হাউসে একটা মোটা মাহিনার চাকরি লাভ করবার পর মাতা সৌদামিনী জিদ ধ'রে বসলেন যে, এর পরও বিবাহের প্রস্তাবে পুত্র অসম্মতি প্রকাশ করলে সত্যসত্যই তিনি রাগ করবেন।

একটু ইতস্তত ক'রে শক্তিনাথ স্মিতমুখে বললে, "বেশ ত মা, তোমার আশীর্বাদে যখন মোটা ভাত-কাপড়ের একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছি, তখন তোমার অবাধ্য না হ'লে বিশেষ কিছু ক্ষতি হবে না। তোমার আদেশ পালন করব।"

ভাত-কাপড়ের যুক্তিটা একদিক থেকে বস্তুত কোনো সময়েই তেমন সারবান ছিল না, কারণ শক্তিনাথের পিতা যে-অর্থ এবং সম্পত্তি রেখে পরলোকগমন করেছিলেন তাতে শক্তিনাথের উপার্জনের অর্থ যোগ

না দিলেও শুধু মোটা ভাত-কাপড়ই বা কেন, মিহি ভাত-কাপড়ের সমস্যাও অবলীলাক্রমে সমাধান হ'তে পারত। কিন্তু সৌদামিনী সে কথা তুললে শক্তিনাথ উত্তর দিত, "সে কথা ত ঠিকই মা। কিন্তু ও-টাকা ত আমার নয়, ও-টাকা তোমার। বাবা সমস্ত সম্পত্তির ষোল আনাই তোমাকে উইল ক'রে দিয়ে গেছেন শুধু সেই জন্যেই নয়, উইল না ক'রে গেলেও বাবার টাকাতে ষোল-আনা অধিকার তোমারই থাকত, এই আমি বুঝি। বাবা মারা গেলে টাকা হবে আমার, আর তুমি আমার কাছে থেকে মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন পাবে—আদালতের এ আইন আমার আইন নয়।"

এ কথার উত্তরে সৌদামিনী হয়ত বলতেন, "তা বেশ ত শক্তি, আমি দানপত্র ক'রে সমস্ত বিষয় তোকে লিখে দিচ্ছি, তুই নে। তা হ'লে ত তোর আর কোনো আপত্তি থাকবে না।"

উত্তরে শক্তিনাথ হাসিমুখে বলত, "তা হ'লে আপত্তি আমার চার গুণ বেড়ে যাবে মা। সুপুত্তুর না হই, কিন্তু বাবার আমি এমন কুপুত্তুর নই যে, যে-বিষয় তিনি উইল ক'রে তোমাকে দিয়ে গেছেন, ছলে-ছুতোয় দানপত্র লিখিয়ে নিয়ে তা থেকে তোমাকে বঞ্চিত করব। যে স্নেহের দান তোমার কাছ থেকে পাচ্ছি তার কাছে বিষয় ত তুচ্ছ। তা ছাড়া, তুমি ত জান মা, সাধু ব্যক্তিরা বিষয়কে বিষ ব'লে নিন্দে ক'রে গেছেন।" ব'লে শক্তিনাথ উচ্চহাস্য ক'রে উঠত।

মাতা বলতেন, "এ তোর অভিমানের কথা শক্তি।"

শক্তি বলত, "কখনই নয় মা। তর্কের খাতিরে যদি স্বীকারই ক'রে নিই যে, বাবার উপর আমার হয়ত কিছু অভিমান আছে, কিন্তু তোমার উপর যে এক বিন্দুও নেই তা একেবারে সত্যি। তা যদি থাকত তা হ'লে দিনের পর দিন এমন নিশ্চিন্ত মনে একজন আইবুড়ো মেয়ের মতো তোমার কাছ থেকে খোরপোশ আদায় করতে পারতাম না। যতদিন না নিজে উপার্জন করতে পারছি ততদিন তোমার পয়সা খেতে আমার কোনো অপমান নেই মা, কিন্তু তাই ব'লে একটা দানপত্র করিয়ে নিয়ে তোমার পয়সা নিজের ইচ্ছামতো ভোগ ক'রে আত্মসম্মান চরিতার্থ করব —এমন হীন মাতৃগর্ভে আমার জন্ম হয় নি।"

পুত্রের এই সকল কথারই ভিতরে ভিতরে সৌদামিনী অভিমানের

ভাষ্য পাঠ করতেন। শক্তিনাথকে তিনি চিনতেন এবং সেজন্য জানতেন যে, তাঁর উপর অভিমানের কোনো কারণ না থাকলেও স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর তার নিস্পৃহা চিরদিন বর্তমান থাকবে, এবং সেজন্য তাঁর নিজের হাত থেকেও প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক কপর্দকও কোনো দিনই সে গ্রহণ করবে না। এ কথা তিনি সেই দিনই বুঝেছিলেন যেদিন তাঁর স্বামী শক্তিনাথকে ডেকে বলেছিলেন—'শক্তি, আমার যা কিছু সম্পত্তি সমস্তই তোমার মার নামে উইল ক'রে দিয়ে গেলাম', এবং উত্তরে শক্তিনাথ বলেছিল—'এ বিষয়ে আমার একমাত্র প্রার্থনা বাবা, তোমার উইলে আমাকেও সাক্ষী ক'রে সই করিয়ে নাও। তোমার উইলে আমার আনউইলিংনেস নেই—ওর মধ্যে এই প্রমাণটুকু আমার হাতের অক্ষরে লেখা থাকলে আমার মনে আর কোনো ক্ষোভই থাকবে না।'

কি কারণে শক্তির পিতা শক্তির মতো অমন মেধাবী পুত্রকে বঞ্চিত ক'রে স্ত্রীর নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিয়ে গিয়েছিলেন, কৌতূহলোদ্দীপক হ'লেও এ আখ্যায়িকার পক্ষে অবান্তর ব'লে সে কথার এইখানেই শেষ।

২

পুত্রের মুখে বিবাহে সম্মতির কথা শুনে সৌদামিনী আনন্দিত হ'য়ে বললেন, "তবে আমি শিবানীর সঙ্গে তোর বিয়ের কথা পাকা ক'রে ফেলি শক্তি। এই মাঘ মাসেই।"

সবিস্ময়ে শক্তিনাথ বললে, "শিবানী আবার কে মা?"

সৌদামিনী বললেন, "ও মা, শিবানীকে একেবারে ভুলে গেলি? ভবনাথ মুখুজ্জের মেয়ে—শিবানী। গেল বোশেখ মাসে শিলং যাবার পথে আমাদের বাড়িতে ঘণ্টা কয়েকের জন্যে কাটিয়ে গিয়েছিল। নন্দীহাটের ভবনাথ মুখুজ্জে,—বর্ধমানের উকিল।"

শক্তিনাথের মনে পড়ল। বললে, "মনে পড়েছে মা। অনেক দিনের কথা কি-না, ভুলে গিয়েছিলাম।"

"অনেক দিনের কথা কি রে? এই ত মাস কয়েকের কথা। কেন, শিবানীকে ত তোর ভাল লেগেছিল শক্তি?"

"ভালকে ভাল লাগবে না কেন মা? ভালই লেগেছিল। কিন্তু তুমি সেখানে কোনো রকম কথা দাও নি ত?"

প্রশ্নের ভঙ্গীর মধ্যে পিয়ালী সম্বন্ধে যে অকথিত আপত্তি প্রচ্ছন্ন ছিল তা উপলব্ধি ক'রে সৌদামিনীর মুখের প্রসন্ন ভাব অন্তর্হিত হ'ল; বললেন, "তোর মত না পেলে কথা দোব কোন্ সাহসে শক্তি? কিন্তু তারা তাদের কথা দিয়ে ব'সে আছে তোর প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের অপেক্ষায়।"

সৌদামিনীর কথা শুনে শক্তিনাথের মুখে বিহ্বলতার লক্ষণ দেখা দিলে; কিন্তু পরক্ষণেই নিঃশব্দ সলজ্জ হাস্যে মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল; বললে, "মা, আমি একটা অপরাধ করেছি, তোমাকে কিন্তু ক্ষমা করতে হবে।"

সকৌতূহলে সৌদামিনী জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই আবার কি অপরাধ করলি শক্তি?" তারপর নির্বাক শক্তিনাথের লজ্জা-বিমূঢ় মুখ লক্ষ্য ক'রে সহসা বললেন, "ও! তুই বুঝি কোথাও কথা দিয়েছিস তা হ'লে?"

শক্তিনাথ বললে, "আমি কেন কথা দোব মা? কথা তুমিই দেবে। তবে তোমার প্রতি আমার একান্ত প্রার্থনা—ওইখানেই কথা দিয়ো।"

এ কথা-দেওয়ার মূল্য যে কি, তা অনুভব করবার মতো চেতনার অভাব সৌদামিনীর ছিল না। মুখের ভাবের মধ্যে একটু কাঠিন্য দেখা দিল; কুশাগ্র-সূক্ষ্ম একটা অভিমান, কোথায় কেমন ক'রে তার উৎপত্তি তা ঠিক বোঝা যায় না, মনের এক কোণে একটু একটু বিঁধতে লাগল। বললেন, "ওখান কোন্‌খান তা ত আমি জানি নে শক্তি।"

শক্তিনাথ বললে, "বরিশালের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বিনোদ চাটুজ্জের মেয়ে।"

"তোর সঙ্গে জানাশুনো হ'ল কোথায়? কলকাতায়?"

"হ্যাঁ।"

"এখানে কি করে? পড়ে?"

"না, পড়ায়।"

"পড়ায়? কোথায় পড়ায়? স্কুলে?"

"কলেজে।"

"কলেজে? কি পাস করেছে?"

"ইংরিজীতে এম. এ.।"

"বয়েস কত রে? তোর চেয়ে ছোট ত?"

মৃদু হেসে শক্তিনাথ বললে, "হ্যাঁ মা, ছোট। তবে খুব বেশি নয়, বছর দেড়েকের ছোট।"

"মাইনে পায় কত?"

"দু শো টাকা।"

সৌদামিনী বললেন, "তা মন্দ কি? তবে বিয়ের জন্যে তোর চাকরি হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবার কি দরকার ছিল শক্তি? দু শো টাকাতে তোদের দুজনের এক রকম চ'লে যেতে পারত।"

সৌদামিনীর কথা শুনে শক্তিনাথের মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল; বললে, "এমন কথা তুমি রাগ ক'রেও আমাকে ব'লো না মা। তোমার অর্থে মানুষ হচ্ছি ব'লে তুমি কি আমাকে এমনি অমানুষ ভাবো যে, স্ত্রীর অর্থেও আমি মানুষ হ'তে পারি?"

সৌদামিনী বললেন, "এ শাস্ত্র তুই কোথায় পেলি রে শক্তি যে, স্ত্রীর অর্থে মানুষ হ'লে অমানুষ হ'তে হয়? এত অপরাধ বেচারা স্ত্রী কখন করলে?"

শক্তিনাথ বললে, "তা জানি নে মা, কিন্তু তুমি রাজি আছ কি-না বল?"

মৃদু হেসে সৌদামিনী বললেন, "হিন্দীতে একটা কথা আছে, দুলহা দুলহিন রাজি তো কেয়া করেগা কাজী? তোরা দুজনে যখন রাজি ত আমি নারাজ কেন হব?"

ব্যগ্রকণ্ঠে শক্তিনাথ বললে, "মন খুলে বলতে হবে মা, তুমি রাজি কি-না। অভিমানের সুরে বললে চলবে না।"

পুত্রের কথায় সৌদামিনী হেসে ফেললেন; বললেন, "শোন কথা! অভিমানের সুর আবার কোথায় পেলি? আচ্ছা, আচ্ছা, আমি রাজি।" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েটির নাম কি রে শক্তি?"

শক্তিনাথ বললে, "তমিস্রা—তমিস্রা চ্যাটার্জি।"

সৌদামিনী বললেন, "বেশ নাম। বেশ নতুন ধরণের।" মনে মনে বললেন, তমিস্রা তা বুঝতেই পেরেছি। এখন সংসারটিকে নিজের ছায়া দিয়ে একেবারে না ঢাকলে বাঁচি!

৩

মার্চ মাসেই তমিস্রার সঙ্গে শক্তিনাথের বিবাহ হ'য়ে গেল। বধূ এলে সৌদামিনী তাকে সাদরে বরণ ক'রে নিলেন। মনের মধ্যে একটু যে উৎকণ্ঠা, এম.-এ.-পাস-করা মাসিক দুই-শত-টাকা-বেতন-গর্বিতা বধূর বিষয়ে একটু যে ত্রাস ছিল, তমিস্রার হাস্যপ্রফুল্ল সুন্দর মুখ দেখে অনেকখানিই তার লাঘব হ'ল। কাজকর্মের ফাঁকে এক সময়ে বধূকে একান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ বউমা, বিয়ের জন্যে কলেজ থেকে কত দিনের ছুটি নিয়েছ?"

তমিস্রা বললে, "ছুটি ত নিই নি মা। বিয়েতে আপনার সম্মতি পাবার পর আর কলেজে যাই নি, রেজিগ্‌নেশন দিয়ে দিয়েছি।"

বিস্মিতকণ্ঠে সৌদামিনী বললেন, "দু শো টাকার চাকরিটা একেবারে ছেড়ে দিলে বউমা?"

স্মিতমুখে তমিস্রা বললে, "চাকরিতে আর দরকার কি মা? এখন ত আপনাদের কাছে পাকা আশ্রয় পেয়েছি। এখন আপনাদের খাব, পরব।"

"কিন্তু বিয়ের আগেও ত তোমার অভাব ছিল না, তোমার বাবা ত মোটা মাইনের চাকরি করেন। তখন কেন চাকরি নিয়েছিলে?"

তেমনি হাসিমুখে তমিস্রা বললে, "বাপের বাড়ির আশ্রয় ত মেয়েদের চিরকালের আশ্রয় নয় মা। শ্বশুরবাড়ির দুঃখ-কষ্ট গায়ে লাগে না, কিন্তু বাপের বাড়ির অনাদর-অবহেলা সহ্য করা শক্ত। তাই চাকরিটা সহজে পেয়েছিলাম ব'লে ছাড়ি নি। কিন্তু পাকা আশ্রয় পাবার পর আর ছাড়তে দেরি করি নি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্যায় করেছি কি মা?"

অন্যায় ত দূরের কথা, চাকরি ছাড়ার কথা শুনে সৌদামিনী মনের একটা দিকে একটু নিশ্বাস ছেড়ে হালকা হয়েছিলেন। পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবধূও গাড়ি চ'ড়ে অর্থোপার্জন করতে ছুটবে না, সংসারের এই সহজ শিষ্ট মূর্তি স্মরণ ক'রে তিনি মনে মনে বধূর নিকট একটু কৃতজ্ঞই হলেন। বললেন, "না, না, অন্যায় কেন? তবে টাকাটাও ত নিতান্ত কম নয়,—হঠাৎ ছেড়ে দিলে,—তাই বলছি।"

তমিস্রা নম্রকণ্ঠে বললে, "তা ছাড়া আরও একটা কথা ভেবেছিলাম মা। আমার ত আর টাকার কোনো অভাব রইল না, কিন্তু এমন বিধবা অথবা অবিবাহিত স্ত্রীলোক আছেন যাঁদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, আমি চাকরি ছাড়লে তাঁদের মধ্যে একজন সেটা পেতে পারেন। পেয়েছেনও তেমনি একজন।"

মনে মনে বধূর কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রে প্রসন্নমুখে সৌদামিনী বললেন, "ভালই করেছ বউমা, আমি এতে খুশিই হয়েছি।"

৪

কিন্তু এ সবই গেল বিবাহকালের কথা। উৎসবের দিনে সকলেরই কথাবার্তা চালচলন এমন একটা পর্যায়ে চলে যে, সে সময়ে লোকের স্বরূপ ঠিক ধরা যায় না। উৎসবের বাঁশী যখন থামল, সংসার যখন তার নিত্যকার সহজ কর্মানুবর্তিতায় ফিরে এল, তখন তার মধ্যে সৌদামিনী তমিস্রার যে মূর্তি দেখতে পেলেন তাতে তাঁর মনের স্থৈর্য একটু বিচলিত হ'ল। মনে হ'ল, সংসারের পর্দায় হয়ত তাঁর সুরের সঙ্গে তমিস্রার সুর ঠিকমতো ভিড়বে না,—হয়ত উভয়ের মধ্যে এমন একটু প্রভেদ বর্তমান থাকবে, যাতে একটা বিবাদী কর্কশ শব্দই উৎপন্ন হবে।

এই রকমই মনে হয়, অথচ এ রকম মনে করবার এমন কোনো প্রমাণ-পরিচয় পাওয়া যায় না যা সহজে ধরা-ছোঁয়া যায়। সমস্তটাই যেন অনুমানের নীহারিকার মধ্যে অস্পষ্ট, কিন্তু অস্তিত্ব যে তার আছে তা চোখে দেখা না গেলেও মনে অনুভব করা যায়। তমিস্রার মুখে হাস্য, বাক্যে সংযম, আচরণে শ্রদ্ধা; কিন্তু তৎসত্ত্বেও তার-যে সব সময়েই একটা স্বাধীন মত স্বাধীন সত্তা আছে তাও এই সবেরই মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তার অভিমত সৌদামিনীর অভিমতকে কখনো অতিক্রম করে না, কিন্তু সব সময়েই পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। কখনো কখনো তার মত সৌদামিনীর মতের মধ্যে নিমজ্জিত হয়; কিন্তু তখনো তার মধ্যে তমিস্রার ব্যক্তিত্বের অপরিচয় থাকে না, মনে হয় ইচ্ছা ক'রেই সে নিজের মতকে অগ্রসর হ'তে দিলে না, পরাজিত করালে।

এর ফলে ক্রমশ যেন তমিস্রা সংসারের কর্মক্ষেত্রের অভিমুখে অগ্রসর হ'তে লাগল এবং সৌদামিনী রত্নবেদিকায় ধাপে উঠতে লাগলেন। সে রত্নবেদিকায় শ্রদ্ধা আছে, সেবা আছে, হয়ত খানিকটা ভালবাসাও আছে,—কিন্তু এমন দুঃসহ কর্মহীনতা আছে যা আত্মাকে পীড়ন করে। রত্নবেদীর উপর নিয়মিতভাবে ফুল-বিল্বপত্র পড়ে, ভোগও চড়ে,—কিন্তু তার আয়োজনের স্থল নীচে, যেখানে কর্মের স্রোত প্রবাহিত। তমিস্রা বলে, 'তুমি ত এতদিন সংসারকে চালনা করলে মা, এবার আমাদের হাতের সেবা গ্রহণ কর।' কিন্তু কে চায় অন্তরের সঙ্গে সেই হাতের সেবা, যে-হাত কর্তৃত্ব কেড়ে নিয়ে অবসর দিতে চায়! সৌদামিনীর মনে পুনরায় কুশাগ্রসূক্ষ্ম অভিমান দেখা দিল।

সাধারণ অবস্থায় ঠিক এতটাই হয় না। কিন্তু এ ক্ষেত্রের কথা একটু স্বতন্ত্র। স্বামীর সম্পত্তি উপলক্ষ্য ক'রে, শুধু পুত্রেরই নয়, সৌদামিনীর নিজের মনেও অভিমানের যন্ত্রটি ক্রমশ এমন তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠেছিল যে, সূক্ষ্ম অনুভূতিবিশিষ্ট ভূকম্পমান যন্ত্রের মতো সামান্য নাড়াতেও তার মধ্যে সাড়া প'ড়ে যেত। এমনই কি গুরুতর অপরাধ হয়েছে রে বাপু, যে মার হাত দিয়েও সে সম্পত্তির কণামাত্র গ্রহণ করা চলে না। পুত্র হ'য়ে আইবুড়ো মেয়ের মতো লালিত-পালিত হওয়া, সেই সম্পত্তির প্রতি বিদ্বেষ ও বৈরাগ্যকে প্রকট ক'রে তোলা ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে হ'ল, পুত্রবধূও এসে সমস্ত অবগত হ'য়ে পুত্রের সুরেই সুর মেলাবার উপক্রম করছেন। চিরন্তনী পুত্রবধূর প্রতি চিরন্তনী শাশুড়ীর এ অবচেতন ঈর্ষার কথা কি-না তা বলা যায় না; কিন্তু মনে হ'ল, মার হাত থেকে পুত্রের লালনপালনটুকুও তিনি তুলে নিতে চান। পুত্রের প্রতি অভিমান, সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ঘনীভূত হ'য়ে এল। মনে হ'ল, প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এখন মানে মানে স'রে পড়াই ভাল। আগেকার কালে এই কারণেই লোকে পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যেত। পরে বনবাসের পরিবর্তে কাশীবাসের প্রথা প্রচলিত হয়েছিল। সৌদামিনী কাশী যাওয়াই স্থির করলেন, এবং সে বিষয়ে দ্বিধা এবং বিলম্ব করবেন না মনে মনে তাও স্থির ক'রে ফেললেন।

কথাটা শুনে শক্তিনাথ প্রথমে পরিহাস ব'লে উড়িয়ে দিলে, তারপর প্রবল ভাবে আপত্তি তুললে, তারপরে রাগারাগি করলে, সর্বশেষে অভিমান ক'রে চুপ হ'য়ে গেল।

তমিস্রা বললে, "মা, তুমি আমার ওপর রাগ ক'রে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যাচ্ছ ?"

হাসিমুখে সৌদামিনী বললেন, "তোমার ওপর রাগ করব কেন বউমা, তুমি ত কোনো দোষই কর নি।"

তমিস্রা বললে, "জেনে-শুনে কোনো দোষ করি নি ব'লেই ত মনে হয়। তা হ'লে অদৃষ্টেরই দোষ বলতে হবে। কিন্তু এতে আমার ভারি একটা দুর্নাম র'টে যাবে মা। সকলে বলবে, এমন বউ এল যে, ছ মাসও শাশুড়ী টি'কতে পারলে না।"

সৌদামিনী বললেন, "যাঁরা তোমাকে দেখেছে তারা কেউ সে কথা বলবে না বউমা। যারা দেখে নি তারা জানে, সংসারের রীতি চিরদিনই এই হ'য়ে আসছে,—একজন আসে, আর আর-একজন যায়। আজ বাড়ি ছেড়ে কাশী যাচ্ছি, আবার একদিন কাশী ছেড়েও আরো দূরে চ'লে যেতে হবে। সেদিন ত কোনোমতে ঠেকাতে পারবে না বউমা।"

শক্তিনাথ বললে, "একটা কাজ করা যাক মা, বাড়িটার মাঝখানে একটা পাঁচিল গাঁথিয়ে দেওয়া যাক। তুমি থাক দক্ষিণ দিকের অংশে, আমরা থাকি উত্তর দিকে। টাকাকড়ি লোকজন সবই ত তোমার আছে, কোনো অসুবিধে হবে না।"

সৌদামিনী মনে মনে বললেন, চোখে দেখা যায় না ব'লে কি সে পাঁচিল পড়তে বাকি আছে! মুখে বললেন, "তুই রাগ করিস নে শক্তি, একদিন আমার মুখে তোকেই ত আগুন দিতে হবে বাবা। তাই যখন সহ্য করতে হবে তখন সামান্য কাশী যাওয়ার কথা শুনে এত অধীর হচ্ছিস কেন? চিরকালই কি ইহ নিয়ে থাকব? পরকালের পথটা কি একবারও খুঁজে দেখতে হবে না ?"

শক্তিনাথ বললে, "কাশীতে গলি-ঘুঁজি এত বেশি যে, তার মধ্যে পরকালের পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে ব'লে মনে হয় না।"

স্মিতমুখে সৌদামিনী বললেন, "বিশ্বেশ্বর দয়া করলে শক্তও হবে না শক্তি।"

শক্তিনাথ বললে, "কাশীধাম না হয় বিশ্বেশ্বরের রাজধানী হ'ল, তাই ব'লে কি কলকাতা পর্যন্তও তাঁর দয়া পৌঁছবে না? ভারতেশ্বর থাকেন সাত সমুদ্র তেরো নদী পারে ইংল্যাণ্ডে, কিন্তু তাই ব'লে তাঁর প্রভাব ত এখানে কিছু কম দেখি নে!"

শক্তিনাথের কথা শুনে সৌদামিনীর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল; বললেন, "ভাগ্যে এই উদাহরণটা দিলি, তাই তোকে বোঝানো সহজ হবে। এখানে প্রভাব যদি সমানই হবে তা হ'লে তোর বাপ খলসেকুটি তালুকের মামলা এখানে হাইকোর্টে হেরে বিলেতে আপীল করলেন কেন, আর সেখানে আপীল জিতলেনই বা কেমন ক'রে? ও-কথা তোর ঠিক নয় শক্তি, মফস্বলের চেয়ে সদরের প্রভাব একটু বেশি আছেই বইকি—স্থান-মাহাত্ম্য মানতেই হবে। কিন্তু এ-সব বাজে কথা যাক, তুই আমাকে কাশীবাস করবার ব্যবস্থা ক'রে দে বাবা, আমার পরকালের মঙ্গলে বাধা দিস নে। কাশী ত এখন আর আগেকার মতো চার মাসের পথ নয়—এক রাত্রির মামলা—মাঝে মাঝে গিয়ে আমাকে দেখে-শুনে আসিস।"

৬

এইরূপ তর্ক-বিতর্কে আরও কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর শক্তিনাথ যখন দেখলে, সৌদামিনী কাশী যাবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন, কিছুতেই সে সঙ্কল্প থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা যাবে না, তখন অগত্যা মাতার কাশীধাম যাতে সাধ্যমতো অসুবিধাজনক না হয় সে-বিষয়ে উদ্যোগী হ'ল। সাবেক আমলের সরকার বেণী ঘোষকে কাশী গিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন হাওয়াদার বাড়ি ভাড়া করবার জন্য আদেশ দিলে। বাড়ি ভাড়া হ'য়ে গেলে চুনকাম করিয়ে দরজা-জানলায় রঙ দিইয়ে, ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার ক'রে সংবাদ দিলে সে সৌদামিনীকে কাশী পৌঁছে দিয়ে আসবে স্থির করলে। এ কথাও ব'লে দিলে যে, গৃহস্থালীর যাবতীয়

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যেন ক্রয় করা থাকে, যাতে পৌঁছে সৌদামিনীকে কোনোদিক দিয়ে কিছুমাত্র অসুবিধা ভোগ করতে না হয়।

অদূরেই সৌদামিনী দাঁড়িয়ে ছিলেন, পুত্রের কথা শুনে নিকটে এসে বললেন, "কতকগুলো অদরকারি জিনিসপত্র কিনে অনর্থক আমাকে বিব্রত করবেন না সরকার মশায়, আমি ফর্দ ক'রে দেবো ঠিক সেই মতো কিনবেন। আর দেখুন, খুব হাওয়াদার বাড়ি না হ'লেও আমি দম আটকে মরব না, কিন্তু দু বেলা হেঁটে হেঁটে যাতে মরতে না হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন, মন্দিরের যত কাছাকাছি হয় বাড়ি ভাড়া করবার চেষ্টা করবেন।"

সৌদামিনীর কথা শুনে চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে শক্তিনাথ বললে, "তুমি সেখানে দু বেলা হেঁটে হেঁটে মন্দিরে যাবে না-কি মা?"

"না, তা কেন যাব? তুই সেখানে গিয়ে একটা চতুর্দোলা করিয়ে দিস, তাই চ'ড়ে মন্দিরে যাব।"—ব'লে সৌদামিনী হাসতে লাগলেন।

বেণীমাধব বললে, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন মা, আমি সব দিকে দৃষ্টি রেখে বাড়ি করব—কোনো অসুবিধা হবে না।"

দু-তিন দিনের মধ্যে টাকাকড়ি নিয়ে বেণী ঘোষ কাশী রওনা হ'ল, এবং দিন দশেক পরে তার কাছে থেকে চিঠি এল, সেখানকার সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ।

শুভদিন নির্ণয়ের নিষ্ঠার আতিশয্য শক্তিনাথের হঠাৎ এমন বেড়ে গেল যে, দিন পনেরোর পূর্বে ভাল যাত্রিক দিন কিছুতেই পাওয়া গেল না। যাওয়াই যখন হচ্ছে তখন কয়েকটা দিনের জন্য সৌদামিনী আর আপত্তি করলেন না,—মনে মনে নিজেও বোধ হয় একটু খুশিই হলেন।

৭

কাশী যাত্রার তখন তিন দিন বিলম্ব আছে, হঠাৎ প্রাতঃকালে বরিশাল থেকে তমিস্রার একটি বাইশ-তেইশ বৎসরের ভাই এসে হাজির,—নাম তার সুবিনয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল, সুবিনয়ের আকস্মিক আগমনের একমাত্র উদ্দেশ্য—সেই দিন বৈকালের গাড়িতেই

তমিস্রাকে বরিশাল নিয়ে যাওয়া। এ কথাও জানতে বাকি রইল না, এ ব্যবস্থা তমিস্রা নিজে বরিশালে চিঠি লিখে করিয়েছে।

তমিস্রাকে দেখতে পেয়ে সৌদামিনী বললেন, "এ কি কাণ্ড বউমা?"

নিকটে এসে তমিস্রা বললে, "কি মা?"

"তুমি না-কি আজকের গাড়িতে বরিশাল যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি।"

"তিন দিন পরে আমি কাশী যাব, আর আজ তুমি বাড়ি ছেড়ে চললে বউমা?"

মুখ একটু গম্ভীর ক'রে তমিস্রা বললে, "সেই জন্মেই ত যাচ্ছি মা।"

"তার মানে?"

"তার মানে, এ বাড়িতে আমি রইলাম আর তুমি চ'লে গেলে—এ অবস্থাটা আমি সহ্য করতে পারব না; তাই তুমি এ বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে আমি চ'লে যাচ্ছি।"

"কিন্তু আমি চ'লে যাওয়ার পর আবার ত তুমি এ বাড়িতে আসবে বউমা?"

চক্ষু ঈষৎ বিস্ফারিত ক'রে তমিস্রা বললে, "ওমা, তা আবার আসব না? নিশ্চয় আসব। শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে কেউ আমাকে দূরে রাখতে পারবে না মা, তোমার কাশীর বিশ্বনাথও না।"

কাশীর বিশ্বনাথের উপর পুত্র এবং পুত্রবধূর আক্রোশ লক্ষ্য ক'রে সৌদামিনীর মনের এক কোণে কৌতুকের অন্ত ছিল না,—মুখে অতি ক্ষীণ হাস্য স্ফুরিত হ'ল। বললেন, "বোঝা গেল, কাশীর বিশ্বনাথ না হয় খুবই শক্তিহীন লোক, কিন্তু একটা কথা ত ভাল ক'রে তলিয়ে দেখ নি বউমা,—আমি চ'লে যাওয়ার পর যেদিন তুমি ফিরে আসবে, সেদিন হয়ত লোকে বলবে—এমন বউ যে, শাশুড়ী বিদেয় হ'ল, তার পর ঘরে এসে ঢুকল!"

তমিস্রা বললে, "তা হয়ত বলবে, কিন্তু এ কথা ত বলতে পারবে না—এমন বউ যে, দাঁড়িয়ে থেকে শাশুড়ীকে বিদেয় করলে।"

সৌদামিনীর মুখে পুনরায় হাসি স্ফুরিত হ'ল, বললেন, "তুমি এম.-এ.-পাস-করা মেয়ে বউমা, তোমার সঙ্গে কি কথায় আমি পারি?—হার স্বীকার করলাম।"

তমিস্রাকে একান্তে পেয়ে শক্তিনাথ বললে, "এ কিন্তু তোমার বাড়াবাড়ি তমিস্রা।"

তমিস্রা বললে, "এ কথার প্রতিবাদ করছি নে।"

"মা ভারি ক্ষুণ্ণ হবেন কিন্তু।"

"ক্ষুণ্ণ হবার যন্ত্র ভগবান শুধু তাঁর মনেই বসান নি, আমার মনেও বসিয়েছেন।"

স্মিতমুখে শক্তিনাথ বললে, "বাপের বাড়ি যাওয়া সেই ক্ষোভের নন্-ভায়োলেণ্ট প্রোটেস্টের একটা ডিমনস্ট্রেশন না কি?"

তমিস্রা বললে, "তুমি ঠিকই বলেছ, এ আমার সত্যিই প্রোটেস্ট্; কিন্তু ভারি ইন্‌ডিগ্‌ন্যাণ্ট্ প্রোটেস্ট্।"

তমিস্রাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারা গেল না। সেই দিনেই সে বরিশাল চ'লে গেল। যাবার সময়ে গললগ্নবাস হ'য়ে শাশুড়ীকে প্রণাম ক'রে বললে, "অশিষ্ট মেয়ের অপরাধ নিয়ো না মা।"

পুত্রবধূর মস্তকে হস্তার্পণ ক'রে সহাস্যমুখে সৌদামিনী বললেন, "তুমি যখন নিষেধ করছ তখন না-হয় নোব না।"

শিয়ালদহ স্টেশনে গাড়ি ছাড়বার পূর্বে শক্তিনাথ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "কবে ফিরবে তমিস্রা?"

তেমনি মৃদুস্বরে তমিস্রা বললে, "তোমার চিঠি পেলেই।"

"সুবিনয়ই নিয়ে আসবে, না, আমাকে যেতে হবে?"

মৃদুস্মিত মুখে তমিস্রা বললে, "শ্বশুর-বাড়ির আদর-যত্নের জন্যে যদি লোভ হয়, তা হ'লে নিজেই যেয়ো,—নইলে সুবিনয়ই নিয়ে আসবে।"

৮

কাশী যাবার দিন সৌদামিনী সকাল থেকে সমস্ত দিনই কতকটা গম্ভীর হ'য়ে রইলেন। জলভারগুরু মেঘের মতো মন্থর গতিতে মাঝে মাঝে গৃহের মধ্যে ইতস্তত বিচরণ করতে লাগলেন,—সব সময়েই যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে, তা নয়,—অধিকাংশ সময়েই উদাস আত্ম-বিস্মৃত চিত্তে। চোখের সামনে শক্তিনাথের উদ্যোগে কাশী যাবার জিনিস-পত্র সংখ্যা এবং আকারে অনাবশ্যকভাবে বেড়েই চলেছিল; কিন্তু সেদিন সে বিষয়ে সামান্য মাত্র আপত্তি করবার সামর্থ্য পর্যন্ত যেন

সৌদামিনীর ছিল না,—'যা করে করুক' 'যা হয় হোক' এই রকম একটা নিস্পৃহ নিরাসক্তি মনকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল।

সন্ধ্যার পর শক্তিনাথ একটা ঘোড়ার গাড়ি বোঝাই ক'রে মালপত্র স্টেশনে পাঠিয়ে দিলে। তারপর ঘণ্টাখানেক পরে সৌদামিনীকে গিয়ে বললে, "মা, এবার আমাদের রওনা হবার সময় হয়েছে—আর দেরি করলে অসুবিধে হবে।"

দাস-দাসী-আত্মীয়-আশ্রিতের অশ্রু-বিলাপের মধ্যে বিদায়ের পালা শেষ ক'রে সৌদামিনী মোটরে গিয়ে বসলেন। গাড়ি ছাড়তে মুখ বাড়িয়ে একবার দ্রুতপলায়মান গৃহের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। মনে হ'ল, হয়ত এই শেষ। বহু সুখ-দুঃখের স্মৃতিবিজড়িত স্বামীগৃহের সহিত হয়ত এইখানেই চিরদিনের মতো সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'ল।

পরদিন বেলা দশটার সময়ে বেনারস ক্যাণ্টন্‌মেণ্টে গাড়ি পৌছলে বেণী সরকার দ্রুতপদে সৌদামিনীর কামরার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলে।

যুক্তকরে প্রতিনমস্কার ক'রে সৌদামিনী বললেন, "কি সরকার মশায়, আপনার শরীর ভাল আছে ত?"

"আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি মা।"

"ঝি-চাকর ঠিক হয়েছে?"

"হয়েছে মা।"

শক্তিনাথ বললে, "আর রাঁধবার লোক? পদী-পিসীর সন্ধান পাওয়া গেছে?"

সৌদামিনী বললেন, "তুই আর বেশি জ্বালাস নে শক্তি। চিরকাল স্বপাক খেয়ে এসে কাশীতে পদী-পিসী!"

শক্তিনাথ বললে, "কিন্তু এখানে তোমাকে সাহায্য করবে কে মা?"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সৌদামিনী প্ল্যাট্‌ফর্মে নেমে পড়লেন। দুজন কুলি জিনিসপত্র নামিয়ে নিলে বেণীমাধব বললে, "এই জিনিস ত মা? আর কিছু নেই ত?"

সৌদামিনী বললেন, "তা হ'লে আর দুঃখ ছিল কি? এগারোটা জিনিস ব্রেক্‌ভ্যানে আছে।"

একটু চিন্তা ক'রে বেণীমাধব বললে, "সে-সব মাল ছাড়িয়ে গাড়িতে

বোঝাই ক'রে নিয়ে যেতে ত সময় লাগবে মা। তার চেয়ে সঙ্গে যা জিনিসপত্র আছে তাইতে যদি এ বেলাটা কোনোরকমে চ'লে যায় তা হ'লে ও-বেলা আমি এসে মাল ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে পারি।"

সৌদামিনী বললেন, "সঙ্গে যা জিনিসপত্র আছে তাতে আমার মণিকর্ণিকার দিন পর্যন্ত চ'লে যাবে। ব্রেক্‌ভ্যানের সমস্ত জিনিস যদি এইখান থেকেই শক্তির সঙ্গে কলকাতায় ফিরে যায় তাতেও আমার কিছু অসুবিধে হবে না। কিন্তু সে কথা যাক, গঙ্গাস্নান সেরে মন্দির দর্শন ক'রে এসে দু মুঠো রেঁধে ফেলতে না পারলে শক্তির ভারি কষ্ট হবে—জিনিস থাক্, আপনি এখন চলুন।"

শক্তিনাথ বললে, "সেই কথাই ভাল, ও-বেলা না-হয় আমিও আপনার সঙ্গে আসব সরকার মশায়। কিন্তু আপনি গিয়ে এখনি পদী-পিসীর সন্ধান করুন। পদী পিসি নইলে মার—"

শক্তিনাথকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সৌদামিনী ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠলেন, "আরে, রেখে দে তোর পদী-পিসীর গল্প!" ব'লে ধাবমান কুলি দুজনের পিছনে দ্রুতপদে অগ্রসর হলেন।

একটা ট্যাক্সি ভাড়া ক'রে সকলে অবিলম্বে রওনা হলেন। দশাশ্বমেধের একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামতে সৌদামিনী বললেন, "এই বাড়ি না-কি সরকার মশায়?"

বেণী ঘোষ বললে, "হ্যাঁ মা, এই বাড়ি।"

"চমৎকার বাড়ি ত! কিন্তু মিছিমিছি এত বড় বাড়ি করেছেন কেন?"

"খুব ছোট বাড়ি ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় না মা। তা ছাড়া দাদা-বাবুরা মাঝে মাঝে প্রায়ই এসে থাকবেন ত, একটু বড় বাড়ি না হ'লে অসুবিধে হবে যে!"

ভিতরে প্রবেশ ক'রে সৌদামিনী বললেন, "খাসা বাড়ি করেছেন সরকার মশায়,—বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।"

শক্তিনাথ বললে, "হাওয়াদারও আছে।"

সম্মতিসূচক প্রসন্নকণ্ঠে সৌদামিনী বললেন, "হাওয়াদারও আছে।"

রান্নাঘরের নিকট উপস্থিত হ'য়ে সৌদামিনী একটু বিস্মিত হ'য়ে বললেন, "ছ্যাক্‌ছোঁক্ ক'রে রান্নার শব্দ হচ্ছে, রাঁধছে কে সরকার মশায়?"

বেণী ঘোষ মাথায় হাত বুলিয়ে গুঁইগাঁই করতে লাগল। স্পষ্ট ক'রে কিছু বলে না।

বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে সৌদামিনী বললেন, "আঃ! সেই পদ্দী-ঠাকুরঝিকে যোগাড় ক'রে এনেছেন! না, আমি আর পারি নে আপনাদের সঙ্গে। সে পেটরোগা মানুষ, নিজেকে সামলাতে পারে না—" তারপর হঠাৎ নিমেষের জন্য একজন স্ত্রীলোককে দেখতে পেয়ে বললেন, "না, এ তো পদ্দী-ঠাকুরঝি নয়। কে এ তবে?"

পর-মুহূর্তেই হাসতে হাসতে বেরিয়ে এসে সেই স্ত্রীলোকটি বললে, "পদ্দী-ঠাকুরঝি নয় মা, এ তোমার অবাধ্য মেয়ে তমিস্রা।" ব'লে সৌদামিনীর পদধূলি নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

বিস্ময়ে ক্ষণকাল সৌদামিনী হতবাক্ হ'য়ে গিয়েছিলেন; বললেন, "এ কি কাণ্ড বউমা? তুমি এখানে?"

তমিস্রা বললে, "আমিও কাশীবাস করব স্থির করেছি মা। তুমি করবে বিশ্বনাথের সেবা, আর আমি করব তোমার সেবা। দেখি, কার বেশি পুণ্য হয়!"

"তোমার বেশি পুণ্য হবে বউমা। বিশ্বনাথের বিচারেও তোমার কাছে আমার হার হবে।" ব'লে সৌদামিনী বধূকে সবলে বক্ষের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন। বেণী ঘোষের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, "জিনিসপত্র আর স্টেশন থেকে এনে কাজ নেই সরকার মশায়। আজ রাত্রেই চলুন সকলে কলকাতা ফিরে যাই।" তারপর বধূকে আলিঙ্গন থেকে মুক্ত ক'রে চিবুক চুম্বন ক'রে বললেন, "আমি তোমাকে চিনতে পারি নি বউমা।"

শক্তিনাথ বললে, "আমিও এতটা পারি নি মা।"

বেণী ঘোষ এগিয়ে এসে সোৎসাহে বললে, "পরশু দিন যখন বউমা এসে এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলেন, আমি কিন্তু তখনি চিনতে পেরেছিলাম।"

হঠাৎ দেখা গেল সকলেরই চক্ষে অশ্রু, শুধু তমিস্রার মুখে হাসি।

শক্তিনাথ বললে, "দশ দিন ছুটি যখন নিয়ে এসেছি, তখন আজই কলকাতা না ফিরে এ অঞ্চলের কয়েকটা তীর্থ দর্শন ক'রে ফেরা যাক।"

এ প্রস্তাবে সকলেই খুশি হ'ল, সকলের চেয়ে বোধ হয় তমিস্রাই বেশি।

উট-রোগ

১

প্রায় হাজার বৎসর আগেকার কথা। তখন প্রতিহার-বংশের পতনের ফলে বিস্তৃত সাম্রাজ্য কয়েকটি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হ'য়ে গেছে। সেই খণ্ডরাজ্যের মধ্যে একটি রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজা সূর্যপাল খুব পরাক্রান্ত হ'য়ে উঠে সাম্রাজ্য গঠন এবং প্রতিহার-বংশের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনবার দিকে মন দিয়েছেন, এমন সময়ে সূর্যপালের শরীরে কঠিন ব্যাধি দেখা দিল।

ব্যাধি যে ঠিক কি, তা কিছুতেই নির্ণয় করা যায় না। দক্ষিণ পায়ের একটা শিরা টন্‌টন্ ঝন্‌ঝন্ করে, বুক ধড়ফড় করে, আর বাম চক্ষুটা থেকে থেকে জবাফুলের মতো লাল হ'য়ে ওঠে। রাজবৈদ্যগণের মধ্যে কেউ বললেন—বাতব্যাধি, কেউ বললেন—হৃদ্‌রোগ, কেউ বা বললেন—মস্তিষ্কের পীড়া। উপসর্গ তেমন কিছু সাংঘাতিক নয়, কিন্তু মহারাজা দিন দিন বলহীন এবং কৃশ হ'য়ে পড়তে লাগলেন। মুখ বিস্বাদ, মেজাজ খিটখিটে, আহারে রুচি নেই, আমোদ-প্রমোদে মন সাড়া দেয় না।

রাজবৈদ্যগণ একটা পরামর্শ-সভা ক'রে স্থির করলেন যে, এ ব্যাধি আয়ুর্বেদশাস্ত্রবিদিত কোন ব্যাধি নয়; এ নিশ্চয় এমন একটা চোরা ব্যাধি যার উৎপত্তি-স্থল শরীরের বিশেষ কোন গুপ্ত প্রদেশে নিহিত। নিদানশাস্ত্র মথিত ক'রে যখন তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না, তখন তাঁরা রোগের উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করতে লাগলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হ'ল না। মূলে কুঠারাঘাত না ক'রে শুধু শাখাচ্ছেদন করলে কি মহীরুহের বিনাশ সাধন করা যায়? রোগ বেড়েই চলল, মহারাজা সূর্যপাল ক্রমশ নির্জীব হ'য়ে পড়তে লাগলেন।

স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তায় মহারাণী চন্দ্রশীলা আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করেছিলেন। মহারাজার আরোগ্য কামনায় তিনি কত শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, কত যাগ-যজ্ঞ, কত গ্রহপূজা করালেন; মাদুলি এবং কবচে, নীলায় এবং পলায় মহারাজার কণ্ঠ ও বাহু ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠল;

তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁক—কিছুই বাদ গেল না; কিন্তু রোগ বিন্দুমাত্র উপশমের দিকে না গিয়ে উত্তরোত্তর বেড়েই চলল। মনে হ'ল, দেবতাও বুঝি সূর্যপালের প্রতি বিরূপ।

রাজবৈদ্যগণের সকল চেষ্টা বিফল হ'লে শেষ পর্যন্ত রাজ্যের অপরাপর খ্যাতনামা চিকিৎসকগণকে আহ্বান করা হ'ল। কিন্তু কেউই রাজাকে বিন্দুমাত্র সুস্থ করতে সমর্থ হলেন না; শুধু অর্থব্যয় এবং কালক্ষেপই সার হ'ল। সকলেই রাজার জীবনের বিষয়ে হতাশ হলেন; রাজা নিজেও বুঝলেন, তাঁর প্রাণপ্রদীপ নির্বাপিত হ'তে আর বেশি বিলম্ব নেই।

দুর্বল শরীরে সূর্যপাল চিকিৎসার তাড়নায় অস্থির হয়েছিলেন। অরিষ্ট, রসায়ন, তৈল, পাঁচন, বটিকা আর চূর্ণের উৎপীড়ন মৃত্যু-যন্ত্রণার চেয়ে কষ্টকর হ'য়ে উঠেছিল। রাজা মনে মনে একটা সঙ্কল্প ক'রে তাঁর প্রধান মন্ত্রী বল্লভাচার্যকে ডেকে পাঠালেন।

বল্লভাচার্য উপস্থিত হ'লে রাজা বললেন, "মন্ত্রীমশায়, আজ থেকে আমি সকল চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দিলাম। বৈদ্যরা একেবারে অকর্মণ্য বাজে লোক, বিদ্যে বুদ্ধি কারও কিছু নেই। সহজ রোগ হ'লে তারা হয়ত সময়ে সময়ে সারাতে পারে, কিন্তু কঠিন রোগের তারা কেউ নয়। শুধু আমার রাজ্যে নয়, আপনি রাজ্যে রাজ্যে ঘোষণা ক'রে দিন, যে-বৈদ্য আমাকে রোগমুক্ত করতে পারবে তাকে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার দেব, কিন্তু চিকিৎসারম্ভের তিন মাসের মধ্যে রোগ সারাতে না পারলে তার প্রাণদণ্ড হবে। এ শর্তে যদি কেউ আসে, তা হ'লে বুঝতে হবে সে যথার্থ শক্তিশালী চিকিৎসক। ঘোষণাপত্রে সবিস্তারে আমার রোগ-লক্ষণ বর্ণনা করবেন, যাতে যারা আসবে প্রস্তুত হ'য়েই যেন আসতে পারে।"

রাজার কথা শুনে বল্লভাচার্য অতিশয় চিন্তিত হ'য়ে বললেন, "মহারাজ, এ কিন্তু বস্তুত চিকিৎসা বন্ধ ক'রে দেওয়াই হ'ল। কারণ অতিবড় ক্ষমতাশালী চিকিৎসকও প্রাণদণ্ডের ভয়ে আপনার চিকিৎসা করতে সাহস করবে না।"

রাজা তখন মরিয়া হয়েছেন; বললেন, "তা না করুক। এ রোগে আমার মৃত্যু অনিবার্য তা ত বুঝতেই পারছি,—দলন-মলন আর অরিষ্ট-রসায়নের হাত থেকে মুক্তি লাভ ক'রে কয়েক দিন একটু শান্তি ভোগ ক'রে মরতে চাই।"

এ সঙ্কল্প থেকে রাজাকে নিরস্ত করবার জন্যে বল্লভাচার্য, মহারাণী চন্দ্রশীলা, অমাত্যবর্গ, এমন কি রাজগুরু পর্যন্ত অনেক অনুরোধ-উপরোধ সাধ্য-সাধনা করলেন; কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। রাজা একেবারে বদ্ধপরিকর।

অগত্যা বল্লভাচার্য চতুর্দিকে ঘোষণাপত্র জারি করলেন। উত্তরে গান্ধার, কাশ্মীর; পশ্চিমে সিন্ধুদেশ; দক্ষিণে মহারাষ্ট্র, মহাকোশল, চালুক্য রাজ্য; পূর্বে অঙ্গ, বঙ্গ, চম্পা রাজ্য—কোনো দেশই বাদ পড়ল না। কিন্তু কোনও ফল হ'ল না। এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা যথেষ্ট লোভনীয় পুরস্কার বটে, কিন্তু জীবনও ত তার চেয়ে কম লোভনীয় বস্তু নয়। বড় বড় চিকিৎসক পরাভূত হয়েছেন শুনে কোনো চিকিৎসকই সূর্যপালের চিকিৎসা করতে অগ্রসর হন না। এইরূপে বিনা চিকিৎসায় প্রায় ছ মাস কাল অতিবাহিত হ'ল। রাজার জীবনীশক্তি আরও ক্ষীণ হ'য়ে এল।

২

সেই সময়ে মহারাজা সূর্যপালের রাজধানী সিংহগড় থেকে পঁচিশ ক্রোশ দূরে চৈতসা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে অতিশয় দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করত। অভাবের নিদারুণ তাড়নায় তাদের জীবন দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণের বিদ্যার দৌড় খুব বেশি ছিল না, কিন্তু কূটবুদ্ধিতে তার সমকক্ষ ব্যক্তি পাওয়া সত্যই কঠিন ছিল। সূর্যপালের চিকিৎসার পুরস্কার ঘোষণার সংবাদ সেই ব্রাহ্মণ-দম্পতিরও শ্রুতিগোচর হ'ল।

ব্রাহ্মণের নাম দেবরাজ উপাধ্যায়। কয়েক দিন নিরবসর চিন্তার পর হঠাৎ একদিন দেবরাজ তার স্ত্রীকে বললে, "ব্রাহ্মণী, তুমি কিছুদিন ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা কোনো রকমে সংসার চালাও, আমি সিংহগড়ে চললাম মহারাজা সূর্যপালের ঘোষিত এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করতে।"

দেবরাজের কথা শুনে তার স্ত্রী বিস্মিত কণ্ঠে বললে, "ও মা, সে কি কথা গো! কত বড় বড় বৈদ্য কবিরাজ হার মেনে গেল মহারাজের রোগ সারাতে, আর তুমি চিকিৎসাশাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জান না, তুমি চললে মহারাজকে সারিয়ে এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা অর্জন করতে?"

দেবরাজ বললে, "বড় বড় বৈদ্য কবিরাজ যখন হার মেনে গেছে,

তখন বুঝতেই পারছ—এ রোগ শাস্ত্রীয় চিকিৎসায় সারবার নয়। অর্থের এই নিদারুণ অভাব আর সহ্য হয় না ব্রাহ্মণী, ভাগ্য পরীক্ষা করতে চললাম। অর্থ পাই ত হাসতে হাসতে ঘরে ফিরব, নইলে এ ঘৃণিত জীবন শেষ হওয়াই ভাল।"

ব্রাহ্মণী অনেক বোঝালে, অনেক কান্নাকাটি করলে ; বললে, "ওগো, এ ত তুমি আত্মহত্যাই করতে চলেছ!" কিন্তু দেবরাজ কোনো কথাই শুনলে না, একটি কঙ্কালসার মৃতকল্প টাট্টু ঘোড়া সংগ্রহ ক'রে তার পিঠে চ'ড়ে সিংহগড় অভিমুখে যাত্রা করলে।

৩

পথে নানা প্রকার দুঃখ-কষ্ট ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়ে ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতে করতে চতুর্থ দিন দিবা তৃতীয় প্রহরকালে দেবরাজ সিংহগড়ের পশ্চিম-তোরণ অতিক্রম ক'রে রাজধানীর মধ্যে প্রবেশ করলে। সেই মাজা-ভাঙা ঘিয়ে-ভাজা বিচিত্র অশ্ব এবং তদুপরি রুক্ষকেশ ধূলিধূসর বিচিত্রতর অশ্বারোহীর অপূর্ব সমাবেশ দেখে পথচারী নাগরিকগণের কৌতুক এবং কৌতূহলের অন্ত রইল না। দেখতে দেখতে দেবরাজের পিছনে জনতা জ'মে গেল। সকলেই প্রশ্ন করে—কোথা থেকে আসছ, কোথায় যাবে, কার বাড়িতে অতিথি হবে? বিস্ময়াহত জনমণ্ডলীর কৌতূহল নিবারণের কোনো প্রকার চেষ্টা না ক'রে দেবরাজ গম্ভীর বদনে সোজা রাজপ্রাসাদের অভিমুখে অশ্ব-চালনা ক'রে চলল। এর পূর্বে সে দু-তিনবার সিংহগড়ে এসেছে—রাজপ্রাসাদের পথ তার অজানা নয়।

প্রাসাদের সিংহদ্বারে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা দিচ্ছে। প্রবেশোদ্যত দেবরাজের পথরোধ ক'রে আরক্ত নেত্রে কর্কশ কণ্ঠে সে বললে, "কোথা যাও?"

অকুতোভয়ে দেবরাজ বললে, "রাজপুরীতে।"

"কার কাছে?"

"মহারাজার কাছে।"

সরোষে প্রহরী তর্জন ক'রে উঠল, "স্পর্ধা ত তোমার কম নয় দেখছি! একটা কানাকড়ির ভিখিরী, তুমি মহারাজার কাছে যাবে?—পালাও এখান থেকে, নইলে এখনি তোমাকে বন্দী করব।"

অশ্বের উপর উপবিষ্ট দেবরাজের কোটরপ্রবিষ্ট দুই চক্ষু প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, "বন্দী করবে, না, শেষ পর্যন্ত এই কানাকড়ির ভিখিরীকে বন্দনা করবে, তা ঠিক বলা যায় না। আমি মহাচণ্ড শ্মশাননিবাসী হ্রীং-ক্রৈট আখ্যাত তান্ত্রিক দেবরাজ উপাধ্যায়। ভৈরবীচক্র থেকে উঠে সোজা এসেছিলাম মহারাজকে রোগমুক্ত করতে। ঔষধ-প্রয়োগের আজ প্রশস্ত দিন ছিল, কিন্তু তুমি প্রতিবন্ধক হ'য়ে আমার গতিরোধ করলে। তুমি রাজদ্রোহী, রাজমৃত্যুকামী। তোমার বিরুদ্ধে রাজদরবারে অভিযোগ উপস্থিত ক'রে তোমার কর্মচ্যুতির পর তোমার স্থলে উত্তমসিংকে প্রতিষ্ঠিত করাব। আপাতত ফিরে চললাম।" ব'লে দেবরাজ লাগাম টেনে অশ্বের মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'ল।

'কানাকড়ির ভিখিরী'র অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার অকস্মাৎ একটা উৎকট জটিলতায় পরিণত হওয়ায় প্রহরী একেবারে হকচকিয়ে গেল। মহারাজার চিকিৎসার প্রতিবন্ধক হওয়ার গুরু অপরাধের বিরুদ্ধে দেবরাজ কর্তৃক রাজসমীপে অভিযোগ আনা এবং পরিণামে তার কর্মচ্যুতি ও অজানা অচেনা উত্তমসিংয়ের নিয়োগ—সমস্ত ব্যাপারটাকে ষোল আনা সন্দেহ অথবা উপেক্ষা করবার মতো তার মনের জোর রইল না। ওদিকে এক-পা এক-পা ক'রে দেবরাজ ফিরে চলেছে; দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলে তাকে সন্ধান ক'রে বার করা কঠিন হবে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে প্রহরী ছুটে গিয়ে দেবরাজের ঘোড়ার লাগাম ধ'রে টেনে নিয়ে এসে, কি বলবে সহসা ভেবে না পেয়ে, বললে, "শোন। উত্তমসিং কে?"

অবলীলার সহিত দেবরাজ বললে, "মধ্যমসিংয়ের বড় ভাই।"

বিস্মিত হ'য়ে প্রহরী জিজ্ঞাসা করলে, "মধ্যমসিং আবার কে?"

দেবরাজ বললে, "উত্তমসিংয়ের ছোট ভাই।"

সমস্যা কিছুমাত্র মন্দীভূত হ'ল না। এক মুহূর্ত চিন্তার পর প্রহরীর বুঝতে একটুও বাকি রইল না যে, মান-মর্যাদা লজ্জা-সঙ্কোচের অনুরোধে অন্ন-বস্ত্রের পাকা ব্যবস্থাকে সংশয়াপন্ন করার মত নির্বুদ্ধিতা আর নেই। তা ছাড়া, তান্ত্রিকদের প্রতি মনে মনে তার উৎকট ভীতি ছিল; সুতরাং দেবরাজের প্ররোচনায় রাজাদেশে তার কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার আশঙ্কাও যে মনের মধ্যে উদিত হয় নি তা নয়। মস্তক হ'তে শিরস্ত্রাণ উন্মোচিত ক'রে দেবরাজের সম্মুখে রেখে যুক্তকরে সে বললে, "উত্তমসিং-

মধ্যমসিংদের আমি জানি নে। কিন্তু আপনি আমাকে অধমসিং ব'লে জানবেন। আমি আপনাকে বুঝতে পারি নি প্রভু। আমার অপরাধ মার্জনা করুন।"

দেবরাজ ধূর্ত ব্যক্তি ; কোথায় কোন্ জিনিস শেষ এবং কোন্ জিনিস আরম্ভ করা উচিত তা সে বিলক্ষণ বোঝে ; বললে, "তবে আমাকে মহারাজার কাছে পাঠিয়ে হোক।"

প্রহরী বললে, "মহারাজার কাছে আপনাকে পাঠাবার অধিকার আমার নেই। প্রধান মন্ত্রীমশায় এখন রাজপ্রাসাদে মন্ত্রণাগারে আছেন, আমি আপনাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তিনি সব ব্যবস্থা করবেন।"

দেবরাজ বললে, "বেশ, তাই হোক।"

অদূরে একজন টহলদার টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিল। তাকে ডেকে প্রহরী সব কথা বুঝিয়ে ব'লে তার সঙ্গে দেবরাজকে প্রধান মন্ত্রী বল্লভাচার্যের নিকট পাঠিয়ে দিলে।

৪

একজন তান্ত্রিক চিকিৎসক রাজার চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হয়েছে—টহলদারের মুখে অবগত হ'য়ে সকৌতূহলে বল্লভাচার্য তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। অশ্বের উপর উপবিষ্ট দেবরাজের আকৃতি দেখে কিন্তু মনটা খারাপ হ'য়ে গেল।

দেবরাজকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে বল্লভাচার্য বললেন, "আপনি মহারাজার রোগ সারাবেন?"

দেবরাজ অসঙ্কোচে বললে, "হ্যাঁ, সারাব বইকি।"

বল্লভাচার্য বললেন, "কিন্তু না সারাতে পারলে কি তার ফল তা জানেন ত?"

দেবরাজ বললে, "সব জানি মন্ত্রীমশায়, এই দীর্ঘ পথ এত কষ্ট ক'রে নিজের জীবন দিতে আসি নি, পরের জীবন দিতেই এসেছি। আপনি কিছুমাত্র চিন্তিত হবেন না, এখান থেকে আমি অর্থোপার্জন ক'রেই যাব, প্রাণ দিয়ে যাব না।"

বল্লভাচার্য বললেন, "ভগবানের অনুগ্রহে আপনি যেন এখান থেকে অর্থোপার্জন ক'রেই যান।"

দেবরাজ বললে, "কারুর অনুগ্রহের দরকার নেই মন্ত্রীমশায়, সে কার্য আমি নিজের বিদ্যেবুদ্ধির জোরেই ক'রে যাব।"

আরও কিছুক্ষণ দেবরাজের সহিত আলাপ-আলোচনা ক'রে বল্লভাচার্য রাজসমীপে উপস্থিত হলেন।

এতদিন পরে একজন চিকিৎসক চিকিৎসা করবার জন্য উদ্যত হয়েছে শুনে রাজা উৎফুল্ল হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "শর্তের কথা জানে ত?"

বল্লভাচার্য বললেন, "সম্পূর্ণ জানে। মহারাজকে সারাতে পারবে, সে বিষয়ে সে একেবারে নিঃসন্দেহ।"

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি জাতি?"

বল্লভাচার্য বললেন, "ব্রাহ্মণ। তান্ত্রিক।"

বল্লভাচার্যের কথায় উৎফুল্ল হ'য়ে রাজা বললেন, "তান্ত্রিক? তান্ত্রিক পদ্ধতিতেই ওষুধ দেবে না-কি?"

বল্লভাচার্য বললেন, "সেই রকমই ত বলে।"

রাজা বললেন, "সে কথা ভাল। ভেষজ-শক্তির সঙ্গে মন্ত্র-শক্তির যোগ হ'লে উপকার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি।"

বল্লভাচার্য বললেন, "উপকার হ'লে ত আমরা বেঁচে যাই মহারাজ, কিন্তু তার চেহারা দেখলে একটুও শ্রদ্ধা হয় না।"

রাজা বললেন, "তা হোক। তান্ত্রিকদের চেহারা দেখতে ভাল হয় না। ডাকান তাকে এখনি আমার কাছে।"

তথাপি দেবরাজ এলে তার মূর্তি দেখে রাজার উৎসাহ অনেকটা ক'মে গেল; বললেন, "আমাকে তুমি সারাতে পারবে?"

দেবরাজ বললে, "নিশ্চয় পারব।"

রাজা বললেন, "তিন মাসের মধ্যে?"

রাজার প্রতি তর্জনী আস্ফালিত ক'রে দেবরাজ বললে, "তিন মাস বলছেন কি মহারাজ! তিন দিনে আপনাকে সারিয়ে দোব।"

রাজা বললেন, "তুমি পাগল।"

দেবরাজ বললে, "মহারাজ, এ পর্যন্ত যাঁরা আপনার চিকিৎসা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন?"

রাজা বললেন, "না, তাঁদের মধ্যে কেউ পাগল ছিলেন না।"

করজোড়ে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, অপরাধ মার্জনা করবেন,—

সুস্থমস্তিষ্কের লোকেরা যখন কোনো সুবিধেই করতে পারে নি, তখন পাগলকেই একবার পরীক্ষা ক'রে দেখুন না। আর, মাসের মধ্যে পঁচিশ দিন যে ব্যক্তির মহাচণ্ড শ্মশানে কুম্ভক যোগের দ্বারা শিববিন্দুর চতুর্দ্দিকে কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে কাটে, সে পাগল নয় ত কি? আমি আপনার কাছে প্রাণ দিতে আসি নি মহারাজ। মহাচণ্ড শ্মশানে উৎকটভৈরবের যে মন্দিরগুহা নির্মাণ করব, আমি এসেছি আপনার কাছ থেকে তার অর্থ সংগ্রহ করতে। আমি আপনাকে নিঃসন্দেহে ব'লে রাখছি, আজ থেকে চার দিনের দিন এই পাগলের হাতে গুণে গুণে এক লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা আপনাকে দিতে হবে।"

উৎসাহিত হ'য়ে রাজা বললেন, "তা যদি হয় ত এক লক্ষ নয়, দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তোমাকে দোব; কিন্তু তা যদি না হয়, তা হ'লে—"

সূর্য্যপালকে কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে দেবরাজ বললে, "এ বিষয়ে আর 'কিন্তু' নেই মহারাজ, একেবারে নিশ্চয়। আজ সন্ধ্যাবেলা আমি ওষুধ নিয়ে আসব আর সেই সময়ে ঔষধ-সেবনের নিয়ম আপনাকে ব'লে দোব। আপাতত, আপনার রাশি কি আমাকে বলুন।"

সূর্যপাল বললেন, "সিংহ রাশি।"

দেবরাজ বললে, "আর মহারাণীর?"

সূর্যপাল বললেন, "বৃষ রাশি।"

নিজের বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, আপনি দক্ষিণ চক্ষু বন্ধ ক'রে বাম চক্ষু দিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে একটু তাকিয়ে থাকুন।"

সূর্যপাল তাই-ই করলেন। কি করেন, তান্ত্রিক চিকিৎসকের হয়ত কোন মন্ত্র-প্রক্রিয়াই বা হবে!

এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে দেবরাজ বললে, "এবার ঠিক উল্টো—আপনি দক্ষিণ, আমি বাম।"

সূর্যপাল বাম চক্ষু বন্ধ ক'রে দক্ষিণ চক্ষু দিয়ে দৃষ্টিপাত করলেন।

দেবরাজ বললে, "হয়েছে, এবার দুই চোখ খুলুন। কোনো ভয় নেই মহারাজ, তিন দিনেই আপনাকে সুস্থ ক'রে দোব। তবে রোগ-শান্তির পর 'দুষ্টস্য দানং রবিনন্দনস্য' করতে হবে।"

সকৌতূহলে রাজা বললেন, "সে কি?"

দেবরাজ বললে, "সে অতি সামান্য ব্যাপার, যথাকালে জানতে পারবেন। এখন আমি চললাম, সময়ে আসব।"

রাজা বললেন, "ঔষধ-সেবনের নিয়ম পালনের কথা বলছিলে, নিয়ম খুব কঠিন না-কি ?"

দেবরাজ বললে, "আজ্ঞে না মহারাজ, অতি সহজ নিয়ম, শুনলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু কঠিনই হোক আর সহজই হোক, নিয়ম পালন না করলে ওষুধে উপকার হবে কেন বলুন ?"

রাজা বললেন, "সে ত সত্যি কথা। তোমার কোনো চিন্তা নেই, নিয়ম পালন আমার দ্বারা বর্ণে বর্ণে হবে।"

প্রসন্নমুখে দেবরাজ বললে, "তা হ'লেই হ'ল। বিশেষত এই চিকিৎসায় যখন আমারও জীবন-মরণের কথা জড়িত।"

রাজা বললেন, "সত্যিই ত।" তার পর বল্লভাচার্যের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "ব্রাহ্মণকে নিয়ে গিয়ে আহার এবং বাসস্থানের উত্তম ব্যবস্থা ক'রে দিন।"

"যে আজ্ঞে" ব'লে দেবরাজকে নিয়ে বল্লভাচার্য প্রস্থান করলেন।

৫

সন্ধ্যার পর রাজ-অন্তঃপুরে রাজা ও রাণী দেবরাজেরই জন্য অপেক্ষা করছিলেন, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা এসে সংবাদ দিলে—দেবরাজ এসেছে।

রাজা বললেন, "নিয়ে এস এখানে।"

একটু পরেই পরিচারিকার সঙ্গে দেবরাজ প্রবেশ করলে। হাতে তার স্বর্ণ পাত্রে ঈষৎ লালচে রঙের খানিকটা তরল পদার্থ। বলা বাহুল্য, স্বর্ণ পাত্রটি রাজভাণ্ডার হ'তে সংগৃহীত, এবং পাত্রের ঔষধ সাধারণ লালরঙ-মিশ্রিত খাঁটি জল ভিন্ন আর কিছুই নয়।

দেবরাজকে দেখে রাজা ও রাণী আসন পরিত্যাগ ক'রে উঠে দাঁড়ালেন। মহারাণী চন্দ্রশীলা ভক্তিভরে দেবরাজকে প্রণাম করলেন।

দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত ক'রে দেবরাজ বললে, "জয় হোক মহারাণী মহারাজার!" তার পর স্বর্ণ পাত্রটি চন্দ্রশীলার হাতে দিয়ে বললে, "মহারাজ, আপনার ওষুধ এনেছি।"

রাজা বললেন, "ওষুধ খাবার নিয়ম কি বলুন ?"

দেবরাজ বললে, "আজ থেকে ঔষধ-সেবনের তিন রাত্রি আপনি মহারাণীকে আপনার দক্ষিণ পাশে নিয়ে এক পালঙ্কে পূর্ব শিয়রে শয়ন করবেন। এই পাত্রটি সমস্ত রাত পালঙ্কের ঈশান কোণে রাখা থাকবে। প্রত্যুষে উঠে মহারাণী বাসি কাপড়ে আপনার হাতে ওষুধ দেবেন। আপনিও বাসি কাপড়ে পূর্বমুখে ব'সে সমস্ত ওষুধটা চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেলবেন। দিনের মধ্যে একবার মাত্র ওষুধ খাওয়া। আবার কাল সন্ধ্যায় যে ওষুধ দিয়ে যাব, পরশু প্রত্যুষে তা খাবেন।"

রাজা বললেন, "মাত্র এই ? আর কোনো নিয়ম নেই ?"

দেবরাজ বললে, "আর একটি মাত্র নিয়ম আছে। নিদিধ্যাসনে দেখা গেল, আপনার এ ব্যাধির মধ্যে উষ্ট্রিকা দোষ আছে,—ওষুধ খাবার সময় আপনি কদাচ উট মনে করবেন না। উট মনে করলে উপকার ত হবেই না, উল্‌টে অপকার হবে। উট মনে পড়লে সেদিন আর ওষুধ খাবেন না।"

সকৌতূহলে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "উট কি ?"

দেবরাজ বললে, "এই—জন্তু উট। হাতী, ঘোড়া, উট—বলে না ? সেই উট। লম্বা গলা, পিঠে কুঁজ।"

রাজা বললেন, "অত ক'রে বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। আমার নিজের উটশালাতেই ত হাজারো উট আছে।" তার পর এক মুহূর্তে মনে মনে কি চিন্তা ক'রে বললেন, "না না, উট মনে করব কেন ? উট মনে করবার কি কারণ আছে ?"

দেবরাজ বললে, "তা হ'লেই হবে। তা হ'লে তিন দিনে আরাম। তা যদি না হয় তা হ'লে আমি নিজে গিয়ে শূলে চ'ড়ে বসব মহারাজ।"

দেবরাজের কথা শুনে রাজা ও রাণী উভয়েই খুব সন্তুষ্ট হলেন। আরোগ্যলাভ সম্বন্ধে তাঁদের মনের মধ্যে প্রবল আশা দেখা দিলে।

৬

পরদিন প্রত্যুষে ঈশান কোণ থেকে ঔষধের পাত্রটি নিয়ে মহারাণী চন্দ্রশীলা সযত্নে স্বামীর হাতে দিলেন। পূর্ব দিকে মুখ ক'রে সূর্যপাল

প্রস্তুত হ'য়েই ব'সে ছিলেন, ইষ্টদেবতা স্মরণ ক'রে ঔষধ পান করতে গিয়ে পাত্রটা মুখে ঠেকিয়েই ভূমির উপর ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখলেন।

উৎকণ্ঠিত স্বরে চন্দ্রশীলা বললেন, "কি হ'ল? খেলেন না কেন মহারাজ?"

অপ্রতিভ মুখে সূর্যপাল বললেন, "উট মনে প'ড়ে গেল।"

শুনে রাণী শিউরে উঠলেন; বললেন, "আগে থেকেই মনে পড়ছিল, না, খেতে গিয়ে মনে পড়ল?"

রাজা বললেন, "খেতে গিয়ে মনে পড়ল।"

নিঃশব্দে ক্ষণকাল চিন্তা ক'রে রাণী বললেন, "কি আর করবেন বলুন, একদিন পেছিয়ে গেল। কাল আর মনে করবেন না।"

মনে মনে কি ভাবতে ভাবতে রাজা বললেন, "না, তা আর করব না।"

সন্ধ্যাবেলা ওষুধ দিতে এসে সব কথা শুনে দেবরাজ মুখ গম্ভীর করলে। বললে, "মহারাজ, এত ক'রে যে কথাটা নিষেধ ক'রে দিলাম, শেষ পর্যন্ত তাই ক'রে বসলেন?"

অপ্রতিভ হ'য়ে সূর্যপাল বললেন, "কি করি বল? ইচ্ছে ক'রে করেছি কি? হঠাৎ মনে প'ড়ে গেল।"

দেবরাজ বললে, "তার আগেই টপ্ ক'রে খেয়ে ফেললে ত হ'ত!"

অন্যমনস্কভাবে রাজা বললেন, "কাল না-হয় তাই করব।" তারপর মনে মনে ক্ষণকাল কি চিন্তা ক'রে বললেন, "দেখ দেবরাজ, এ নিয়মটা তুমি যদি আমাকে না জানাতে তা হ'লে এমনি-এমনিই পালন হ'য়ে যেত। জানিয়েই অসুবিধেয় ফেলেছ।"

চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে দেবরাজ বললে, "বলেন কি মহারাজ! এর উপর আমার জীবন-মরণ নির্ভর করছে, না জানিয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে থাকতে পারি কি? হঠাৎ যদি আপনি উটের কথা মনে ক'রে ফেলেন, তা হ'লে?"

রাজা মৃদু ভাবে আপত্তি করলেন; বললেন, "না, না, হঠাৎ উটের কথাই বা মনে করতে যাব কেন?"

দেবরাজ বললেন, "এই যে আপনি বললেন, আপনার উটশালায় হাজারো উট আছে।"

রাজা বললেন, "কি গেরো। শুধু কি আমার উটশালাই আছে। হাতীশালা নেই? ঘোড়াশালা নেই?"

দেবরাজ বললে, "কিন্তু মহারাজ, উটশালাও ত আছে।"

রাজা আর তর্ক করলেন না—পরদিন নিয়ম পালন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দেবরাজকে বিদায় দিলেন।

পরদিনও কিন্তু একই ব্যাপার ঘটল, মুখে ঠেকিয়েই ঔষধের পাত্র নামিয়ে রাখতে হ'ল, উট মনে পড়ায় ঔষধ খাওয়া চলল না। তৎপরদিন থেকে ঔষধের পাত্র স্পর্শ করাও চলল না, আগে থেকেই উটের কথা মনে পড়তে থাকে।

৭

মহারাণী চন্দ্রশীলা ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন। ওষুধ খাবার সময় যাতে উটের কথা রাজার মনে না পড়ে, সেজন্য তিনি রাজাকে নানা প্রকারে অন্যমনস্ক করতে চেষ্টা করেন; মিথ্যা ক'রে বলেন, "মহারাজ, আপনার হাতীশালায় আজ লছমনদাসের ভারি অসুখ, এক কুটো ডাল-পালা মুখে দেয় নি, আর স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খালি শুঁড় নাড়ছে।"

লছমনদাস রাজার সর্বাপেক্ষা প্রিয় হস্তী। কিন্তু শাক দিয়ে কখনও মাছ ঢাকা চলে? লছমনদাসের দীর্ঘ-আন্দোলিত শুঁড় রাজার মনে চুনভিনাথের লম্বা গলা রূপে উঁচু হ'য়ে দেখা দেয়,—রাজা ধীরে ধীরে অ-সেবিত ঔষধের পাত্র ভূমিতলে নামিয়ে রাখেন। চুনভিনাথ, রাজার সবচেয়ে আদরের উট—খাস আরব দেশ থেকে বহু যত্নে এবং বহু অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করা।

মহারাণী চন্দ্রশীলার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। মনে মনে বলেন, 'তোমার অপরাধ কি মহারাজ! আমার নিজেরই মন ক্রমশ এক উটশালায় পরিণত হয়েছে।'

এমনি ভাবে মাসাধিক কাল গত হ'ল। সূর্যপালের পেটে এক বিন্দু ঔষধ প্রবেশ করল না, ওদিকে রাজার-হালে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহারে দেবরাজের শরীর দিন দিন কান্তিমান হ'য়ে উঠছে। ঔষধ দিতে এসে দেবরাজ গজগজ করে; বলে, "মহারাজ, মনে করেছিলাম দিন চারেকে

কার্য শেষ ক'রে বাড়ি ফিরব, কিন্তু আপনি এমনি ছেলেমানুষি আরম্ভ করেছেন যে, দেখতে দেখতে এক মাস হ'য়ে গেল। ওদিকে বাড়িতে কত প্রয়োজনীয় কাজ পণ্ড হচ্ছে।"

রাজা কিছু বলেন না, বেকায়দায় প'ড়ে গেছেন, মনের আক্রোশ মনের মধ্যে চেপে চুপ ক'রে থাকেন।

৮

আর দিন পনের পরে কিন্তু সহ্যের সীমা অতিক্রম করলে। বল্লভাচার্যকে আর দেবরাজকে রাজা ডাকিয়ে পাঠালেন।

উভয়ে উপস্থিত হ'লে দেবরাজের প্রতি সক্রোধ নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে রাজা বললেন, "দেবরাজ, তুমি একটি বিষম ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড, জোচ্চোর।"

কাঁচুমাচু মুখে করজোড়ে দেবরাজ বললে, "কেন মহারাজ?"

কঠোর কণ্ঠে রাজা বললেন, "আবার চালাকি করছ? কেন মহারাজ!...কেন, তা জান না?"

দেবরাজ কোনো কথা বললে না, করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

রাজা বললেন, "আমার আগেকার রোগ সেরে গেছে, তার বিন্দু-বিসর্গও আর নেই। কিন্তু তার জায়গায় নতুন যে-রোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্যে পাগল হ'য়ে যাবার মতো হয়েছি। আগেকার রোগ এর চেয়ে ভাল ছিল। তার শেষ ছিল মৃত্যুতে, কিন্তু এ রোগে বেঁচে থেকে দিবারাত্র মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করছি।"

রাজার কাতরোক্তি শুনে দেবরাজের হাসি পেয়েছিল। অতি কষ্টে হাসি চেপে গম্ভীর মুখে সে বললে, "কি রোগ মহারাজ?"

রাজা সজোরে চিৎকার ক'রে উঠলেন, "হারামজাদা, আবার ন্যাকামি করছ! উট-রোগ তা তুমি জান না?"

শুনে মন্ত্রী বল্লভাচার্য চমকে উঠলেন; বললেন, "বলেন কি মহারাজ! উট-রোগ?"

রাজা বললেন, "হ্যাঁ, উট-রোগ। ওই নচ্ছারটা একটা আস্ত উট আমার মনের মধ্যে ঢুকিয়েছে। ঘুমিয়ে পর্যন্ত নিস্তার নেই, স্বপ্ন দেখি উটের। ঘুম ভাঙলে মনে হয়, উট। উট ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি।

জেগে যতক্ষণ থাকি ততক্ষণ মনের মধ্যে উট খট্‌খট্‌ ক'রে বেড়িয়ে বেড়ায়।" তারপর দেবরাজের দিকে আরক্ত নেত্রে দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "বার কর্‌ এ উট আমার মনের ভেতর থেকে, নইলে তোকে শূলে চড়িয়ে, আগুনে পুড়িয়ে মারব।"

মনের অপরিসীম উল্লাস অতি কষ্টে মনের মধ্যে দমন ক'রে দেবরাজ বললে, "মহারাজ, প্রথম দিনেই ত বলেছিলাম যে, নিদিধ্যাসনে দেখা গিয়েছিল আপনার রোগে উষ্ট্রিকা দোষ—"

দেবরাজকে কথা শেষ করতে না দিয়ে রাজা চিৎকার ক'রে উঠলেন, "চোপ রও পাষণ্ড! ফের যদি উষ্ট্রিকা দোষের কথা উচ্চারণ করেছ, এক্ষুনি দু খণ্ড করব তোমাকে।" ব'লে কোষ থেকে অসি নিষ্কাসিত করলেন।

দেবরাজ দেখলে, আর বেশি বাড়াবাড়ি ক'রে কাজ নেই। করজোড়ে বললে, "দোহাই মহারাজ! দয়া ক'রে ও-কার্যটি করবেন না। প্রাণটা দেহে বর্তমান থাকলে উটের যা-হয় একটা ব্যবস্থা করতে পারব, কিন্তু না থাকলে উটকে কোনো মতেই বার করতে পারব না। এর অতি সহজ প্রতিকার আছে, অভয় দেন ত নিবেদন করি।"

রাজা হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কি ?"

দেবরাজ বললে, "আপনার পায়ের শির ত আর টন্‌টন্‌ করে না ?"

রাজা বললেন, "না।"

"বুক ধড়ফড় করে না ?"

"না।"

"চোখ লাল হয় না ?"

"না।"

দেবরাজ বললে, "মহারাজ, তা হ'লে ত আপনার আসল রোগ একেবারে সেরে গিয়েছে। আপনার প্রতিশ্রুত দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমাকে বিদায় করুন, তা হ'লে আপনার মন থেকে বেরিয়ে এসে উটও আমার পিছনে পিছনে খট্‌খট্‌ করতে করতে চ'লে যাবে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে রাজা বললেন, "আমারও তাই মনে হয়। মন্ত্রীমশায়, এই শয়তানটাকে দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে লাথি মেরে বিদায় করুন।"

মন্ত্রী বললেন, "মহারাজ, এর এক ফোঁটা ওষুধ আপনার পেটে গেল না, আর দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা একে দিতে বলছেন ?"

রাজা বললেন, "এই সর্বনেশে লোককে আর একদিনও আমাদের রাজ্যে রাখবেন না। ওর হাত থেকে পরিত্রাণ না পেলে শেষ পর্যন্ত ও আপনার মনে হাতী ঢুকিয়ে ছাড়বে। তখন চার লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে ওকে বিদায় করতে হবে।"

এই অত্যন্ত আশঙ্কাজনক কথা শোনবার পর মন্ত্রী আর দ্বিরুক্তি করলেন না, দু লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে দেবরাজকে বিদায় দিলেন।

সেই বিপুল বহুমূল্য অর্থ ষোলখানা মজবুত বোরায় পুরে আটটা ঘোড়ার পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে দশ জন সশস্ত্র অশ্বারোহী রক্ষীর দ্বারা পরিবৃত হ'য়ে প্রফুল্লমুখে দেবরাজ নিজের সেই মাজা-ভাঙা ঘোড়ার উপর সমাসীন হ'য়ে চৈতসা অভিমুখে যাত্রা করলে। বলা বাহুল্য, রাজবাড়ির পুষ্টিকর দানা-পানির গুণে দেবরাজের সেই ঘিয়ে-ভাজা ঘোড়াও অনেকটা বলিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিল।

৯

রাত্রে মহারাণী চন্দ্রশীলা পূর্বের মতো রাজার বাম পার্শ্বে শয়ন করলেন। প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর সূর্যপালকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মহারাজ, কাল রাত্রে আপনার সুনিদ্রা হয়েছিল ত ?"

প্রসন্নমুখে রাজা বললেন, "হ্যাঁ, সমস্ত রাত।"

"স্বপ্ন দেখেছিলেন ?"

"দেখেছিলাম।"

সভয়ে মহারাণী জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের স্বপ্ন ?"

সহাস্যমুখে রাজা বললেন, "উটের স্বপ্ন একেবারেই নয়; শুধু তোমার স্বপ্ন।"

সূর্যপালের কথা শুনে লজ্জায় এবং আনন্দে মহারাণীর মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। মনে মনে ভাবলেন, উটটা তা হ'লে সত্য সত্যই দেবরাজের সঙ্গে প্রস্থান করেছে।

বর্ষা-দিনের কাব্য

১

বেলা তিনটা। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে দাঁড়িয়ে রঘুনাথ ট্রামের জন্য অপেক্ষা করছে। সাড়ে চারটার সময় ভবানীপুরে এক বন্ধুর গৃহে চা-পানের নিমন্ত্রণ। পথে অন্য একটা কাজ সেরে যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হ'তে হবে।

ভাদ্র মাস। বর্ষাটা এ বৎসর পিছন দিকেই প্রবল হ'য়ে নেবেছে। বাড়ি থেকে বের হবার পূর্বেই পূর্বদিকের আকাশে জল-ভরা ঘন মেঘ দেখা দিয়েছিল। অবিলম্বে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখে রঘুনাথের মাতা জোর ক'রে রঘুনাথের হাতে একটি ছাতা দিয়েছিলেন। কারণ, আধুনিক কালের আধুনিকতম তরুণদের মতো রঘুনাথেরও সুতীব্র ছাতা-বিদ্বেষ ছিল; রৌদ্র এবং বৃষ্টির অসুবিধা অপেক্ষা ছাতা বহন ক'রে বেড়ানোর দুঃখকে সে অনেক বেশি পীড়াদায়ক ব'লে মনে করে। তা ছাড়া, তুচ্ছ সুখ-সুবিধার জন্য একটা জটিল এবং অপুরুষোচিত যন্ত্রের দ্বারা নিজের দেহকে বিড়ম্বিত ক'রে বেড়ালে দুঃখসুখ-নিরপেক্ষ সুদৃপ্ত তারুণ্যের মহিমাকে ক্ষুণ্ণ করা হয় ব'লে তার ধারণা। ছাতা নিতে সে যথেষ্ট আপত্তি করেছিল, কিন্তু জননীর অনুরোধ শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারে নি। তাই কি ছোট-খাট ছাতা? ছাব্বিশ ইঞ্চি ত বটেই, হয়ত আটাশ ইঞ্চিই বা হবে! মেঘ এবং ছাতাকে মনে মনে অভিসম্পাত দিতে দিতে রঘুনাথ ওয়েলিংটনের মোড়ে এসে উপস্থিত হ'ল।

ক্ষণকাল পরে অদূরে একটা ট্রাম দেখা দিলে,—শ্যামবাজার থেকে আসছে। কিন্তু ট্রাম স্টপে থামবার কিছু পূর্বেই চড়চড় ক'রে বৃষ্টি এসে পড়ল। অগত্যা রঘুনাথকে ছাতা খুলতে হ'ল। উঃ! কি ঢাউস ছাতা! চার জন লোককে আশ্রয় দিতে পারে এত বড়!

ট্রাম যখন রঘুনাথের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। পথে রঘুনাথ ভিন্ন দ্বিতীয় আরোহী ছিল না। ছাতা বন্ধ ক'রে ট্রামে উঠতে গেলে জামা-কাপড় একেবারে ভিজে যাবে, তাই

সে স্থির করলে ফুটবোর্ডে উঠে দাঁড়িয়ে তারপর ছাতা বন্ধ করবে। ট্রামের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে কিন্তু সে শেষ পর্যন্ত ট্রামে উঠতে পারলে না,—ঠিক তার সামনে আঠারো-উনিশ বছরের একটি তরুণী মেয়ে বাঁ হাতে চার-পাঁচখানা বই আর খাতা নিয়ে ট্রাম থেকে টপ ক'রে নেবে পড়ল ; তারপর পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হবার অসুবিধার জন্যই হোক, অথবা আত্মরক্ষার অবুঝ প্রবৃত্তি বশতই হোক, একেবারে সোজা রঘুনাথের ছাতার মধ্যে ঢুকে পড়ল।

এই অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক পরিণতির জন্য রঘুনাথ একেবারেই প্রস্তুত ছিল না ; কি করা উচিত হঠাৎ স্থির করতে না পেরে মেয়েটির ডান হাতে ছাতাটা ধরিয়ে দিয়ে সে তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে নির্বিকল্পতার সঙ্গে ভিজতে লাগল।

ছাতা হাতে নিয়ে চকিত হ'য়ে উঠে মেয়েটি বললে, "এ কি !"

পাশ থেকে মুখ নীচু ক'রে মেয়েটির প্রতি তাকিয়ে দেখে রঘুনাথ বললে, "ছাতা নিশ্চয়ই।"

"না, তা বলছি নে—"

"যা বলছেন ফুটপাথে উঠে বলুন, মোটর আসছে।"

হর্ন দিতে দিতে সবেগে একটা বৃহৎ ট্যাক্‌সি একেবারে নিকটে এসে পড়েছিল, ঘটনা-বিহ্বলতা বশত উভয়েই সময়মতো তেমন খেয়াল করে নি। তা ছাড়া, মেয়েটির মনোযোগের বোধ হয় ষোল আনাই বৃষ্টি, রঘুনাথ এবং রঘুনাথের সুবৃহৎ ছাতার মধ্যেই নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল। সজোরে মেয়েটির বাম বাহু চেপে ধ'রে হিড়হিড় ক'রে রঘুনাথ তাকে ফুটপাথে টেনে আনলে, এবং পর-মুহূর্তেই জল ছিটোতে ছিটোতে সেই বৃহৎ মোটরখানা হুস ক'রে বেরিয়ে গেল।

রঘুনাথ বললে, "মাফ করবেন, অমন ক'রে আপনাকে টেনে আনা ভিন্ন উপায় ছিল না।"

এ কথার উত্তরে মেয়েটির মুখ দিয়ে ভদ্রতার কোনো বাণী নির্গত হ'ল না। মাফ করবার মতো কোনো অপরাধ হয় নি, সে কথাও বললে না ; ধন্যবাদ ত জানালই না ;—কাঁদো-কাঁদো স্বরে বিরক্তিবিরূপ মুখে বললে, "মাগো, কি বিপদেই পড়লুম !"

আপত্তিব্যঞ্জক ভঙ্গিতে রঘুনাথ বললে, "পড়লুম বলছেন কেন ? বলা

উচিত, পড়েছিলাম। বিপদ ত কেটে গেছে। সত্যিই মোটরটা একটা মস্ত বড় বিপদের মতো প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়েছিল।" তারপর এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে উৎকণ্ঠিত হ'য়ে বললে, "কিন্তু, আমাকেই বিপদ মনে করছেন না ত আপনি ?"

মনে করছে না—সে কথা ইঙ্গিতেও ব্যক্ত না ক'রে মেয়েটি ব্যগ্রভাবে রাস্তার দুই দিক নিরীক্ষণ করতে লাগল।

রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "অমন ক'রে কি দেখছেন ?"

"খালি রিক্‌শ।"

"বৃষ্টির সময়ে খালি রিক্‌শ সহজে পাবেন না।"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মেয়েটি বললে, "ট্রাম ত চ'লে গেল, আপনি গেলেন না কেন ?"

রঘুনাথ বললে, "আপনি নাবার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ডাক্টার ঘণ্টা বাজিয়ে ট্রাম ছেড়ে দিলে। যে-রকম অবলীলার সঙ্গে আপনি আমার ছাতার মধ্যে ঢুকে পড়লেন তাতে সে হয়ত মনে করেছিল, আমি আপনার জন্যেই ছাতা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম।"

মেয়েটি কোনো মতেই অস্বীকার করতে পারলে না যে, যে-ভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল তাতে ও-রকম মনে করা কণ্ডাক্টারের পক্ষে অসমীচীন নয়। কিন্তু অপর এক দিক দিয়ে আপত্তি করতে সে ছাড়লে না; বললে, "গাড়ির দরজার সামনে অত বড় ছাতা খুলে দাঁড়িয়ে থাকলে না ঢুকে কি করি! তার ওপর টপ ক'রে আপনি ছাতাটা আমার হাতে দিয়ে দিলেন।" ঈষৎ বিরক্তিব্যঞ্জক উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, "আচ্ছা, কেন দিয়ে দিলেন বলুন ত ?"

চিন্তিত মুখে রঘুনাথ বললে, "বোধ হয়, আপনি নিয়ে নেবেন মনে ক'রে।"

রঘুনাথের উত্তর শুনে মেয়েটি চুপ ক'রে গেল, এ কৈফিয়তের কোনো প্রতিবাদ সহসা সে খুঁজে পেলে না; কারণ, নিয়ে যে সে নিয়েছে তার প্রমাণ তার আপন হাতেই অবস্থান করছে। মনে মনে বললে, ভাববার-চিন্তোবার সময় না দিয়ে অমন ক'রে হাতে ধরিয়ে দিলে না নিয়ে কি যে করা যায়, তা ত জানি নে!

মেয়েটির কৃতজ্ঞতাবর্জ্জিত অকোমল ভাব উপলব্ধি ক'রে মনে মনে

পুলকিতই হ'য়ে রঘুনাথ বললে, "জীবনে কোনদিন ছাতা ব্যবহার করি নি, আজ প্রথম ব্যবহার ক'রেই ভারি বিপদে প'ড়ে গেছি। ছাতা না থাকলে, আমি পথ থেকে ভিজতে ভিজতে ট্রামে উঠতাম, আপনিও পথে নেমে ভিজতে ভিজতে বাড়ি যেতেন—সে দেখছি এক রকম ভালই হ'ত।—এই হতভাগা ছাতার দ্বারা আমার সঙ্গে আপনাকে জড়িত ক'রে একটা বিশ্রী গোলযোগের সৃষ্টি করেছি। এ যেন ঠিক জাতও গেল, পেটও ভরল না।"

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মেয়েটি বললে, "তার মানে?"

"তার মানে, নিজেও ভিজলাম, আপনাকেও বিরক্ত করলাম।"—ব'লে রঘুনাথ হেসে উঠল।

এ ব্যাখ্যার ভাষায় কতকটা শান্ত হ'য়ে মেয়েটি আর কিছু বললে না, শুধু ক্ষণিকের জন্য অপাঙ্গে রঘুনাথের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত ক'রে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

শ্যামবাজারের দিক থেকে আর একটা ট্রাম দেখা দিয়েছিল। মেয়েটি বললে, "ট্রাম আসছে, এই নিন আপনার ছাতা।"—ব'লে ছাতাটা রঘুনাথের দিকে এগিয়ে ধরলে।

মেয়েটির দিকে ছাতাটা ঠেলে দিয়ে রঘুনাথ বললে, "দেখুন, মিছিমিছি ছেলেমানুষি করবেন না। আমি ছাতা নিলে কার উপকার হবে বলুন ত? আমি ত ভিজে গিয়েইছি, উপরন্তু আপনিও ভিজে যাবেন, বইখাতাগুলোও নষ্ট হবে। এই ভিজে কাপড়ে আমার এখন ভবানীপুরে গিয়েও কোনো লাভ হবে না। তার চেয়ে চলুন, আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আমি ফিরে যাই। যে রকম চেপে বৃষ্টি এল তাতে এখনি রাস্তায় এমন জল জ'মে যাবে যে, অবশেষে জুতো হাতে ক'রে পথ চলতে হবে।"

মেয়েটি বললে, "একটা রিক্‌শ আসছে, দেখি খালি কি না।"

রঘুনাথ বললে, "রিক্‌শয় ত পর্দা ফেলা রয়েছে।"

"বৃষ্টির সময়ে খালি রিক্‌শতেও পর্দা ফেলে রাখে।"

কথাটা সত্য, সুতরাং রিক্‌শটা কাছে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল। কিন্তু কাছে এলে দেখা গেল, সেটা খালি নয়, লোক আছে।

রঘুনাথ বললে, "দেখলেন ত, লোক রয়েছে। এমন দশ-বারোখানা

রিক্‌শ ত দেখলেন, কোনোটাই খালি নয়। আপনি ভয় পাবেন না, অসঙ্কোচে আমার সঙ্গে চলুন। আমি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পারব, রিক্‌শওয়ালার চেয়ে আমি মন্দ লোক নই।"

রঘুনাথের এ কথায় মেয়েটি ব্যস্ত হ'য়ে উঠে বললে, "না, না, আপনি এসব কথা কেন বলছেন? এখান থেকে আমার বাড়ি পাঁচ-সাত মিনিটের পথ। আপনি আর কত কষ্ট করবেন!"

আসল কথা, একজন অপরিচিত যুবকের সঙ্গে তার ছাতা মাথায় দিয়ে গৃহে উপস্থিত হওয়া মেয়েটির একেবারেই মনঃপূত হচ্ছিল না।

রঘুনাথ বললে, "কষ্ট আর আনন্দের হিসেব নিজের নিজের বাড়ি পৌঁছে করলেই হবে। আপাতত কোন্ দিকে আপনার বাড়ি বলুন ত?"

পশ্চিম দিকে হস্ত প্রসারিত ক'রে মেয়েটি বললে, "নতুন রাস্তা দিয়ে খানিকটা গিয়ে ডান-হাতি একটা গলির মধ্যে।"

"আসুন, ঠিক আমার পিছনে পিছনে আসুন।"—ব'লে রঘুনাথ ফুটপাথ থেকে রাস্তায় নেমে পড়ল। মেয়েটিও ছাতা মাথায় দিয়ে রঘুনাথকে অনুসরণ ক'রে চলল।

২

একটি অপরিচিতা সুন্দরী তরুণীকে নিজের ছাতা দিয়ে, নিজে ভিজতে ভিজতে অগ্রগামী হ'য়ে পথ চলা—বর্ষা-দিনের এই অনাস্বাদিত-পূর্ব কাব্য-সংঘটন—রঘুনাথের মনে এক বিচিত্র আনন্দের সঞ্চার করছিল।

অপর দিকের ফুটপাথে উঠে দ্রুতগতিশীল ট্রাম, বাস ও মোটরের আশঙ্কা থেকে নিশ্চিন্ত হ'য়ে সে বললে, "পথের ও-দিক পর্যন্ত এই ছাতাটার ওপর একটা বিশ্রী রকম বিরক্তিতে মন বিষিয়ে ছিল। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে, ছাতাটা এনে ভালই হয়েছে, উপকারে লাগল।"

রঘুনাথের পিছনে অবস্থান ক'রে মেয়েটির একটু সাহস হয়েছিল; বললে, "উপকারে ত লাগল আমার।"

"সেই জন্যেই ত বলছি, এনে ভাল হয়েছে।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে মেয়েটি বললে, "এই রকম ভিজতে ভিজতে আপনি বরাবর যাবেন?"

প্রশস্ত ফুটপাথ, বৃষ্টির জন্য জনবিরল। একটু পেছিয়ে এসে মেয়েটির পাশাপাশি হ'য়ে রঘুনাথ বললে, "উপায় কি বলুন? আমাদের দুজনের ত এক ছাতার মধ্যে স্থান হ'তে পারে না। জানেন ত, আপনাদের পক্ষে আমরা অস্পৃশ্য প্রাণী।"—ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

মেয়েটি সত্য-সত্যই অপ্রতিভ হ'ল। এ কথার পর ছাতার মধ্যে রঘুনাথকে আহ্বান না করলে তার উক্তিকে সপ্রমাণ করাই হয়।

মেয়েটির বিমূঢ় অবস্থা বুঝতে পেরে রঘুনাথ তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলে। বুক-পকেট থেকে একটা রেশমের মনিব্যাগ বার ক'রে বললে, "আপনি বরং আপাতত এই ভিজে মনিব্যাগটা আপনার হাতে রাখুন—ছাতা যখন নেব, তখন এটাও নেব। মনিব্যাগটা ভিজে হয়ত তত ক্ষতি হয় নি, কিন্তু ভেতরের কাগজের টাকাগুলো বেশি ভিজে গেলে সত্যিই কিছু ক্ষতি হবে।"—ব'লে ব্যাগটা মেয়েটির দিকে প্রসারিত ক'রে ধরলে।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্যাগটা নিতে হ'ল, যেহেতু এই যৎসামান্য উপকারটুকু করার বিরুদ্ধে আপত্তি করবার মতো তেমন গুরুতর কোনো যুক্তি হঠাৎ দেখানো গেল না।

চলতে চলতে রঘুনাথ বললে, "আপনি কি পড়েন, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?"

মেয়েটি বললে, "আই. এস-সি.।"

"কোন্ ইয়ার?"

'সেকেণ্ড ইয়ার।"

"কোন্ কলেজ?"

মেয়েটি কলেজের নাম বললে।

কলেজের নাম শোনার পর মেয়েটির নাম জানতে রঘুনাথের আগ্রহ হ'ল; বললে, "কিছু যদি মনে না করেন, আপনার নামটি জিজ্ঞাসা করি।"

রঘুনাথের এই অসঙ্গত কৌতূহলের জন্যে মেয়েটি মনে মনে বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। না-হয় তুমি জোর ক'রে খানিকটা উপকারই করছ,

তাই ব'লে এমন ক'রে সেটা ষোল আনা পুষিয়ে নেওয়া নিতান্তই সুরুচি-বিরুদ্ধ। তবুও প্রশ্নটা তত বেশি অবৈধ নয় ব'লে বললে, "আমার নাম বসুদা।"

"বসুদা? বসুদা কি?"

বিরক্ত হ'য়ে মেয়েটি বললে, "বসুদা মুখোপাধ্যায়।"

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে অবস্থান ক'রে কতকটা যেন নিজমনেই রঘুনাথ বলতে লাগল, "বসুদা! বসুদা মুখোপাধ্যায়! ভারি মিষ্টি নাম! যেমন চেহারা মিষ্টি তেমনি নাম মিষ্টি, যেমন নাম মিষ্টি তেমনি চেহারা মিষ্টি।"

ওদিকে পাশে চলতে চলতে রঘুনাথের ধৃষ্টতা দেখে ক্রোধে ও অপমানে বসুদা আরক্ত হ'য়ে উঠেছিল। কি ব'লে রঘুনাথকে তিরস্কৃত করবে, তা ঠিক করতে পারছিল না ব'লেই বোধকরি সে চুপ ক'রে ছিল।

চলতে চলতে হঠাৎ এক সময়ে দাঁড়িয়ে প'ড়ে বসুদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্নিগ্ধকণ্ঠে রঘুনাথ ডাকলে, "বসুদা!"

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে বসুদা বললে, "কি বলছেন?"

তেমনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "তোমার যদি আপত্তি না থাকে বসুদা, তা হ'লে আমি ষোল আনা রাজি আছি।"

"কিসে রাজি আছেন?"

"তোমাকে বিয়ে করতে।"

বসুদার দুই চক্ষু ক্রোধে কঠোর হ'য়ে উঠল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, "এই রকম ক'রে অপমান করবার জন্যেই তা হ'লে আপনি আমাকে সদর-রাস্তা থেকে নির্জন রাস্তায় টেনে এনেছেন?"

সে কথার কোনো উত্তর না দিয়ে প্রসন্নমুখে রঘুনাথ বললে, "কি সুন্দর তুমি বসুদা! স্নিগ্ধ মূর্তিতেও তুমি যেমন সুন্দর, দীপ্ত মূর্তিতেও তুমি তেমনি সুন্দর! বিধাতার তুমি অপরূপ সৃষ্টি!"

ঘৃণাতিক্ত কণ্ঠে বসুদা বললে, "ছি! ছি! আপনার লজ্জা করে না? রিক্‌শওয়ালাদের সঙ্গে আপনি তুলনা করছিলেন, কিন্তু রিক্‌শওয়ালারা আপনার চেয়ে ঢের ভদ্র; কোনও রিক্‌শওয়ালাই আপনার মতো কদর্য কথা কয় না।"

বসুদার তীব্র তিরস্কার শুনে রঘুনাথ মৃদু মৃদু হাসতে লাগল; বললে, "তুমি ভুল করছ বসুদা! রিক্‌শওয়ালারা ত আর রঘুনাথ নয়, কিসের

তাগিদে তারা এমন অদ্ভুত কথা বলবে বল? তোমাকে বসুদা মুখোপাধ্যায় ব'লে জানতে পারলে তারা কি আমার মতো এই রকম বিস্ময়ে আনন্দে পাগল হ'য়ে ওঠে? কখনই ওঠে না। বসুদা মুখোপাধ্যায় না হ'য়ে তুমি যদি কোন এক উর্মিলা চাটুজ্জে অথবা প্রমীলা গাঙলী হ'তে, তা হ'লে দেখতে আমি রিক্‌শওয়ালাদের চেয়ে কত বেশি ভদ্র হতাম।"

রঘুনাথের কথা শুনে প্রচণ্ড কৌতূহলে বসুদা রঘুনাথের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে রইল।

বসুদার বিস্ময়াহত মুখের নির্বাক প্রশ্ন নির্ভুলভাবে পাঠ ক'রে রঘুনাথ সহাস্যমুখে বললে, "হ্যাঁ, সত্যিই তাই। আমি রঘুনাথ বাঁড়ুজ্জে। না দেখে না শুনে তোমাকে অবহেলা করার অপরাধে অপরাধী। কিন্তু আগে ত জানতাম না যে, তুমি এমন—"

কিন্তু কার সাধ্য সে সব কথা শেষ পর্যন্ত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শোনে! দেখা গেল, কখন বসুদা ছাতা মাথায় ক'রে পিছন ফিরে পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র এক পার্কের রেলিং ধ'রে দাঁড়িয়েছে।

"বসুদা! বসু!"

বসুদা নিস্তব্ধ।

৩

এই বসুদার পিতামাতা রঘুনাথের হস্তে বসুদাকে সমর্পণ করবার জন্য সুদীর্ঘ কাল ধ'রে সাধনা করছেন। রঘুনাথের বিধবা মাতারও এ বিবাহে সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে; কিন্তু রঘুনাথের ধনুর্ভঙ্গ পণ, বিলাত থেকে লেখাপড়া শেষ না ক'রে এসে বিবাহ করবে না। তাই এ পর্যন্ত বসুদাকে দেখবার সকল প্রকার অনুরোধ উপরোধ সে অতিক্রম ক'রে এসেছে। যে সম্পদ নিজের ভাণ্ডারে সংগ্রহ করবার কোনো সঙ্কল্প নেই, তাকে যাচাই করবার জন্য তার বিপণিতে উপস্থিত হওয়া একেবারে অর্থহীন। আজ কিন্তু প্রকৃতির এবং দৈবশক্তির ষড়যন্ত্রে বৃষ্টিধারার মধ্যে তাদের দেখা—একছত্রের তলে তাদের সংযোগ।

রঘুনাথ ধনকুবের স্বর্গীয় হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র পুত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে দীপ্তিমান ছাত্র; গণিতশাস্ত্রে রেকর্ড মার্ক অধিকার

ক'রে এম. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখে মুখে তার নাম; বিবাহ প্রস্তাবের পর থেকে বসুদা মনে-প্রাণে সেই নাম জপ করে।

ঠিক জপ করার কথা জানা না থাকলেও বসুদাও যে আগ্রহের সঙ্গে তাকে কামনা করে, সে কথা রঘুনাথ বসুদার আত্মীয়বর্গের আগ্রহের প্রবলতা থেকে সহজেই অনুমান করত। সুতরাং পরিচয় পাওয়ার পূর্বে অজানা অচেনা তরুণীকে অবলম্বন ক'রে যে নিষ্কাম এবং নিঃস্বত্ব কাব্যটুকু জন্মগ্রহণ করেছিল, পরিচয় পাওয়ার পর আর তা সেরূপ রইল না। তখন সেই নৈর্ব্যক্তিক কাব্য-পরিস্থিতির কেন্দ্রে বসুদা তার সমস্ত সত্তা নিয়ে দেখা দিলে। সুনিশ্চিত বিবাহের দ্বারা যে অপরাধকে সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত করা চলবে, সে অপরাধ অপরাধই নয়। সুতরাং এই দৈবাগত অচিন্তিতপূর্ব সৌভাগ্যকে একটু নিবিড়তার সঙ্গে উপভোগ করবার পক্ষে কোনো নৈতিক বাধা আছে ব'লে রঘুনাথ মনে করল না।

বৃষ্টি অল্প একটু ক'মে এসেছিল। পিছন দিক থেকে রঘুনাথ বললে, "আগে কে জানত বসুদা, এমন অদ্ভুত মেয়ে তুমি! আর এমন অদ্ভুত ভাবে দেখা দিয়ে, শুধু আমার ছাতার মধ্যেই নয়, একেবারে সোজা আমার প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করবে!"

এ কথারও কোনো উত্তর না দিয়ে বসুদা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল।

আকস্মিক বিস্ময় এবং সঙ্কোচজনিত বসুদার এই দুরপনেয় জড়তা দূরীভূত করবার জন্য রঘুনাথের মনে এক দুষ্ট বুদ্ধির উদয় হ'ল। কণ্ঠের স্বর যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে নিয়ে সে বললে, "এমনভাবে তোমার দাঁড়িয়ে থাকা ভাল হচ্ছে না কিন্তু বসুদা। পথে হয়ত তেমন লোক নেই, কিন্তু জানলায় জানলায় উৎসুক চোখেরও অভাব নেই। তারা নিশ্চয় মনে করছে, আমি তোমার কাছে এমন-একটা প্রস্তাব করেছি, যার জন্যে তুমি আমার সঙ্গে মুখোমুখী হ'তে ভয় পাচ্ছ।"

কি সর্বনাশ! চকিত হ'য়ে উঠে বসুদা সম্মুখে বাড়িগুলোর উপর একবার ত্বরিত দৃষ্টি বুলিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হ'ল।

পিছনে চলতে চলতে রঘুনাথ ডাকলে, "বসুদা!"

বসুদা দাঁড়ালে না; শুধু গতি ঈষৎ মন্দ ক'রে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলে।

রঘুনাথ বললে, "ও-রকম ক'রে তুমি আমার সামনে সামনে ছুটে চললে লোকে আমাকে দুর্বৃত্ত ব'লে সন্দেহ করবে,—তুমি যে আমার পরমাত্মীয়, সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। দাঁড়াও।"

বসুদা গতি রোধ ক'রে দাঁড়াল।

মুহূর্তের মধ্যে বসুদার পাশে উপস্থিত হ'য়ে রঘুনাথ বললে, "আস্তে চল বসুদা। তোমাদের বাড়ির দেড় হাত পথ ত শেষ হ'য়ে এল, তার ওপর ছুটোছুটি ক'রে আজকের এই বর্ষা-দিনের অপূর্ব কাব্যটুকুর অতি-অল্প আয়ু আরও অল্প ক'রে দিয়ো না। লক্ষ্মীটি, আস্তে আস্তে চল।"

বসুদা ধীরে ধীরে রঘুনাথের পাশে পাশে চলতে লাগল।

রঘুনাথ বললে, "বাড়ি গিয়ে তোমার মাকে আজ ব'লো বসুদা—রঘুনাথ বলেছে, বসুদাকে গৃহলক্ষ্মী না ক'রে কোনো সরস্বতীরই কৃপালাভের লোভে সে গৃহত্যাগ করবে না।"

"বসু!"

অপাঙ্গে বসুদা রঘুনাথের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলে; সে দৃষ্টির মধ্যে এখন আর পূর্বের কটুতা নেই, এখন সেখানে লজ্জা এবং হর্ষের অপরূপ জড়াজড়ি।

সহাস্যমুখে রঘুনাথ বললে, "এবার ত বসু, তোমার ছাতার মধ্যে আমাকে আশ্রয় দিতে পার?"

ইতস্তত তাকিয়ে দেখে আহ্বানসূচক অল্প একটু মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে আরক্ত মুখে বসুদা বললে, "আসুন।"

রঘুনাথ হাসতে লাগল; ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললে, "না, না, তার আর কাজ নেই। তোমার মন ভিজেছে এই যথেষ্ট, তোমার কাপড় ভেজাতে আর চাই নে।"

তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বলতে লাগল, "দুঃখ নেই বসুদা। ভবিষ্যতে এই ছাতার তলায় বহুবার আমরা মিলিত হব। আকাশ জুড়ে মেঘ ঘনিয়ে এসে যখন বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ করবে, তখন মাঝে মাঝে আমরা দুজনে এই ছাতার নীচে পাশাপাশি হ'য়ে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে পড়ব। এই ছাতা আমাদের মিলিত করেছে বসুদা,—আমাদের মিলনের প্রতীক এই ছাতাকে আমরা চিরদিন যত্নে আদরে রাখব।"

পর-মুহূর্তেই সহসা দাঁড়িয়ে প'ড়ে রঘুনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বসুদা বললে, "এইটে আমাদের গলি।"

কিন্তু গলির প্রবেশ-পথে রাস্তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জুড়ে এমন একটু জল জমেছিল যে, বসুদার পক্ষে সেটা ডিঙিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। জলের মধ্যে কোথাও একটু জাগা জমি অথবা ইট-পাথর আছে কি-না যার উপর জুতো রেখে পেরিয়ে যাওয়া যায়—সে বোধ হয় তাই লক্ষ্য করছিল, এমন সময় কানের কাছে মুখ এনে রঘুনাথ বললে, "কিছু যদি মনে না কর ত একটা কথা বলি।"

সামনের দিকেই মুখ সোজা ক'রে রেখে মৃদুস্বরে বসুদা বললে, "কি ?"

"দু হাতে তোমাকে তুলে ধ'রে টপ ক'রে পার ক'রে দি ?"

প্রস্তাব শুনে আরক্ত মুখে রঘুনাথের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে বসুদা খলবলিয়ে জলের মধ্যে নেমে পড়ল। যা ভীষণ লোক, কিছুই অসম্ভব নয়! ম্যাথেম্যাটিক্সে রেকর্ড নম্বর পেলে কি হয়, কাজে-কর্মে কথায়-বার্তায় দারুণ বেহিসেবি!

এক লম্ফে জল পেরিয়ে বসুদার পাশে উপনীত হ'য়ে রঘুনাথ বললে, "লজ্জার জন্যে আমাদের অনেক ভাল জিনিস থেকে বঞ্চিত হ'তে হয় বসুদা। আমি যদি আজ আমি না হ'য়ে তুমি হতাম, তা হ'লে কখনই এই অত্যন্ত আদরের প্রস্তাবে অসম্মত হতাম না।"

এ কথাও যথেষ্ট বেহিসাবি কথা, সুতরাং বসুদা এ কথারও কোনো উত্তর দিলে না।

গলির মধ্যে খানিকটা অগ্রসর হ'য়ে বাঁ দিকে বসুদাদের বাড়ি। সদর-দরজার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে দুই ধাপ সিঁড়ির উপর উঠে বসুদা রঘুনাথের দিকে ফিরে দাঁড়াল; তারপর ছাতাটা রঘুনাথের হাতে দিয়ে সলজ্জ মুখে বললে, "আমাকে আপনি ক্ষমা করবেন।"

বিস্মিত কণ্ঠে রঘুনাথ বললে "ক্ষমা করব ? কেন ? অন্য কোনো লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে স্থির হ'য়ে গেছে না-কি ?"

মাথা নাড়া দিয়ে বসুদা বললে, "সে কথা বলছি নে। আপনাকে আজ যে-সব অন্যায় কথা বলেছি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।"

বসুদার কথা শুনে রঘুনাথের মুখে হাসি ফুটে উঠল; বললে, "এখন কি তা হ'লে রিক্‌শওয়ালাদের চেয়ে আমাকে কিছু ভদ্র ব'লে মনে হচ্ছে?"

"আমাকে ক্ষমা করুন।"—বসুদার কণ্ঠস্বরে সুগভীর অনুতাপের করুণতা।

রঘুনাথ বললে, "না, না, বসুদা, তোমাকে ক্ষমা করবার কোনো কথাই উঠতে পারে না। যে-সব কথাকে তুমি অন্যায় কথা বলছ, সেই সব কথাই আমার জীবনে চিরদিনের মতো অমূল্য সম্পদ হ'য়ে রইল। সেই সব কথা শুনেই তোমাকে অমন অদ্ভুত মেয়ে মনে হয়েছিল। এখন অনুতাপ হচ্ছে, কেন অত শীঘ্র নিজের পরিচয় দিলাম! কেন আরও কিছুক্ষণ তোমার কাছ থেকে লাঞ্ছনা ভোগ করলাম না! তোমার কঠিন বাক্য কত যে মিষ্টি তার কোনো ধারণা নেই তোমার। তুমি এমনই অদ্ভুত গোলাপ যে, তোমার কাঁটার আঘাতেও আনন্দ আছে।"

তরুণ প্রেমের এই অপরূপ প্রাণ-ঢালা সোহাগ-ভাষণ বসুদার প্রণয়চকিত হৃদয়কে এক অপূর্ব সঙ্গীতে উদ্বেল ক'রে তুললে। সে সঙ্গীতের যথার্থ ভাষা, 'তোমার চরণে আমার পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি, সব সমর্পিয়া প্রাণ-মন দিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।' কিন্তু মুখ ফুটে কে সে কথা ভাষায় প্রকাশ ক'রে বলে!

বসুদা বললে, "আমার একটা কথা আছে।"

"কি বল?"

"এখানে আপনার পরিচয় দেবেন না।"

বিস্মিত কণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "পরিচয় দোব না? কোনো দিন না?"

"না, আজ দেবেন না; এখন দেবেন না।"

সহাস্যমুখে রঘুনাথ বললে, "এখন ত এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি, সুতরাং আজকের ভয় তোমার নেই। কিন্তু কাল সকালে মাকে নিয়ে তোমার দরবারে হাজির হব। তুমি ত এখনও স্পষ্ট ক'রে তোমার সম্মতি জানাও নি বসুদা। কি বল? কাল আসব তো?"

আরক্ত মুখে মৃদুস্বরে বসুদা বললে, "আসবেন।" তারপর পিছন ফিরে দরজায় দু-চার বার ধাক্কা দিলে।

ভিতরে নিকটেই একজন চাকর কাজ করছিল, তাড়াতাড়ি এসে দোর খুললে।

"আচ্ছা, এবার তা হ'লে চললাম।"—ব'লে রঘুনাথ দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

এক মুহূর্ত নিঃশব্দে রঘুনাথের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সকৃতজ্ঞ মনের সমস্ত মাধুরী দিয়ে মনে মনে রঘুনাথকে বন্দিত ক'রে পুলকিতচিত্তে বসুদা গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে দোর লাগিয়ে দিলে।

৫

গৃহে প্রবেশ ক'রেই বাঁ দিকে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। সেই সিঁড়ি দিয়ে বসুদার জননী সত্যবতী নেমে আসছিলেন। বসুদাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "হ্যাঁ রে, দোর লাগিয়ে দিলি, সে ছেলেটি কোথায়?"

ঈষৎ বিমূঢ়ভাবে বসুদা বললে, "কে?"

সত্যবতী বললেন, "ওপর থেকে জানলা দিয়ে দেখলাম, একটি ছেলে নিজের ছাতা তোকে দিয়ে ভিজতে ভিজতে তোর পাশে পাশে আসছিল, তার কথা বলছি।"

বসুদা বললে, "ও! তিনি বাড়ি চ'লে গেলেন।"

"কে সে? কোথায় তার দেখা পেলি?"

যুগ্ম প্রশ্ন। প্রথমটির উত্তর দেওয়া নিরাপদ নয়; বসুদা একেবারে দ্বিতীয়টির উত্তর দিয়ে বললে, "ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে, ট্রাম থেকে নেমে।"

সত্যবতী বললেন, "আহা, অনেক দূর থেকে এসেছিল ত! ভিজে কাপড়ে ফিরে না গিয়ে কাপড়-চোপড় বদলে একটু চা-টা খেয়ে গেলে ভাল হ'ত। চিনিস না কি তাকে?"

কঠিন প্রশ্ন! 'চিনি না' বললে মিথ্যা ভাষণ হয়; 'চিনি' বললে পরবর্তী প্রশ্ন কঠিনতর মূর্তিতে দেখা দেয়। কি উত্তর দেবে বসুদা বিহ্বল হ'য়ে তাই ভাবছে, এমন সময় দৈব অনুকূল হ'ল। সদর-দরজায় অকস্মাৎ করাঘাত শোনা গেল। সত্যবতী বললেন, "সুধীর বোধ হয় কলেজ থেকে এল, দোর খুলে দে বসু।"

সুধীর বসুদার দাদা। সত্যবতীর কথা শুনে বসুদা উল্লসিত হ'ল, সুধীর যদি হয় ত তার হাতে জননীকে সমর্পণ ক'রে একেবারে এক ছুটে

নিজের ঘরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া। তারপর, পরদিন সকাল পর্যন্ত কোনো রকমে গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে সময় কাটিয়ে দেওয়া। অবশেষে জননীকে সঙ্গে নিয়ে রঘুনাথ যখন উপস্থিত হবে, তখন অপরিমেয় বিস্ময় এবং আনন্দের মধ্যে সকল সমস্যার সমাধান।

দোর খুলে দিয়ে কিন্তু বসুদা সচকিতে দুই পা পিছিয়ে এল। সুধীর ত নয়ই ; সত্যবতীর কঠিন প্রশ্ন অপেক্ষাও কঠিনতর বস্তু,—অর্থাৎ, স্বয়ং রঘুনাথ দরজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তথাপি অন্তরের গোপন আনন্দ সমস্ত লজ্জা এবং বিমূঢ়তাকে পাশে ঠেলে নিঃশব্দে অধরপ্রান্তে এসে দেখা দিলে।

বসুদার পশ্চাতে সত্যবতীকে দেখতে পেয়ে রঘুনাথ সাবধান হ'য়ে গেল। বসুদার দিকে হাত বাড়িয়ে সহাস্যমুখে বললে, "আমার মনি-ব্যাগটা ?"

কি সর্বনাশ! রঘুনাথকে বিদায় দেবার সময় বসুদা অন্যমনস্ক হ'য়ে মনিব্যাগের কথা একেবারেই ভুল গিয়েছিল। আরক্তমুখে হাত বাড়িয়ে মনিব্যাগটা রঘুনাথকে প্রত্যর্পণ করলে।

সত্যবতী নিকটে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন ; কন্যার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সবিস্ময়ে বললেন, "ওঁর মনিব্যাগ তোর কাছে কেমন ক'রে এল ?"

বসুদা কিছু বলবার পূর্বে এ প্রশ্নের উত্তর দিলে রঘুনাথ ; বললে, "কাপড়ের ব্যাগ, ভিতরে কাগজের টাকা ; ভিজে নষ্ট হওয়ার ভয়ে ওঁর কাছে ছাতার তলায় রাখতে দিয়েছিলাম।" ব'লে হাসতে লাগল।

বসুদার দিকে চেয়ে সত্যবতী বললেন, "কি মেয়ে রে তুই! ছাতা ত নিয়েইছিলি, তার ওপর মনিব্যাগটা নিয়ে ফিরিয়ে না দিয়ে ভিজে কাপড়েই ছেড়ে দিচ্ছিলি!"

বসুদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করলে, "মা নিশ্চয়ই ?"

বসুদা বললে, "হ্যাঁ।"

দরজা পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ ক'রে রঘুনাথ সত্যবতীর পদধূলি গ্রহণ করলে।

রঘুনাথের আকৃতি এবং আচরণ দেখে সত্যবতী মনে মনে প্রসন্ন হয়েছিলেন ; তার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, "চিরজীবী হও।" তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, "এস বাবা, এস। ভিজে কাপড় বদলে, চা খেয়ে তারপর যাবে।"

প্রসন্ন মুখে রঘুনাথ বললে, "না মা, আজ যাই ; কাল সকালে আবার আসব। তবে কাল একা আসব না, মাকে সঙ্গে নিয়ে আসব।" ব'লে বসুদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে একটু হাসলে।

বিস্মিত হ'য়ে সত্যবতী বললেন, "সে ত খুবই সুখের কথা। কিন্তু মাকে নিয়ে আসবে কেন বল ত বাবা ?"

রঘুনাথ বললে, "সে কথা এখন বললে বসুদার সঙ্গে চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধ হবে। পরে আপনি বসুদার কাছে সব শুনবেন।"

বসুদাকে দেখতে গিয়ে সত্যবতী দেখলেন, অদূরে বসুদা চ'লে যাচ্ছে। একবার মনে করলেন, ডেকে কথাটা জিজ্ঞাসা করেন ; কিন্তু সম্ভবত বসুদাও এখন বলতে স্বীকৃত হবে না ভেবে রঘুনাথকে বললেন, "তুমি বসুদাকে আগে থেকে জান ?"

রঘুনাথ বললে, "জানি।"

"কত দিন থেকে ?"

একটু চিন্তা ক'রে রঘুনাথ বললে, "প্রায় আট-ন মাস থেকে।"

"আজ বসুদা তোমার কাছে গিয়েছিল ?"

ব্যগ্রকণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "না, না, বসুদা আমার কাছে কোনদিনই যায় নি। আজ কলেজ থেকে ফেরবার সময়ে বসুদা যখন ওয়েলিংটনের মোড়ে ট্রাম থেকে নামছিল, তখন সেই ট্রামে ওঠবার জন্যে আমি সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ভয়ানক জোরে বৃষ্টি এল ব'লে বসুদাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে যাচ্ছি।"—ব'লে রঘুনাথ পুনরায় বিদায় প্রার্থনা করলে।

এরূপ একটা দুর্ভেদ্য সমস্যার মধ্যে রঘুনাথকে সহসা ছেড়ে দিতে সত্যবতীর মন চাইলে না। তা ছাড়া, আর্দ্র বসন পরিবর্তন ক'রে চা খেয়ে যাবার জন্য অনুরোধ ত পূর্বেই করেছিলেন ; বললেন, "না, না, সে কিছুতেই হবে না। এমন ভিজে কাপড়ে তোমাকে কিছুতেই যেতে দেব না।"

রঘুনাথ আরও খানিকটা আপত্তি করলে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রাজি হ'তেই হ'ল।

ভজুয়া চাকরকে ডেকে সত্যবতী নীচেকার বাথরুমে ধোয়া ধুতি, জামা ও গেঞ্জি দিয়ে রঘুনাথকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য আদেশ করলেন। তারপর, রঘুনাথ বাথরুমে প্রবেশ করলে কন্যার সন্ধানে

দ্বিতলে উপস্থিত হ'য়ে অবগত হলেন, বসুদাও দ্বিতলের বাথরুমে প্রবেশ করেছে।

কন্যা যে উপস্থিত তাঁরই হাত থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বাথরুমে আশ্রয় নিয়েছে—এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না। নীচে এসে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় চায়ের টেবিলের সম্মুখে আসন গ্রহণ ক'রে সত্যবতী দুশ্ছেদ্য চিন্তাজালের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

৬

মিনিট পনের-কুড়ি পরে স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তন ক'রে রঘুনাথ বাথরুম থেকে নির্গত হ'ল; তারপর ভজুয়া কর্তৃক নীত হ'য়ে দক্ষিণ দিকের বারান্দায় এসে আসন গ্রহণ করলে।

ভজুয়া প্রস্থান করলে সত্যবতী রঘুনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার নাম কি বাবা?"

বসুদার নিকট প্রতিশ্রুতি স্মরণ ক'রে রঘুনাথ বললে, "আমার নাম? আমার নাম রামচন্দ্র। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।"

"তুমি কি কর? পড়?"

"হ্যাঁ, পড়ি।"

"কি পড়?"

রঘুনাথ বলিল, "ল পড়ি।"

নির্বন্ধসহকারে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে সত্যবতী বললেন, "লক্ষ্মী বাবা! তোমার মাকে কাল সকালে কেন নিয়ে আসবে, সে কথা আমাকে খুলে বল। আমার ভারি ইচ্ছে হচ্ছে জানতে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে রঘুনাথ বললে, "আপনার কথা আমি অমান্য করতে পারলাম না,—কিন্তু আমি যে এ কথা আপনাকে বলেছি, সে কথা বসুদাকে অন্তত আজকের দিনে বলবেন না।"

সত্যবতী বললেন, "আচ্ছা বলব না। তুমি বল।"

রঘুনাথ বললে, "মাকে নিয়ে আসব বসুদার সঙ্গে আমার বিয়ের দিন স্থির ক'রে যেতে।"

প্রচণ্ড বিস্ময়ে সত্যবতী বললেন, "বিয়ে স্থির করতে?—না, বিয়ের দিন স্থির করতে?"

রঘুনাথ বললে, "দিন স্থির করতে। অবশ্য আপনাদের যদি মত থাকে তা হ'লে।"

"তোমাদের মত আছে?—তোমার মত আছে?"

"আছে।"

"বসুদার?"

সত্যবতীর প্রশ্ন শুনে রঘুনাথ হেসে ফেললে; বললে, "মা, আপনি দেখছি বসুদার কাছে আমাকে অপ্রতিভ না ক'রে ছাড়বেন না। আছে।"

সত্যবতী জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে তোমাকে সে তার মত জানিয়েছে?"

রঘুনাথ বললে, "আজ। একটু আগে।"

একটা কাঠের ট্রে ক'রে ভজুয়া চা ও খাবার নিয়ে উপস্থিত হ'ল।

সত্যবতী বললেন, "দিদিমণি কোথায়?"

ভজুয়া বললে, "দিদিমণি ত ওই ঘরে রয়েছেন।" ব'লে নিকটতম ঘরটা দেখিয়ে দিলে।

সবিস্ময়ে সত্যবতী বললেন, "ওই ঘরে রয়েছে? খুব মেয়ে যা হোক!" তারপর, 'বসুদা! বসুদা!' ব'লে নিজেই উচ্চকণ্ঠে ডাকতে লাগলেন।

বসুদা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

সত্যবতী বললেন, "কি মেয়ে রে তুই! এখানে ব'স্,—রামচন্দ্রকে চা-টা খাওয়া।"

রঘুনাথের সহিত বসুদার চকিত দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। রঘুনাথের মুখে ফুটে উঠল কৌতুকের মৃদু হাসি, বসুদার মুখে সবিস্ময় পুলক।

নিকটে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে মৃদুকণ্ঠে বসুদা বললে, "আমি চা ক'রে দোব?"

স্মিতমুখে বসুদার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রঘুনাথ বললে, "বেশ ত, দাও।"

চিনি মেশাবার সময় ভজুয়াকে ডাকবার জন্য সত্যবতী অল্প একটু দূরে উঠে গিয়েছিলেন; রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে বসুদা জিজ্ঞাসা করলে, "ক চামচে চিনি দোব?"

সহাস্যমুখে রঘুনাথ মৃদুকণ্ঠে বললে, "এক চামচে না দিলেও মিষ্টি লাগবে।"

রঘুনাথের কথা শুনে বসুদার মুখ আরক্ত হ'য়ে উঠল। চায়ের সঙ্গে দুই চামচে চিনি মিশিয়ে রঘুনাথের দিকে চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিলে।

ফিরে এসে চেয়ারের উপর উপবেশন ক'রে সত্যবতী অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন। বললেন, "তোমরা ক ভাই-বোন রামচন্দ্র ?"

রঘুনাথ বললে, "আমার ভাই নেই, বোন তিনটি।"

পরিচয় গ্রহণের প্রসঙ্গ আরো কিছুক্ষণ চলার পর সদর-দরজায় করাঘাতের শব্দ শোনা গেল।

নিকটেই ভজুয়া ছিল ; বললে, "দাদাবাবু কলেজ থেকে এলেন।" ব'লে দোর খুলে দিতে গেল। কিন্তু ক্ষণকাল পরে দাদাবাবুর পরিবর্তে দেখা দিলেন বসুদার পিতা দীননাথ। রঘুনাথ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল।

নিকটে উপস্থিত হ'য়ে রঘুনাথের প্রতি সাগ্রহ এবং সবিস্ময় দৃষ্টিপাত ক'রে দীননাথ বললেন, "এ কি ! রঘুনাথ না ?"

সত্যবতী ঘাড় নেড়ে বললেন, "না, রঘুনাথ নয় ; রামচন্দ্র।"

দীননাথ ঘাড় নেড়ে বললেন, "নিশ্চয়ই রঘুনাথ। রামচন্দ্র নয়।" রঘুনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "তুমি রঘুনাথ নও ?"

বিনীত কণ্ঠে রঘুনাথ বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি রঘুনাথ।"

সবিস্ময়ে সত্যবতী বললেন, "কোন্ রঘুনাথ ?"

দীননাথ বললেন, "যে রঘুনাথকে পাবার জন্যে তুমি দিবারাত্র দেবতার কাছে প্রার্থনা করছ, সেই রঘুনাথ।"

রঘুনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রবল আগ্রহে সত্যবতী জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ বাবা, সত্যি ?"

রঘুনাথ বললে, "সত্যি।"

"তবে যে বললে তোমার নাম রামচন্দ্র ?"

এ সমস্যার সমাধান করলেন দীননাথ ; সহাস্য মুখে বললেন, "রঘুনাথের অনেক নাম আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে রামচন্দ্র।"

বিস্ময়ে আনন্দে আপ্লুত হ'য়ে সত্যবতী ডাকলেন, "বসুদা !"

বসুদা কিন্তু পূর্বেই কথাবার্তার কোন্ ফাঁকে সেখান থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

সীমার সমস্যা

সমরেশ চৌধুরী আলিপুর দেওয়ানী আদালতের একজন উন্নতিশীল উকিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সে ছিল প্রতিভাবান ছাত্র। পাঠ্যাবস্থায় সে কলেজ ইউনিয়ানে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিতর্ক তুলিত; সভা-সমিতিতে নির্যাতিত সর্বহারা প্রোলেটারিয়েট দলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বক্তৃতা দিত; এবং কাগজ-পত্রে অর্থসঙ্কট, বেকার-সমস্যা, সমাজ-নীতি প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিত।

ওকালতি ব্যবসায় গ্রহণ করিবার পর হইতে সময় এবং সুবিধার অল্পতা বশত ঐ সকল বিষয়ে তাহার কর্মশীলতা ক্রমশ কমিয়া আসিলেও ওকালতি ব্যবসায়ের মধ্যেই তাহার আদর্শকে অনুসরণ করিবার একটা নূতন উপায় সে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল। বণিক এবং শ্রমিক, জমিদার এবং প্রজা, প্রভু এবং ভৃত্য প্রভৃতির মামলায় নিযুক্ত হইবার সুযোগ আসিলে সে শ্রমিক, প্রজা এবং ভৃত্যদের পক্ষই অবলম্বন করিত; কদাচ অপর পক্ষে ব্রীফ্ গ্রহণ করিত না। বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী যে সংগ্রাম প্রকাশ্যে অথবা অলক্ষিতে দেশে দেশে যুগ-যুগান্তর হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে যৎসামান্য অংশ গ্রহণ করিয়াও সে খুশি হইত।

ইহাতে ব্যবসায়ে মোটের উপর তাহার লাভ হইয়াছিল অধিক অথবা ক্ষতি, তাহা বলা কঠিন। কারণ, ধনী-সম্প্রদায়ের মামলা হইতে কিয়ৎ পরিমাণে বঞ্চিত হইলেও, নির্যাতিতের বন্ধু—এই খ্যাতির সাহায্যে অপর দিক হইতে তাহার পসার বাড়িয়া চলিয়াছে। তাহার ডিস্ট্রিক ম্যাজিস্ট্রেট শ্বশুর মিস্টার সেন নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তির জোরে এক সময়ে তাহাকে একটা বড় জমিদার-ঘরের বাঁধা উকিল করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল; কিন্তু প্রজার বিরুদ্ধে কোনো মকদ্দমায় সে হাজির হইবে না, এই শর্ত উপস্থাপিত করিবার ফলে সে ব্যবস্থা ফাঁসিয়া যায়। জমিদার ব্রজেন্দ্রনারায়ণ বলিয়াছিল, "ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন স্যার, এ যেন পুরুত হব অথচ ঠাকুর পূজো করব না,—এই ধরণের একটা শর্ত হ'ল না কি?"

বলা বাহুল্য, মিস্টার সেন এ কথা অস্বীকার করিবার পথ খুঁজিয়া পায় নাই।

পত্নী বনলতা সমরেশের এই নীতি একেবারেই পছন্দ করিত না। মাঝে মাঝে ইহা লইয়া সে তর্ক করিত, এবং সময়ে সময়ে তাহার কূট তর্কের তাড়নায় সমরেশ এমন কোণঠাসা হইত যেমন আদালতে বিপক্ষের কোনো সাক্ষীকে করিতে পারিলে সে নিশ্চয় খুশি হয়। সমরেশ আদালতে যাইবার পর আজ দ্বিপ্রহরে তাহার পিত্রালয় হইতে গাড়ি আসিয়াছিল তাহাকে লইয়া যাইবার জন্ত। সমস্ত দিন বাপের বাড়িতে কাটাইয়া বনলতা যখন ফিরিয়া আসিল, তাহার কিছু পূর্বেই সমরেশ আদালত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। সাধারণত এত আগে সে ফেরে না, কিন্তু বড়দিন উপলক্ষে কাল হইতে দশ দিন ছুটি বলিয়া আজ বিশেষ কোনো কাজকর্ম না থাকায় সকাল-সকাল ফিরিয়াছে।

আদালত বন্ধ, সুতরাং অফিস-ঘরে গিয়া মকদ্দমার নথি লইয়া বসিবার তাড়া নাই। সন্ধ্যার পর ড্রয়িংরুমে নিম্ন স্বরে রেডিয়ো চলিতেছিল, তাহারই নিকটে দুইটা কুশও চেয়ার অধিকার করিয়া সমরেশ এবং বনলতা বসিয়া। সকালে আদালতের তাড়াতাড়িতে সেদিনকার ইংরাজী দৈনিকে প্রকাশিত একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ পড়া হইয়া উঠে নাই, সমরেশ সেইটা মনোযোগের সহিত পড়িতেছিল, এবং বনলতা অলস অন্যমনস্কতায় মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তার জাল বুনিতেছিল, এমন সময়ে শেষ হইবার পূর্বেই সহসা রেডিয়ো স্তব্ধ হইয়া গেল।

কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া সমরেশ বলিল, "বন্ধ করে দিলে যে?"

বনলতা বলিল, "ও আর কেমন ভাল লাগছে না।"

কাগজখানা টেবিলের উপর রাখিয়া সমরেশ বলিল, "তা হ'লে তোমার বাপের বাড়ির গল্পই কর, শোনা যাক। হঠাৎ ডাক পড়ল যে? বিশেষ কোনো দরকার ছিল না-কি?"

বনলতা বলিল, "বলছি সে-সব কথা, তার আগে তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

"কি কথা?"

এক মুহূর্ত অপেক্ষা করিয়া বক্তব্যটা বোধকরি মনে মনে একটু

গুছাইয়া লইয়া বনলতা বলিল, "আচ্ছা, তোমরা যে বল ধনী হওয়া একটা অপরাধ—"

এ বিষয়ে তর্কে লিপ্ত হইবার মতো মনস্কতা সমরেশের একেবারেই ছিল না, তাই আলোচনাটা সংক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যে বনলতার কথা শেষ হইবার পূর্বেই সে বলিল, "সব ক্ষেত্রেই অবশ্য নয়। যে-সব ক্ষেত্রে অর্থের লালসা দরিদ্রকে পীড়ন করে, শোষণ করে, বঞ্চিত করে, সে-সব ক্ষেত্রে ধনী হওয়া নিশ্চয়ই অপরাধ।"

বনলতা বলিল, "আচ্ছা, আমাদের ক্ষেত্রে তা হ'লে তুমি কি বলবে? আমাদের অর্থসঙ্গতির যা পরিমাণ তাকে তুমি অপরাধের এলাকার ভেতরে ফেলবে,—না, বাইরে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সমরেশ বলিল, "দরিদ্রকে বঞ্চিত ক'রে, দরিদ্রকে শোষণ ক'রে যদি আমাদের অর্থসঙ্গতি গ'ড়ে উঠছে এমন হয়, তা হ'লে বলব—ভেতরে; তা নইলে—বাইরে।"

"আমি যদি বলি দরিদ্রকে শোষণ ক'রে গ'ড়ে উঠছে, তা হ'লে?"

"তা হ'লে বলব—ভেতরে। কিন্তু কোন্ দরিদ্রকে শোষণ ক'রে গ'ড়ে উঠছে তা বল।"

"অনেককে। আপাতত আক্‌লু জমাদারের কথাটাই বলি। সে নোটিশ দিয়েছে, আসছে মাস থেকে অত কম মাইনেতে কাজ করতে পারবে না।"

"কত মাইনে পায় সে?"

"মাসে এক টাকা।"

"আর, চায় কত?"

"মাসে পাঁচ টাকা।"

অল্প একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সমরেশ বলিল, "এক টাকা থেকে একেবারে পাঁচ টাকা? বলে কি আক্‌লু! না না, অত নয়, মাঝামাঝি একটা যা-হয় ক'রে দিয়ো।"

"মাঝামাঝি কত? আড়াই টাকা—না, তিন টাকা?"

"আড়াই টাকায় রাজি না হ'লে অগত্যা তিন টাকা।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বনলতা বলিল, "আমার ত মনে হয় টাকা পঁচিশ ক'রে দেওয়া উচিত।"

"সালিয়ানা বলছ ?"

খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বনলতা বলিল, "না গো না, মাসিক পঁচিশ টাকা বলছি।"

কৌতুকস্মিত মুখে সমরেশ বলিল, "ও ! ঠাট্টা হচ্ছে আমাকে !"

সহসা মুখ গম্ভীর করিয়া বনলতা বলিল, "না না, ঠাট্টা করছি নে। আচ্ছা, পঁচিশ টাকা মাইনে ও কেন পাবে না তা বল ? বাড়ির সবচেয়ে উপকারী আর কঠিন কাজ করে ঐ আকৃলু জমাদার। পাইখানা ধোয়, নর্দমা পরিষ্কার করে, আঁস্তাকুড় ঝাঁট দেয়, তারপর ময়লা-আবর্জনা বাইরে ফেলে দিয়ে ধুয়ে মুছে বাড়ি তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে ক'রে চ'লে যায়। বামুনের অসুখ করলে আমি রাঁধতে পারি ; ঝি-চাকর না এলে বাসন মাজতে পারি, কাপড় কাচতে পারি ; কিন্তু আকৃলু না এলে ওর কাজ ঝি-চাকরেও করতে পারে না। দু'দিন সে না এলে বাড়ি ময়লায় দুর্গন্ধে নরককুণ্ড, আর অসুখ-বিসুখের ডিপো হ'য়ে ওঠে। এই যে এত কঠিন আর দরকারি কাজ আকৃলু করে, এর পারিশ্রমিক ও কত পায় জান ? দিন আড়াই পয়সাও নয়। অথচ তুমি একটা ওকালতনামায় সই ক'রে এক মিনিটে দশ টাকা কামাও। একজন ডাক্তার একটা ফোড়া অস্ত্র ক'রে পাঁচ-সাত শো হাজার টাকাও কামিয়ে নেয়। অথচ সে-ও পুঁজরক্ত ঘাঁটার ময়লা কাজই করে, কিন্তু সে ময়লা কাজ করার জন্যে তার পারিশ্রমিকের দর কমে না, বরং বাড়ে। আচ্ছা, ঐ ডাক্তার আর আকৃলুর মধ্যে পার্থক্যের এই মহাসমুদ্র আর কত দিন বহাল থাকবে বলতে পার ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিবার ভান করিয়া সমরেশ বলিল, "বলা কঠিন। তবে বেশি দিন থাকা উচিত নয়।"

বনলতা বলিল, "আমার ত মনে হয় চিরদিনই থাকা উচিত। আর, থাকবেও চিরদিন। কত দিন থাকবে জান ?"

"কত দিন ?"

"যত দিন বাঁশ থাকবে বাঁশ, আর দুব্বো থাকবে দুব্বো। বাঁশ নীচু হ'য়ে, আর দুব্বো উঁচু হ'য়ে এক জায়গায় এসে ঠেকলে কি হবে বলতে পার ?"

সমরেশের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। বলিল, কি হবে ?"

"বাঁশ তার মর্যাদা হারাবে, আর তুব্বো লাঠি হ'য়ে গাই-বলদের পেট না ভরিয়ে তাদের পিঠ ভাঙবে; যেমন আমাদের পিঠ ভাঙছে আজকালকার ঝি-চাকর-বামুনেরা।"

"ভাঙছে নাকি?"

"কেন, তা তুমি জান না? আজকালকার ঝিরা হয়েছে মহিলা; চাকররা হয়েছেন বাবুমশায়; আর বামুনরা হয়েছেন ঠাকুরমশায়। এক-এক সময়ে কি ইচ্ছে হয় জান? ইচ্ছে হয়, ঝির কাজ নিজের হাতে ক'রে ঝিদের দর্প চূর্ণ করি।"

কৌতুকোজ্জ্বল মুখে সমরেশ বলিল, "এ খুবই সদিচ্ছে। তোমার মতো ভদ্রমহিলারা যদি মাঝে মাঝে ঝিদের কাজ ক'রে ঝিদের কাজকে জাতে তুলতে সহায়তা করে, তা হ'লে ত আমাদের খুব বড় রকমের একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবার পথে আসে। আসল কথা, আমরা চাই পরিশ্রমের মর্যাদা যেন সর্বত্র সব সময়ে স্বীকৃত হয়; আর, এক শ্রেণীর পরিশ্রমের সঙ্গে অপর শ্রেণীর পরিশ্রমের যেন একটা অসঙ্গত বিভেদ না থাকে। অর্থাৎ, সামাজিক কাঠামোটা যেন এমন এক সুনির্মিত লোকোমোটিভ এঞ্জিনের মতো হয়, যার মধ্যে পিস্টনের মহিমা আছে ব'লেই সামান্য একটি ইস্ক্রুপের মর্যাদার অভাব না থাকে।"

বনলতা বলিল, "সে ত খুবই ভাল কথা। কিন্তু সেই সামান্য ইস্ক্রুপ মশায় যদি তাঁর প্যাঁচের বাঁধন থেকে বেরিয়ে এসে পিস্টনের মতো লম্পো-ঝম্পো করতে থাকেন, তা হ'লে এঞ্জিন বেচারার কি অবস্থা হয় তা বল!"

লোকোমোটিভ এঞ্জিনের উপমার মধ্যে তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়ের সমাধানকে স্থাপিত করিয়া সমরেশ ভাবিয়াছিল, বেশ খানিকটা জুৎ করিয়াছে। কিন্তু অকস্মাৎ ইস্ক্রুপকে প্যাঁচের বাঁধন হইতে মুক্ত হইয়া কলকে বিকল করিবার উপক্রম করিতে দেখিয়া সে প্রথমটা ঘাবড়াইয়া গেল। কিন্তু পরক্ষণেই বুদ্ধি জাগ্রত হওয়ায় সে কহিল, "ইস্ক্রুপ যদি প্যাঁচের বাঁধন থেকে বেরিয়ে আসে, তা হ'লে বুঝতে হবে ইস্ক্রুপের প্যাঁচের সঙ্গে ইস্ক্রুপের ঘরের প্যাঁচের মিল নেই।"

সমরেশের কথায় খুশি হইয়া বনলতা বলিল, "তা যদি না থাকে তা হ'লে যাতে মিল হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। ডান হাত আর

বাঁ হাতকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, মাথার ওপর রাগ ক'রে মাথায় আঘাত করলেই মাথার সমান হওয়া যায় না।"

উত্তর শুনিয়া সমরেশ চিন্তিত হইল। লোকোমোটিভ এঞ্জিনের উপমার সাহায্যে আলোচনা চলিতেছিলও নিতান্ত মন্দ না, এবং এঞ্জিনের কল-কব্জার বিষয়ে উভয়েরই জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা বশত সে পথে আলোচনা হয়ত শেষ হইয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু সহসা বনলতা নির্জীব কলকে পরিত্যাগ করিয়া সজীব-কল মানব-দেহের উপর ভর করায় আলোচনাটা সম্ভবত একটা সুদীর্ঘ নূতন পথ খুঁজিয়া পাইবার সুযোগ পাইল। মানব-দেহ যৎপরোনাস্তি জটিল বস্তু;—রক্ত-মাংস, মেদ-মজ্জা, শিরা-উপশিরা, প্লীহা-যকৃৎ, হৃদ্‌পিণ্ড-ফুসফুস প্রভৃতি সংক্রান্ত বিবিধ উপমার সাহায্যে আলোচনা যদি তর্ক-বিতর্কের অসীম আকাশের মধ্যে পক্ষবিস্তার করে তখন তাহাকে থামাইবে কে? যৎপরোনাস্তি কৌতূহলজনক ইংরাজী প্রবন্ধটা শেষ করিবার মতো যেটুকু সময় হাতে আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট না করিয়া সে আলোচনা কিছুতেই বিরাম মানিবে না।

উপমার যষ্টি ত্যাগ করিয়া সাদা বাংলায় কথা চালাইয়া তর্কের আশু পরিসমাপ্তি ঘটাইবার চেষ্টা দেখিবে; অথবা বনলতার ডান-হাত-বামহাতের উপমার প্রত্যুত্তরে মানব-দেহেরই খুব বেশি-রকম একটা দুর্নির্ণেয় অংশ, যথা অ্যাপেনডিক্স অথবা ফলিক্লের অপরিজ্ঞেয় কার্যশীলতা সংক্রান্ত একটা দুর্বোধ্য উপমা রচিত করিয়া বনলতাকে খানিকটা ঠাণ্ডা করিবে, সেই কথাই হয়ত সমরেশ মনে মনে ভাবিতেছিল। এমন সময়ে তাহার ভৃত্য হরিপদ আসিয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিল। বলিল, "একজন মক্কেল এসেছে বাবু। আপিস-ঘরে বসিয়েছি।"

স্ত্রীর জেরা হইতে পরিত্রাণ পাইবার একটা সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় মনে মনে প্রফুল্ল হইলেও মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখাইয়া সমরেশ বলিল, "এত রাত্রে ছুটির দিনে আবার কে মক্কেল জ্বালাতে এল?"

বনলতা বলিল, "ও-কথা বলতে নেই। মক্কেল লক্ষ্মী, যখন আসে তখনই ভাল।"

হরিপদ বলিল, "সেই কালোমতো লম্বা-চওড়া পশ্চিমা মক্কেল বাবু, যাকে যে লোহার মীট-সেফটা দিয়েছিল।"

বনলতা বলিল, "ও! তোমার সেই মেওয়ালাল—না, নেওয়ালাল। কিছুতে যদি নামটা ঠিক মনে থাকে!"

হরিপদ চলিয়া গিয়াছিল,—সমরেশ বলিল, "নেওয়ালাল, মেওয়ালাল নয়। মেওয়া মানে ফল। তোমার খালি লাল ফলের দিকেই দৃষ্টি।"

মুখ টিপিয়া হাসিয়া বনলতা বলিল, "বিয়ের রাত্তে বিধাতার হাত থেকে যে সেঁইয়ালাল পেয়েছে, তার দৃষ্টি লাল ফলের দিকে থাকবে না ত কি কালো ফলের দিকে থাকবে?"

সকৌতূহলে সমরেশ বলিল, "সেঁইয়ালাল মানে?"

তেমনি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বনলতা বলিল, "সেঁইয়ালাল মানে জান না? সেঁইয়া মানে স্বামী; তা হ'লে, সেঁইয়ালাল মানে লাল বর।"

"ও! তা হ'লে সেঁইয়ালাল চৌধুরীর কথা বলছ?"

খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া বনলতা বলিল, "তা নয় ত কার কথা বলছি?"

মৃদু হাসিয়া সমরেশ বলিল, "না, নামটি আমার পছন্দ হয়েছে। সমরেশ চৌধুরীর চেয়ে সেঁইয়ালাল চৌধুরী ভাল। আচ্ছা, আপাতত সেঁইয়ালাল নেওয়ালালের সঙ্গে দেখা করতে চলল।"

সমরেশ প্রস্থান করিলে বনলতা রেডিয়ো খুলিয়া দিবার জন্য হাত বাড়াইল, কিন্তু পর-মুহূর্তেই হাত সরাইয়া লইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া অফিস-ঘরের পর্দার পাশে গিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল। বহুদিন পরে আজ আবার নেওয়ালাল কোন্ নির্যাতনের বেদনাময় কাহিনী লইয়া উপস্থিত হইয়াছে জানিবার জন্য তাহার মনে আগ্রহ দেখা দিয়াছে।

নেওয়ালাল সমরেশের পুরাতন মক্কেল। প্রথম যখন সমরেশের সহিত তাহার পরিচয় হয় তখন সে কেন্‌সিংটন্ আয়রন ওয়ার্কস্ নামে এক লোহার কারখানার কোনো বিভাগের সুপারভাইজার। ইহার বছর পাঁচেক পূর্বে একদিন ভাগ্যান্বেষণের অভিপ্রায়ে রেল কোম্পানিকে ফাঁকি দিয়া বিনা টিকিটে আরা জিলার এক নগণ্য গ্রাম হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হয়। পাঁচ-সাত দিন প্রায় ভিক্ষালব্ধ খাদ্যেই কোনো প্রকারে জীবন ধারণ করিয়া কাটাইয়া ভাগ্যক্রমে হঠাৎ একজন দেশবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়া যায়। তাহার পর তাহারই

চেষ্টায় এবং সুপারিশে পূর্বোক্ত লোহার কারখানায় নিতান্ত মামুলি কুলিরূপে প্রবেশ লাভ করে।

নেওয়ালালের দেহে ছিল শক্তি এবং মস্তিষ্কে ছিল বুদ্ধির সহিত খানিকটা কূটবুদ্ধি। তাহারই প্রভাবে তাহার উন্নতির পথ সুগম, ও গতি দ্রুত হয়; এবং মাত্র বছর পাঁচেকের মধ্যে ক্রমোন্নতির দ্বারা সামান্য কুলি-শ্রেণী হইতে সুপারভাইজারের পদ অধিকার করে।

নেওয়ালাল সুপারভাইজার হইবার ছয় মাসের মধ্যে বেতনের হার, বোনাসের পরিমাণ এবং ওভারটাইমের শর্তাদি লইয়া কারখানার শ্রমিক, শিল্পী এবং কর্মচারীদের সহিত মালিকদের বাধিল সংঘর্ষ। আবেদনকারীদের যুক্ত আবেদন-পত্রে যে-সকল দাবি-দাওয়ার তালিকা ছিল, তাহার পনেরো আনা অংশ নামঞ্জুর হইয়া ফিরিয়া আসিল পার্টনারদের পক্ষ হইতে সুতীব্র মন্তব্য এবং কটু তিরস্কার বহন করিয়া। ফলে আবেদনকারীদের পক্ষে বিপ্লব দেখা দিল, এবং তাহার প্রমাণ-স্বরূপ মাঝে মাঝে আংশিক হরতাল হইতে লাগিল। কোনোদিন বা কারখানায় পাঁচ-সাতজন শিল্পী আসে না, কোনোদিন বা অফিসে তিন-চারজন কর্মচারী অনুপস্থিত হয়।

এরূপ ক্ষীণপ্রাণ বিপ্লবের গাছে কোনো সুফল ফলিল না। একদিন অফিসে আসিয়া সকলে দেখিল, স্থানে স্থানে দুই-চারজন নূতন লোক পুরাতনের স্থানাধিকার করিয়া বসিয়াছে, এবং অফিসের গেটের সম্মুখে এবং ভিতরে জায়গায় জায়গায় সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন হইয়াছে। গেটের সম্মুখে যাহারা পিকেটিং করিতে আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ সঙ্গীনের তীক্ষ্ণ ফলা দেখিয়া অবস্থা সঙ্গীন বিবেচনা করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল, এবং বাকি দুই-চারজন গেট হইতে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করিয়া বিড়ি পুড়াইতে লাগিল।

উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বিপ্লবের নৌকা বানচাল হইবার উপক্রম করিয়াছে দেখিয়া নেওয়ালাল কয়েকজন ঊর্ধ্বতন কর্মচারীকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া পিছনে ফেলিয়া নিজে আসিয়া হাল ধরিয়া বসিল। দেখিতে দেখিতে সংঘ দানা বাঁধিয়া সুপরিচালনার গুণে এমন ভাবে অগ্রসর হইতে লাগিল যে, না পারে পার্টনাররা তাহাকে ঠাণ্ডা করিতে, না

পারে পুলিসে তাহাকে গরম করিতে। অর্থের লোভে এবং সঙ্গীনের ভয়ে যে-ভাবে কারখানা চলিতে লাগিল, নিশ্চয়ই তাহাকে চলা বলে না।

ক্রুদ্ধ হইয়া পার্টনাররা নেওয়ালালকে ডিস্‌মিস্‌ করিল। কিন্তু তাহাতে অবস্থার যদি কিছু পরিবর্তন ঘটিল ত তাহা বিপ্লবীদের সপক্ষেই ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হইল। তিন-চার দিন পরে পার্টনারদের কক্ষে তলব পড়িল নেওয়ালালের। বাহিরে বারান্দায় জুতা খুলিয়া রাখিয়া নেওয়ালাল কক্ষে প্রবেশ করিয়া নত হইয়া পার্টনার-ত্রয়কে অভিবাদন করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইল।

একজন পার্টনার ইঙ্গিতে নেওয়ালালকে বসিতে বলিল।

সবিনয়ে মাথা নাড়িয়া নেওয়ালাল বলিল, "এমন অপরাধ করতে ব'লে লজ্জা দেবেন না হুজুর।"

কপট সতীত্বের সবিনয় বাক্য শুনিয়া পার্টনারদের অঙ্গ জ্বলিয়া গেল। একজন বলিল, "কেন, তাতে দোষ কি? তোমাকে যখন আমরা ডিস্‌মিস্‌ করেছি, তখন ত তুমি আর আমাদের নওকর নও।"

গদগদ কণ্ঠে নেওয়ালাল বলিল, "আমি হুজুরদের জিন্দগী ভোরের নওকর আছি। পাঁচ সাল আগে ভুখা পেটে হুজুরদের কারখানায় ঢুকেছিলাম, সে কথা কোনোদিন ভুলব না।"

"তবে তোমার এ রকম ব্যবহার কেন?"

চকিত স্বরে নেওয়ালাল বলিল, "বেওহারের কি দোষ আছে হুজুর?"

পার্টনার বলিল, "যে-আগুন আমরা এক রকম নিবিয়ে ফেলেছিলাম, তুমি আবার তাতে কাঠ দিলে কেন?"

নেওয়ালাল বলিল, "ভাল ক'রে আগুন না জ্বালালে ময়লা সাফ হবে না হুজুর। আঙ্গরাভি হবে, ময়লাভি থাকবে। আগে যারা আগুন জ্বেলেছিল, তারা আগুন জ্বালতে জানে না। আগুন যে জ্বালতে জানে, সে আগুন নিবাতেভি জানে। আমি জ্বালতেভি জানি, নিবাতেভি জানি।"

নেওয়ালাল যে আগুন জ্বালিতে জানে, তদ্বিষয়ে পার্টনারদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না, এবং নিবাইতেও জানে বলিয়া বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তাহাকে তলব করিয়াছে।

ইহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া বাদানুবাদ করিয়া কোনো ফল হইল না

দেখিয়া সিনিয়ার পার্টনার বলিল, "শোন নেওয়ালাল, তুমি তোমার নতুন দাবিনামা প্রত্যাহার ক'রে নাও; আমরাও তোমাকে বরখাস্ত করবার হুকুম রদ ক'রে দিই। আপাতত এক শো টাকা মাইনে বাড়িয়ে আমরা তোমাকে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ওয়ার্কস্ ম্যানেজার ক'রে দিচ্ছি। বাদ-বাকি লোকদের জন্যেও বিবেচনা ক'রে আমরা কিছু কিছু সুবিধে ক'রে দেব। কি বল?"

যুক্তকরে নেওয়ালাল বলিল, "বেশ হুজুর, আপনাদের মেহেরবানির কথা ইউনিয়নের কাছে পেশ করব। তারপর ইউনিয়ন যা তজবিজ করে তা আপনাদের জানাব।"

সবিস্ময়ে একজন পার্টনার বলিল, "তোমাদের আবার ইউনিয়ন হয়েছে নাকি?"

"হয়েছে বইকি হুজুর। বগৈর ইউনিয়নের কাম কি ভালভাবে চলতে পারে? হিন্দুস্থানের ইউনিয়ন নেই ব'লেই ত আমাদের এই হালৎ আছে।"

পার্টনারদের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, অসুবিধার কাঁটাগাছ স্থায়ী-ভাবে কারখানার প্রাঙ্গণে রোপিত হইয়াছে, যাহা ভবিষ্যতে মাঝে মাঝে জ্বালা না দিয়া ছাড়িবে না। সিনিয়ার পার্টনার জিজ্ঞাসা করিল, "কবে হ'ল তোমাদের ইউনিয়ন?"

"কাল সন্ধ্যার পর হুজুর।"

"প্রেসিডেণ্ট কে?"

"এখনো প্রেসিডেণ্ট ঠিক হয় নি।"

"তুমি কে ইউনিয়নের?"

"আমি ত হুজুর, সেকেরটরি আছি।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া সিনিয়ার পার্টনার বলিল, "দেখ নেওয়ালাল, আমরা তোমাদের ও ইউনিয়ন-ফিউনিয়ন কিছু বুঝি নে। কাল চারটের মধ্যে তোমরা তোমাদের মীমাংসা আমাদের লিখে জানাবে। যদি আমাদের তা পছন্দ হয় তা হ'লেই ভাল, আগামী মাস থেকে তুমি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ওয়ার্কস্ ম্যানেজার হবে। আর, যদি আমাদের সন্তুষ্ট করতে না পার তা হ'লে যাতে বছর খানেক ধ'রে মাঝে মাঝে তোমাদের হাজতে যেতে হয়, আর ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে

ছুটোছুটি করতে হয়, তার ব্যবস্থা আমাদের উকিল-ব্যারিস্টাররা করবে।"

যুক্তকরে নেওয়ালাল বলিল, "সে আপনাদের মেহেরবানি হুজুর। কিন্তু যতই হাজত আর উকিল-বালিস্টার দেখান, শেষ পর্যন্ত আপনাদের হাত থেকে আমরা তল্পবিল্প মেঙ্গে নোব। তা যদি না পারি, তা হ'লে বেফায়দা পাঁচ বছর আপনাদের নিমক খেয়ে বেঁচে আছি।"

নত হইয়া অভিবাদন করিয়া নেওয়ালাল ধীরে ধীরে পার্টনারদের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। সে মনে মনে ভাবিয়া দেখিল যে, অতঃপর শুধু নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া চলিলেই চলিবে না, বুদ্ধির সহিত আইনের বিদ্যাকেও যোগ করিতে হইবে।

অবিলম্বে ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট ঠিক করিয়া লইয়া সেই দিনই সন্ধ্যার পর নেওয়ালাল সমরেশের গৃহে উপস্থিত হইল; এবং সমরেশকে দিয়া মুসাবিদা করাইয়া লইয়া পরদিন বেলা চারিটার পূর্বেই ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্টের স্বাক্ষরে পার্টনারদের চিঠি দিল। সেই অতি-সংক্ষিপ্ত চিঠির মর্ম—সংশোধিত দাবিনামায় যে সকল দাবি প্রস্তাবিত হইয়াছে, তাহা হইতে ইউনিয়ন এক ইঞ্চিও হটিতে প্রস্তুত নহে।

উক্ত চিঠির মুসাবিদা করাইবার দিনই সমরেশের সহিত নেওয়ালালের প্রথম পরিচয়। তাহার পর যখনই আইন অথবা আদালত সংক্রান্ত কোনো প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে, একমাত্র সমরেশ ভিন্ন আর কাহারও সহায়তা সে গ্রহণ করে নাই। শুধু নিজের প্রয়োজনেই নহে; আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যখনই যাহার উকিলের প্রয়োজন হইয়াছে, তৎপর হইয়া তাহাকে সমরেশের নিকট পাঠাইয়াছে।

অফিস-ঘরে সমরেশের বৃহৎ সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সম্মুখে একটা চেয়ারে নেওয়ালাল বসিয়া ছিল। সমরেশ প্রবেশ করিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া নত হইয়া অভিবাদন করিয়া বলিল, "রাম রাম বাবুজী, গোড় লগি। সব কুশল-মঙ্গল ত?"

সমরেশ বলিল, "রাম রাম। ব'স ব'স নেওয়ালাল। হ্যাঁ, কুশল-মঙ্গল সব। কি খবর তোমার বল? দিন বেশ আনন্দে কাটছে ত?"

সমরেশ বলিলে চেয়ারে উপবেশন করিয়া নেওয়ালাল বলিল,

"আপনার দোয়ায় আনন্দেই ত কাটছিল হুজুর, কিন্তু কাটতে দিলে কই? দুনিয়া একদম বিগড়ে গেছে বাবুজী,—যত সব শয়তানের রাজ হয়েছে।"

"কে আবার তোমার সঙ্গে শয়তানি করলে?"

"চিরদিন যারা শয়তানি করে, তারা ছাড়া আর কে করবে হুজুর! আমার খেয়ে আমার প'রে যারা মানুষ হচ্ছে, তারাই করছে। সব কথা বলছি আপনাকে।"—বলিয়া নেওয়ালাল পকেট হইতে কাগজে মোড়া পঁচিশটা ধাতুনির্মিত টাকা বাহির করিয়া কাগজ খুলিয়া সমরেশের সম্মুখে স্থাপিত করিল।

"এ কিসের টাকা?"

করজোড় করিয়া নেওয়ালাল বলিল, "এ ত হুজুরের পরণামি আছে। হুজুর ত আমার সেরেফ ওকিলই নেহি আছেন, দেওতাভি আছেন।"

এ ব্যাপার আজ প্রথম নহে। পূর্বে যখনই কোনো মামলা মকদ্দমার কাজে সমরেশের নিকট নেওয়ালাল আসিয়াছে, প্রথমেই সে কিছু টাকা দর্শনীস্বরূপ দাখিল করিয়াছে। তবে সে দর্শনীর পরিমাণ সাধারণত পাঁচ টাকাতেই নিবদ্ধ থাকিত; এক-আধবার ছাড়া, দশ টাকা পর্যন্তও উঠিতে দেখা যাইত না। এবারকার টাকার পরিমাণ দেখিয়া সমরেশ অনুমান করিল, কাজের গুরুত্বও এবার সম্ভবত দর্শনীর অনুপাতেই বেশি হইবে। কিন্তু সবিস্তারে নেওয়ালালের মুখে তাহার অশান্তির কাহিনী শুনিয়া সে বুঝিল, কাজের গুরুত্ব যত বেশি হউক বা না হউক, কাজের অভিনবত্ব এবার যথেষ্টই বেশি। চাকা এবার পরিপূর্ণভাবে ঘুরিয়াছে; যে ছিল নীচে, সে একেবারে উপরে চড়িয়া বসিয়াছে। এবার যদি তাহাকে ওকালতি করিতে হয় ত সাপের হইয়া ব্যাঙের বিরুদ্ধে করিতে হইবে। অর্থাৎ, নেওয়ালাল এখন আর শ্রমিক নহে, এখন সে বণিক, মালিক হইয়া এখন সে কর্মীদের কাঁধে চড়িয়াছে।

বছর তিনেক হইল কেন্‌সিংটন্‌ আয়রন্‌ ওয়ার্কসের চাকরি ছাড়িয়া দিয়া নিজের পুঁজি এবং ব্যবসায়-সামর্থ্যের সাহায্যে সে এক লোহার কারখানা খুলিয়াছে। নিজের জন্মস্থানের নামে কারখানার নাম দিয়াছে কক্‌রৌলি আয়রন ওয়ার্কস্‌। বিশ্বধ্বংসকারী রক্তস্রাবী মহাযুদ্ধের

কল্যাণে এই তিন বৎসরেই সে বেশ একটু সুবিধার মুখদর্শন করিয়াছে; কিন্তু সম্প্রতি সেই সুবিধার স্বর্ণাঙ্কিত পথে মহাবৈরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে দেওনন্দন সহায়। কক্রৌলি আয়রন ওয়ার্কসের সৃষ্টির কথা সমরেশের অবশ্য অপরিজ্ঞাত নহে; কিন্তু দেওনন্দন সহায়ের বৈরী হইয়া দাঁড়ানোর সংবাদ নূতন।

কেন্‌সিংটন্ আয়রন ওয়ার্কস্ হইতে ভাঙিয়া আসিবার সময়ে নেওয়ালাল যে কয়েকজন কর্মীকে নিজের সহিত ভাঙাইয়া আনিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে যোগ্য ছিল দেওনন্দন সহায়। উপস্থিত সে কক্রৌলি আয়রন ওয়ার্কসের চীফ ওয়ার্কস্ ম্যানেজার। তাহার সুযোগ্য পরিদর্শনের প্রভাবে কক্রৌলি আয়রন ওয়ার্কস্ কেন্‌সিংটন্ আয়রন ওয়ার্কস্‌কে ক্রোধের দ্বারা তপ্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

চতুর নেওয়ালাল দেওনন্দনকে ভাঙাইয়া আনিবার সময়ে তাহার মাসিক বেতন বেশ খানিকটা বাড়াইয়া দিয়া পাঁচ বৎসরের চুক্তিনামা লিখাইয়া লইয়াছিল। সেই চুক্তিনামা অনুযায়ী এখনও দুই বৎসরের কিছু অধিককাল দেওনন্দন বেতনবৃদ্ধির দাবি করিতে পারে না, কিন্তু কক্রৌলি আয়রন ওয়ার্কসের অচিন্ত্যপূর্ব অর্থাগম দেখিয়া তাহার চোখ টাটাইয়াছে। সে বলিতেছে, বেশি বেতন দেওয়া চুক্তিনামা অনুযায়ী যদি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে খানিকটা অংশের পার্টনার করিয়া লইয়া তাহাকে ঠাণ্ডা করা উচিত, নচেৎ সে অন্তত জন পঞ্চাশেক কর্মীকে ভাঙাইয়া লইয়া তাহার জন্মগ্রামের স্মৃতিরক্ষাকল্পে কাল্‌কাপুর আয়রন ওয়ার্কস্ নাম দিয়া লোহার কারখানা খুলিবে। চুক্তি-ভঙ্গের অপরাধে আদালতের বিচারে একান্তই যদি কিছু টাকা খেসারৎ দিতে হয়, তথাপি সে মোটের উপর লাভবান থাকিবে।

সমরেশ বলিল, "তুমি যে শয়তানদের কথা বলছিলে, দেওনন্দন তা হ'লে তাদের মধ্যে একজন?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নেওয়ালাল বলিল, "একজন বলছেন কি হুজুর! সে শয়তানদের সর্দার আছে। তা নইলে এ কথা কখনো বলতে পারে যে, পাঁচ সাল পর্যন্ত মাহিনা না বাড়াবার শর্ত যদি থাকে ত হিস্‌সাদার ক'রে নিয়ে মুনাফার হিস্‌সা কিছু দাও! ধোতি না দেবার শর্ত থাকলে পাৎলুন দিতে হবে, এ কোন্ জুলুমবাজির বিচার হুজুর?

আর, ওই পাঁচ সালের চুক্তিনামার সমুচাটা ওর নিজের হাতের লিখা, আর নিজের কলমের দস্তখত আছে।”—বলিয়া গভীর বিস্ময় এবং বিরক্তির সহিত অপলক নেত্রে সমরেশের দিকে চাহিয়া রহিল।

মনে মনে মৃদু হাস্য করিয়া সমরেশ বলিল, “কিন্তু নেওয়ালাল, কেন্‌সিংটন্ আয়রন ওয়ার্কসের বিরুদ্ধে তোমরা যখন ধর্মঘট করেছিলে, তখন তোমাদের মালিকদেরও কাছে সার্ভিস বুক, চুক্তিনামা প্রভৃতি অনেক রকম দলিল দস্তাবেজ ছিল, কিন্তু তখন তোমাদের বুলি ছিল—‘তোড় দেও, ফাড় দেও, লুঠ লেও, ছিন লেও’। তোমাদের কাছ থেকে সেই সব মন্ত্র শিখে এখন যদি দেওনন্দন তার নিজের চুক্তিনামা ফাড় দিতে চায়, তা হ’লে তুমি কি করতে পার বল? তা ছাড়া, তুমি যেমন দেওনন্দনদের নিয়ে বেরিয়ে এসে কেন্‌সিংটন্‌কে কাবু করেছিলে, দেওনন্দনও যদি তোমার কাছ থেকে সেই তালিম পেয়ে ঠিক তেমনি ক’রে কাক্‌রৌলিকে কাবু করে, তা হ’লেই বা তুমি কি বলতে পার, শুনি?”

নেওয়ালাল বলিল, “আমরা আমাদের মালিকদের কাছে হাতজোড় ক’রে ভিক্‌ছা মেগেছিলাম হুজুর,—দেওনন্দন ঘুঁসা পাকিয়ে মারতে আসে।”

মৃদু হাসিয়া সমরেশ বলিল, “হাতজোড় ক’রে তুমি যতটা তোমার মালিকদের কাবু করেছিলে, আমার বিশ্বাস, ঘুঁসা পাকিয়ে দেওনন্দন তার অর্ধেকও পারবে না।”

নেওয়ালাল বলিল, “না বাবুজি, ও পুরা জুলুমবাজ আছে। ওর মাফিক নিমকহারাম সারা হিন্দুস্থানে আর দুসরা আছে কি না জানি না। এক-একবার কি মনে হয় জানেন হুজুর? মনে হয়, আমার মালিকদের আমি যে তক্‌লিফ দিয়েছিলাম, ওহি পাপে দেওনন্দন আমাকে তক্‌লিফ দিচ্ছে। মালিক, পুঁজিদার, জিমিদার—এ সব ঠিক আছে বাবুজি। মচ্ছড় আমার লেহু খায়, আমি পাঁঠার লেহু খাই, পাঁঠা ঘাঁসের লেহু খায়। সন্‌সারের এই দস্তুর আছে হুজুর।”

সমরেশ চুপ করিয়া রহিল। সে বুঝিল, কেন্‌সিংটন্ হইতে আসিবার সময়ে নেওয়ালাল মালিকদের নিকট হইতে একটি নীল চশমা চাহিয়া আনিয়াছে। এখন সে চতুর্দিক নীলই দেখিবে।

অ্যাটাসি কেস হইতে একটা রেজেস্টারি খাম বাহির করিয়া সমরেশের সম্মুখে রাখিয়া নেওয়ালাল বলিল, "এই চিঠি দেওনন্দন দিয়েছে, দেখে রাখবেন হুজুর। পরশু সকালে এসে আপনার সলাহ্ নেব।"

খামটা নেওয়ালালের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সমরেশ বলিল, "তা ত হবে না নেওয়ালাল।"

চিন্তিতমুখে নেওয়ালাল বলিল, "কেন হুজুর?"

"তুমি ত আজ বাঘ হয়েছ। জান ত আমি বাঘের ওকালতনামা গ্রহণ করি নে। আমি গরু ভেড়া ছাগল—এদের উকিল।"

হাতজোড় করিয়া নেওয়ালাল বলিল, "আমি সব দিন হুজুরের জন্য ছাগল আছি।"

ঘাড় নাড়িয়া সমরেশ বলিল, "না না, ও-কথার কোনো মানে নেই। দেওনন্দনের ব্যাপারে তুমি ছাগল নও, বাঘ।"

নেওয়ালাল অনেক অনুরোধ-উপরোধ করিল, কিন্তু সমরেশ কিছুতেই সম্মত হইল না। অগত্যা চিঠিখানা ব্যাগে পুরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, "পরশু আমি একবার আসব হুজুর। মনে মনে একটু দয়া ক'রে রাখবেন।"

সমরেশ বলিল, "পরশু কেন, কালই এস তাতে খুশিই হব।" অভিবাদন করিয়া চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "শোন, শোন নেওয়ালাল। টাকা ফেলে যাচ্ছ, টাকা তোমার নিয়ে যাও।"

ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নেওয়ালাল বলিল, "টাকা নিবেদন ক'রে দিয়েছি হুজুর। ও-টাকা ফিরিয়ে নিলে পাপ হবে।"

সমরেশ বলিল, "ও-টাকায় তোমার এ দেবতার ভোগ চলবে না। ও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও।"

কাতর মুখে নেওয়ালাল হাতজোড় করিয়া বলিল, "এত বড় অন্যায় হুকুম করবেন না হুজুর।"

সমরেশ বলিল, "আচ্ছা, বেশ, অনেক মক্কেল ত আমাকে তুমি পাঠাও,—তাদের কারো হাত দিয়ে ও-টাকা পাঠিয়ে দিও।" তাহার পর হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেওনন্দনের হাত দিয়েই না হয় পাঠিয়ে দিও। তোমার বিরুদ্ধে তার উকিল হওয়া যাবে।"

সমরেশের কথা শুনিয়া নেওয়ালালের মুখ হর্ষোজ্জ্বল হইয়া উঠিল; উৎসাহিত কণ্ঠে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা বাৎ হুজুর। উকিল করবার জন্তে আপনার কাছেই দেওনন্দনকে পাঠাব। মরি ত রামের হাতেই মরব। রাবণের হাতে মরলে তকলিফও হবে, বে-ইজ্জতিও হবে।"

স্মিতমুখে সমরেশ বলিল, "তবে আর বাধা কি আছে! আজ তুমি টাকা তুলে নিয়ে যাও।"

কোনো কথা না বলিয়া করজোড় করিয়া এমন করুণভাবে নেওয়ালাল দৃষ্টিপাত করিল যে, সমরেশ আর কিছু বলিতে পারিল না।

নেওয়ালাল প্রস্থান করিলে সমরেশ দেরাজ খুলিয়া ডায়েরি বাহির করিয়া সামান্য কিছু লিখিল, তাহার পর টাকা কয়টা পকেটে ফেলিয়া আলো নিবাইয়া দিল।

সমরেশ যখন ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন বনলতা রেডিয়ো খুলিয়া চেয়ারে বসিয়াছে। সমরেশকে দেখিয়া রেডিয়ো বন্ধ করিয়া দিয়া গম্ভীর মুখে বলিল, "নেওয়ালাল-বাঘ চ'লে গেল?"

বনলতার কথা শুনিয়া সমরেশ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "সব শোনা হয়েছে দেখছি।"

"দেখলে ত নেওয়ালাল-ছাগ কত সহজে নেওয়ালাল-বাঘে পরিণত হয়। বলেছি ত যতদিন বাঁশ বাঁশ থাকবে আর ডুব্বো ডুব্বো থাকবে, ততদিন সংসারে নেওয়ালাল-ছাগ আর নেওয়ালাল-বাঘ—দুই-ই থাকবে।"

সমরেশ বলিল, "আর ততদিন নেওয়ালাল-ছাগদের মামলা-মকদ্দমা করবার জন্তে আদালতে সেঁইয়ালাল চৌধুরীরাও থাকবে।"

উভয়ের হাস্যরবে কক্ষ চকিত হইয়া উঠিল।

বনলতা বলিল, "তুমি ছাগের উকিল হ'য়ে বাঘের টাকা নিলে কেন? ও-টাকা আমাকে দাও।"

পকেট হইতে টাকাগুলা বাহির করিয়া বনলতাকে দিতে দিতে সমরেশ বলিল, "তা বটে। বাঘের টাকা বাঘিনীই নিক।"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বনলতা বলিল, "বাঘিনী কি রকম? আমি ত বনলতা-হরিণী।"

হাসিমুখে সমরেশ বলিল, "সে ত আমার মনোবনের হরিণী।"

বনলতা বলিল, "মনোবনের হরিণী হই আর যাই হই, খানিকটা বাঘিনীও আমি নিশ্চয়।"

সকৌতূহলে সমরেশ বলিল, "কেন বল দেখি ?"

"বলছি। তার আগে আর একটা কথা বলি।"

"কি কথা ?"

"খুশি হবার কথা। আকৃলু জমাদার দেড় টাকা মাইনে চেয়েছে।"

হাসি মুখে সমরেশ বলিল, "খুশি হবার কথা নিশ্চয়ই। এ মাস থেকে ওকে তা হ'লে দেড় টাকা ক'রেই দিও।"

"তুমি ত তিন টাকা ক'রে দিতেও রাজি হয়েছিলে !"

"সে ত পাঁচ টাকা চেয়েছে শুনে।"

"তা হ'লে পাঁচ টাকা চাইলে বাধ্য হ'য়ে তুমি তিন টাকা ক'রে দাও, বাধ্য না হ'লে দাও না। কেমন ? তা হ'লে ত তোমার মধ্যে খানিকটা সেঁইয়ালাল-বাঘও রয়েছে বলতে হবে।"

সহাস্য মুখে সমরেশ বলিল, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না। আমি যখন খানিকটা সেঁইয়ালাল-বাঘ, তখন তুমিও খানিকটা বনলতা-বাঘিনী। কেমন, ঠিক কি না ?"

বনলতা বলিল, "হ্যাঁ ঠিক। সেইজন্যেই ত বলি, আমাদের প্রত্যেকেরই মধ্যে খানিকটা ক'রে ছাগ আর খানিকটা ক'রে বাঘ—দুই-ই আছে। কিন্তু যে সীমান্তে আমরা ছাগ হ'য়ে গুঁতোনো বন্ধ ক'রে বাঘ হ'য়ে কামড়াতে আরম্ভ করি, তার রেখা নির্দেশ করা সব ক্ষেত্রে খুব সহজ নয়।" বলিয়া সে রেডিয়ো চালাইয়া দিল।

নিবারণ বাঁড়ুজ্যে

বাগবাজার অঞ্চলে নিবারণ বাঁড়ুজ্যে বহুনামা ব্যক্তি; অর্থাৎ বাগবাজারের অধিবাসীগণ নিবারণ বাঁড়ুজ্যেকে বহু নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কেহ বলে নিদারুণ বাঁড়ুজ্যে, কেহ বলে নিরশন বাঁড়ুজ্যে, কেহ বলে একাদশী বাঁড়ুজ্যে, কেহ বলে নিশিপালন বাঁড়ুজ্যে, আবার কেহ বা বলে নাম-করতে-নেই বাঁড়ুজ্যে। কিন্তু তাহার প্রকৃত

নাম নিবারণ বাঁড়ুজ্যে সহসা কেহ উচ্চারণ করে না, বিশেষত মধ্যাহ্ন-আহারের পূর্বে।

অ্যালিউমিনিয়ামের কল্যাণে বর্তমান কালে হাঁড়ি ফাটিবার ভয় না থাকিলেও, অ্যালিউমিনিয়ামের হাঁড়ি উল্টাইবার পক্ষে ত বাধা নাই। সেই জন্য গৃহস্থ-ঘরের মেয়েদের মধ্যে নিবারণের নাম আলুনি বাঁড়ুজ্যে বলিয়া চলিত। আলুনি নামের উৎপত্তির ইতিহাস-প্রসঙ্গে কেহ বলে, নিবারণ বেগুন-পোড়ায় নুন না দিয়া খাইতেই ভালবাসে তাই তাহার নাম আলুনি বাঁড়ুজ্যে; কেহ বা বলে, ব্যঞ্জনমাত্রেই লবণের প্রয়োগ নিবারণ অপব্যয় মনে করে বলিয়া সে আলুনি বাঁড়ুজ্যে আখ্যা লাভ করিয়াছে। কিন্তু প্রতিবেশী-গৃহে নিমন্ত্রণ খাইবার কালে লবণসংযুক্ত ব্যঞ্জনে নিবারণের কিছুমাত্র অস্পৃহা দেখা যায় না; এমন কি, কয়েক ক্ষেত্রে আলুনি বেগুন-ভাজায় যথেষ্ট পরিমাণে লবণ মিশাইয়া খাইতেও তাহাকে দেখা গিয়াছে। অবশ্য, পরের পয়সার লবণ মিষ্ট লাগে, সে একটা প্রবল যুক্তি বটে। কিন্তু সে যাহাই হউক, কৃপণতার সহিত আলুনি শব্দের যে একটা গোত্রগত আত্মীয়তা আছে—সে কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাহা ছাড়া, আলুনি শব্দটি পাক-বিষয়ক শব্দসংঘের অন্তর্গত বলিয়া স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক এই শব্দের দ্বারা নামকরণ প্রাসঙ্গিক হইয়াছে।

নিন্দুকেরা নিবারণকে যকের সহিত উপমিত করে। মাটির নিম্নে পোঁতা ধনরাশি আগলাইয়া যক যেমন দিনপাত করে, নিবারণও তেমনি করে। তবে তাহার মাটি হইতেছে ব্যাঙ্কের মাটি; আর ব্যাঙ্কের সে-মাটি এমনই কঠিন পাথুরে মাটি যে, তাহার পাষাণ-বক্ষ ভেদ করিয়া সুদরূপী তৃণাঙ্কুরও যে নিবারণের জীবদ্দশায় কাহারো উপকারে নির্গত হইবে, এমন ভরসা কেহই করে না।

বন্ধুরা বলে, "কত জমল হে নিবারণ? দু লাখ—না, চার লাখ?"

নিবারণ বলে, "না না, অত নয়।"

"তবে কি মাঝামাঝি?"

নিবারণ কিছু বলে না, চুপ করিয়া থাকে।

বন্ধুরা বলে, "ভবিষ্যতে এ টাকায় কি হবে বল ত?"

নিবারণ বলে, "আর যাই হোক না কেন, আমার শ্রাদ্ধ হবে না—সে কথা উইলে স্পষ্ট ক'রে লিখে রেখে যাব।"

বন্ধুরা বলে, "তোমার নিজের শ্রাদ্ধ না হোক, তোমার টাকার শ্রাদ্ধ হ'তে পারে ত ?"

নিবারণ বলে, "আমার টাকার অদৃষ্টে যদি শ্রাদ্ধই লেখা থাকে তা হ'লে তা-ই হবে। কিন্তু সে ভয়ে মরবার আগেই ওঁ শ্রাদ্ধ করতে পারি নে।"

বন্ধুরা বলে, "তা না কর, ভোগ করতে ইচ্ছে হয় না তোমার ?"

নিবারণ বলে, "ভোগ করি ত। খানিকটা ভোগ করি দেহে, বাকিটা মনে। দেহের চেয়ে মন উঁচু জিনিস তা মানো কি-না ?"

দেহ অপেক্ষা মানুষের মন হীন বস্তু—এ কথা বলিতে বন্ধুদের বাধে, সুতরাং বলিতেই হয়, "মানি।"

উত্তরে নিরারণ বলে, "তাই, খানিকটা টাকা ব্যয় ক'রে দেহকে দিই আরাম, আর বাকি টাকাটা জমিয়ে মনকে করি খুশি।"

উঁচু কথার আবরণে কৃপণতাকে ঢাকিবার প্রয়াস মনে করিয়া রাগত হইয়া বন্ধুরা বলে, "মনকে খুশি করার বড় বড় কথা যখন এত উঁচু গলায় বলছ, তখন জিজ্ঞেস করি, একটু-আধটু পরোপকার করলে মন কি তোমার একটুও খুশি হয় না ?"

এ কথা শুনিয়া নিবারণ প্রথমটা চুপ করিয়া থাকে, তাহার পর ধীরে ধীরে বলে, "আগে আগে পরোপকারে মন কতখানি ক'রে খুশি হয়েছে সেটা হয়ত যথাসময়ে খেয়াল ক'রে দেখি নি; ভবিষ্যতে দেখে তোমাদের বলব।"

নিবারণের কথা শুনিয়া বন্ধুরা হাসিয়া উঠিয়া বলে, "ভয় নেই নিবারণ, সে ভবিষ্যৎ আমাদের কপালে কোনোদিন আসবে না।"

বিস্মিত হইয়া নিবারণ বলে, "কেন বল ত ?"

"তোমার আসবে না ব'লে।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, ভবিষ্যতে তুমি কখনো টাকা দিয়ে পরোপকারও করবে না, কাজে-কার্জেই পরোপকার করলে তোমার মন কতটা খুশি হয় তা খেয়াল করবার সুযোগও পাবে না।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিবারণ বলে, "এ কিন্তু তোমাদের গায়ের জোরের কথা। কিসের ওপর নির্ভর ক'রে এত জোরের সঙ্গে এ কথা বলছ ?"

বন্ধুরা বলে, "অতীতের ওপর নির্ভর ক'রে। অতীতে কোনোদিন একটি পয়সা দিয়েও কারোর উপকার করেছ কি তুমি?"

নিবারণ উত্তর দেয়, "অতীতে না ক'রে থাকলে ভবিষ্যতে করতে পারি নে—এ কথার কোনো মানে হয় না। অতীতে তোমরা কোনোদিন মারা যাও নি ব'লে ভবিষ্যতেও কোনোদিন মারা যাবে না বলতে চাও না-কি?"

বন্ধুরা রাগিয়া বলে, "বাজে রসিকতা দিয়ে আসল কথাটা ঢাকতে যেও না নিবারণ। তোমার কঠিন লোহার সিন্দুক আগে কোনোদিন কারো উপকারে তার দোর খোলে নি, ভবিষ্যতেও কোনোদিন খুলবে না। এই হালফিল দিন-কুড়িক আগে পরোপকার করবার একটা মস্ত সুযোগ তুমি পেয়েছিলে, কিন্তু সে সুযোগ তোমার দ্বারা অপমানিত হয়েছিল।"

চকিত কৌতূহলে নিবারণ বলে, "কি ক'রে বল দেখি?"

"কেন, বিশ্বেশ্বর লাহিড়ীর বাপের আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যাপারে। পিতৃদায়ে কাতর হ'য়ে এসে হাজার খানেক টাকার জন্যে বিশ্বেশ্বর বোধহয় তোমার পায়ে ধরতেও বাকি রাখে নি। দিলে না ত তাকে একটা পয়সা, অথচ উল্টে এমন সব বচন ঝাড়লে যে, দু-চোখ-ভরা জল নিয়ে বেচারা বাড়ি ফিরে গেল।"

নিবারণ বলে, "কি করি বল ভাই, এক সঙ্গে একেবারে দু-দুটো শ্রাদ্ধ করবার কি দরকার ছিল তা তো বুঝি নে, টাকা দশেক খরচ ক'রে তিল-কাঞ্চন করলেই যখন সমস্যা মিটে যেত!"

সবিস্ময়ে বন্ধুরা বলে, "দু-দুটো কি রকম? একটা তো।"

নিবারণ বলে, "সুরেশ্বর লাহিড়ীর আদ্যশ্রাদ্ধ হ'ল এক নম্বর, আর দু নম্বর হ'ল নিবারণ বাঁড়ুজ্যের টাকার শ্রাদ্ধ। তা হ'লে দুটো শ্রাদ্ধই হ'ল না?"

ক্ষণকাল ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিয়া থাকিয়া একজন বন্ধু বলে, "নিবারণ বাঁড়ুজ্যের টাকা নয় নিবারণ, অন্য কোনো বাঁড়ুজ্যের টাকা। তোমার এই ধরণের কীর্তিকলাপ আর বচন-বাচনের জন্যে বাগবাজার অঞ্চলে কতগুলো নামে তুমি চালু আছ, সে খবর রাখ?"

"রাখি বইকি ভাই।" বলিয়া অস্ফুট মৃদুকণ্ঠে কিছু আবৃত্তি করিতে

করিতে অঙ্গুলি-রেখায় গণনা করিয়া নিবারণ বলে, "নিবারণ নিয়ে, আর কঞ্জুষ বাদ দিয়ে সাতটি। ও কি আর ভুল হবার উপায় আছে, একেবারে নামমালায় গাঁথা।"

সকৌতূহলে বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করে, "নামমালা কি ব্যাপার বুঝলাম না ত ?"

মৃদু হাসিয়া নিবারণ বলে, "যে নামগুলোতে আমি চালু আছি বলছ, সবগুলোই আমার পছন্দ ব'লে পতিতপাবনকে দিয়ে একটা শ্লোকে নামমালা তৈরি করিয়ে নিয়েছি। পতিতপাবন একটু সংস্কৃত জানে, জান ত ?"

"জানি। কি নামমালা পতিতপাবন করেছে শুনি ?"

সংস্কৃত শ্লোক পাঠের বিশেষ ঝোঁক লাগাইয়া নিবারণ আবৃত্তি করে—

"নিবারণোনিদারুণ রালুনি অনশনশ্চ।
একাদশী নিশিপালম্নাম-কর্তে-নেই কঞ্জুষঃ॥"

নামমালা শুনিয়া বন্ধুরা হাসিয়া ফাটিয়া পড়ে; একজন বলে, "পতিতপাবন তোমার অতবড় বন্ধু হ'য়ে অবশেষে সে-ই এই নামমালা তৈরি ক'রে তোমার গলায় ঝুলিয়ে দিলে ?"

নিবারণ বলে, "বন্ধু ব'লেই দিয়েছে। ক'জনের ভাগ্যে এ রকম সাত-সাতটা নাম জোটে বল দেখি ? আর একটা হ'লেই ত সূর্যের অষ্টনামের মতো শ্লোকটা পূর্ণ হ'য়ে যায়।"

বন্ধুরা বলে, "যে রকম লাগিয়েছ তুমি, অষ্টম নাম জুটতে খুব বিলম্ব হবে না তোমার। আচ্ছা, দিলে ত দিলে পূর্ণ চাকিকে আটহাত কাপড় কেমন ক'রে দিলে বল দেখি ? আট হাতের ওপর আর দু হাত উঠে দশ হাত হ'তে পারলে না ? সকলকে কাপড় দেখিয়ে দেখিয়ে পূর্ণ হাসে আর বলে, একেই বলে দিষ্টি কেপ্লোণ।"

নিবারণ বলে, "কি করি বল। পূর্ণকে দশ হাত কাপড় দিলে আমার চারখানা কাপড় সাড়ে সাত হাত ক'রে করতে হয়। এই দেহে সাড়ে সাত হাত একটু খাটো হয় না কি ?"

বন্ধুরা বলে, "স্পষ্ট ক'রে খুলে না বললে কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি নে।"

নিবারণ বলে, "চারখানা কাপড় করবার জন্যে একটা বিশ গজ থান কিনেছিলাম, এমন সময়ে পূর্ণ এসে হাজির। দেখলাম, সত্যিই তার কাপড়ের অভাব, অথচ খান চারেক কাপড়ের কমে আমারও দু বছর পোষায় না। কাজেই বিশ গজে পাঁচখানা কাপড় ক'রে ফেললাম।" তাহার পর নিজের পরিহিত বস্ত্রের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া বলে, "এই ত আটহাতি কাপড় প'রে রয়েছি, কি মন্দ হয়েছে বল ?"

বন্ধুরা হাসিয়া উঠিয়া বলে, "খাসা হয়েছে ! সঙ্গে সঙ্গে তোমার অষ্টম নামও ঠিক হয়ে গেছে। তোমার অষ্টম নাম রইল আট-হাতি বাঁড়ুজ্যে। কেমন, পছন্দ হয় ?"

মৃদুস্মিত মুখে নিবারণ বলে, "হয়। খাসা নাম আট-হাতি বাঁড়ুজ্যে। কিন্তু নামমালার মধ্যে পোরা চলবে ত ?" মনে মনে এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া দেখিয়া বলে, "তা মন্দ চলবে না। হয়ত একটু ছন্দঃপাত হবে। তা হোক, আট-হাতিকে যোগ ক'রে আঠাতি ক'রে নিলে অনেকটা মানিয়ে যাবে।" বলিয়া আবৃত্তি করিয়া দেখে,—

"নিবারণোনিদারুণ রালুনি অনশনশ্চ।
একাদশীনিশিপালন্নাম-কর্তে-নেই আঠাতি ॥"

বন্ধুরা হাসিয়া উঠিয়া বলে, "চমৎকার হয়েছে ! এবার সূর্যের অষ্টনাম পূর্ণ হ'ল। কাল সকালে প্রাতর্ভ্রমণের সময়ে বন্ধুবর পতিতপাবনকে শুনিও।"

"শোনাব।" বলিয়া নিবারণ মৃদুস্বরে গুঞ্জন করে, "একাদশী নিশিপালন্নাম-কর্তে-নেই আঠাতি।"

বন্ধুরা বলে "সত্যিই তোমার নাম করতে নেই আঠাতি। পতিত-পাবন ত তোমার অত অন্তরঙ্গ বন্ধু, আচ্ছা, অমন হাত-খোলা লোকের সঙ্গে সঙ্গে থেকেও একটু কি তোমার পরিবর্তন হ'ল না ? যে বদ্ধমুষ্টি সেই বদ্ধমুষ্টি হ'য়েই রইলে ? আমরা ভেবে আশ্চর্য হই, তোমাদের মতো এমন দুটি বিপরীত প্রকৃতির লোকের মধ্যে এত প্রণয় কি ক'রে সম্ভব হয় !"

মৃদু হাসিয়া নিবারণ বলে, "তা-ই হয়। বিপরীতে বিপরীতেই জ'মে ওঠে বেশি। স্ত্রী-পুরুষের ক্ষেত্রেই দেখ না, আকৃতিতেই বল, আর প্রকৃতিতেই বল, উভয়ে কত প্রভেদ, অথচ প্রণয়ের আর অন্ত নেই।

আর, পরিবর্তনের কথা যা বলছিলে, সঙ্গে সঙ্গে থাকলেই কি সব সময়ে পরিবর্তন হয়? সঙ্গে সঙ্গেই বা কেন, স্বামী স্ত্রী ত পাশে পাশে থাকে, কিন্তু তাই ব'লে স্ত্রীর মাথা দেখে স্বামী চুল বড় ক'রে রেখে খোঁপা বাঁধতে আরম্ভ করলে, অথবা স্বামীর মাথা দেখে স্ত্রী চুল ছেঁটে দশআনা-ছআনা ক'রে ফেললে, এমন কখনো দেখেছ কি?"

তেমন দৃষ্টান্তের কথা মনে না পড়ায় মনে মনে রাগিয়া গিয়া বন্ধুরা চুপ করিয়া থাকে।

ক্ষণকাল উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া নিবারণ বলে, "পতিতপাবন খুব হাত-খোলা লোক না-কি?"

রুদ্ধ ক্রোধ প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া বন্ধুরা ঝাঁকিয়া উঠে, "তা নয় ত কি! তুমি ত এক পয়সা না দিয়ে হাঁকিয়ে দিলে, কিন্তু পতিতপাবন আট শ টাকা দিলে ব'লেই ত বিশ্বেশ্বর বাপের শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করতে পারলে।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিবারণ বলে, "আমার কাছে হাজার টাকা চেয়ে পতিতপাবনের কাছে বিশ্বেশ্বর আট শ টাকা চাইলে যে?"

বন্ধুরা বলে, "হাজার টাকাই চেয়েছিল, কিন্তু দিলে ত পতিতপাবন আট শ টাকা। হাজারে আট শয়ে কতই বা তফাৎ বল?"

নিবারণ বলে, "বেশি নয়,—ঠিক যতটা দশ হাতে আর আট হাতে তফাৎ। কিন্তু হাজার চেয়ে আট শ পেয়ে বিশ্বেশ্বর তোমাদের কাছে হেসে হেসে বলে নি ত, একেই বলে দিষ্টিকেশ্চন,—আর তোমরা সেই কারণে পতিতপাবনের নাম দাও নি ত আট-শ চৌধুরী?"

বন্ধুরা রাগিয়া বলে, "আচ্ছা ছোট মন ত তোমার! আট শ টাকায় আর আট-হাতি কাপড়ে তুলনা কর তুমি!"

বন্ধুদের মধ্যে একজন বলে, "বলিহারি যাই তোমার নিবারণ! দিলে না ত এক পয়সা, অথচ বিশ্বেশ্বরের বাপের শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন গিয়ে খেয়ে এলে চেটেপুটে। লোকে বলে—সন্দেশ খেয়েছিলে গোটা দশেক, আর দই সিকি হাড়িটাক।"

নিবারণ বলে, "ঠিকই বলে লোকে। কি করি বল ভাই, টাকা না দিয়ে ত [illegible] দিলাম পয়লা নম্বর আঘাত, তার ওপর নেমন্তন্ন না গিয়ে দোব দোসরা নম্বর! তাই গেলামও নেমন্তন্ন, খেয়েও এলাম

চেটেপুটে। তা ছাড়া, দইটা আর সন্দেশটা বিশ্বেশ্বর যদি পয়লা নম্বরের সরেস করে, তা হ'লে অপরাধ আমার কোথায় বল ?"

বন্ধুরা বলে, "ছেলেরা ঠিক করেছিল, হাত ধ'রে তোমাকে পংক্তি থেকে তুলে দেবে। পতিতপাবন সত্যিই তোমার প্রকৃত বন্ধু, সে উপস্থিত ছিল ব'লেই অপমানের হাত থেকে সেবার তুমি রক্ষে পেয়েছিলে।"

বন্ধুদের এ কথাটা কিন্তু একটুও অসত্য নহে। নিবারণের পাঁচ-সাত জন তথাকথিত বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে একমাত্র পতিতপাবনই যথার্থ বন্ধুপদবাচ্য হইবার যোগ্য। কথায়-বার্তায় উল্লেখে-আচরণে অবজ্ঞা অথবা অশ্রদ্ধা ত নহেই, বরং নিবারণের প্রতি তাহার একটু বিশেষ সহানুভূতি, এমন কি সুস্পষ্ট অনুরাগই দেখা যাইত ; এবং নিবারণের সঞ্চয়-প্রবৃত্তি ও কৃপণ স্বভাবের প্রসঙ্গ তুলিয়া কখনও তাহাকে অকরুণ বিদ্রূপ অথবা নিষ্ঠুর মন্তব্য করিতে শুনা যাইত না,—যদিও অপর বন্ধুদের তুলনায় নিবারণের কৃপণতার পরিচয় পাইবার সুযোগ তাহার অনেক বেশিই হইত।

সকালের দিকে সকলেই পারতপক্ষে নিবারণকে সর্বতোভাবে এড়াইয়া চলে ; সহজে কেহও তাহার নাম লয় না অথবা মুখদর্শন করে না। ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় শুধু পতিতপাবনের বেলায়। প্রতিদিন সকালে সে নিয়মিত আসিয়া নিবারণের বৈঠকখানায় জীর্ণ তক্তাপোশের উপর পাতা ততোধিক জীর্ণ শতরঞ্চির উপর বসে ; তাহার পর যে-বিস্কুট পয়সায় দুইখানা করিয়া পাওয়া যায়, তাহারই একখানার সহিত অদ্ভুতরকম কম চিনি ও দুগ্ধে প্রস্তুত এক পেয়ালা অত্যাশ্চর্য ফিকা চা পান করিয়া নিবারণের সহিত প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়ে। পাড়ার লোকে দেখিয়া বলে, যে রকমেই হোক, পতিতপাবন নিবারণকে পরিপাক করেছে ; নীলাই বল আর নিবারণই বল সকলের ধাতে সহ্য হয় না।

পথে বাহির হইয়া নিবারণ বলে, "চা জিনিসটা যে খুব উপকারী তাতে আর সন্দেহ নেই।"

সন্তপ্ত নিঃসার গরম জলকে মনে মনে ধিক্কার দিয়া পতিতপাবন বলে, "আর, বেশ উত্তেজক।"

নিবারণ বলে, "শুধু উত্তেজকই নয়, বলবর্ধকও চমৎকার। এই যে একখানা বিস্কুট দিয়ে এক পেয়ালা ক'রে চা খাওয়া গেল—ব্যস্, একেবারে বেলা বারোটা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত, ক্ষিধের নামগন্ধ থাকবে না। ক্ষিধে না থাকার মানেই ত ভরা পেট,—আর, ভরা পেট যে বলবৃদ্ধির কারণ, তা কে অস্বীকার করবে বল ?"

মৃদুকণ্ঠে পতিতপাবন বলে, "অকাট্য।"

পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ একদিন নিবারণ বলে, "পথ দেখে চল পতিতপাবন।"

এ-পাশ ও-পাশ, আগে-পিছে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া পতিতপাবন বলে, "কেন, ঠিকই ত চলছি।"

নিবারণ বলে, "ঠিক চলছ না ভাই, আমার পিছনে পিছনে চল, তা হ'লে ঠিক চলবে। দেখছ না সামনে পথের ধারে বিশ-পঁচিশ হাত ঘাস গজিয়েছে। ঘাসের ওপর দিয়ে চললে তবু জুতো জোড়া, কিছু না হোক, আধপয়সাটাক ক্ষয়ের হাত থেকেও বাঁচবে।"

"তা বটে।"—বলিয়া পতিতপাবন নিজের গতিপথ হইতে সরিয়া আসিয়া নিবারণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলে।

নিবারণ বলে, "জুতো যদি বাঁচাতে চাও পতিতপাবন, তা হ'লে কাঁচা পথ পেলে পাকা রাস্তা দিয়ে চলবে না, আর ঘাস পেলে কাঁচা পথ মাড়াবে না।"

পতিতপাবনের অন্তরের গভীর প্রদেশ হইতে কেহ যেন বলিয়া উঠে, আর, কিছু ধ'রে ঝুলে যাবার সুবিধা পেলে ঘাসের উপর দিয়ে চলবে না। কিন্তু অন্তরের সে কথা অন্তরেই চাপিয়া রাখিয়া সে বলে, "ঠিক।"

জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি। চিৎপুর রোড দিয়া প্রাতর্ভ্রমণ করিতে করিতে দুই বন্ধু নতুন বাজারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ফুটপাথের উপর বসিয়া এক ব্যক্তি পয়সায় তিনটা করিয়া কাগজি নেবু বিক্রয় করিতেছিল। সদ্য-আহৃত উৎকৃষ্ট জাতের তাজা নেবুর গন্ধে সেখানকার বায়ুমণ্ডল সুরভিত হইয়া আছে।

পতিতপাবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু কণ্ঠে নিবারণ বলে, "খাসা নেবু পতিতপাবন, পয়লা কোয়ালিটির, একেবারে টাটকা—বোঁটা এখনও শুকোয় নি, সাদা রয়েছে। সস্তাও যথেষ্ট। বল কি,

আজকালকার দিনে এত বড় বড় নেবু পয়সায় তিনটে ক'রে! একটা হলে একটা পরিবারের এক বেলা চ'লে যায়।"

পতিতপাবন বলে, "কিনবে না-কি কিছু?"

পরম নিশ্চিন্ততার হাসি মুখে ফুটাইয়া নিবারণ বলে, "সে দুষ্কর্মটি করবার কোনো উপায়ই সঙ্গে রাখি নি ভায়া। টাকা পয়সা ত দূরের কথা, একমাত্র সেলাই ছাড়া পকেটে একখানা ছেঁড়া রুমাল পর্যন্ত খুঁজে পাবে না।"

পতিতপাবনের মনের গভীর-প্রদেশ-নিবাসী প্রাণী বলে, ছেঁড়া রুমাল খুঁজে না পাবার একমাত্র কারণ, নূতন রুমাল কোনোদিন কেনা হয় নি। প্রকাশ্যে বলে, "আমার কাছে পয়সা আছে, কিনবে ত কেনো না।"

পতিতপাবনের কথা শুনিয়া নিমেষের মধ্যে নিবারণের মুখে উৎকট বিস্ময়ের চিহ্ন দেখা দেয়। ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এক মুহূর্ত পতিতপাবনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলে, "তোমার কাছে পয়সা আছে? তার মানে? পয়সা নিয়ে বেরিয়েছ কেন বল দেখি?"

পতিতপাবন বলে, "কোনো দরকারে নয়, এমনি। বাড়ি থেকে বেরোলে মনিব্যাগটা সঙ্গে নিয়েই বেরুই।"

নিবারণের দুই চক্ষে অসন্তোষের তিরস্কার প্রকাশ পায়; মাথা নাড়িয়া সে বলে, "না না, পতিতপাবন, এ অভ্যেস একেবারেই ভাল নয়।—এ বদ্ অভ্যেস থেকে তোমাকে রেহাই পেতেই হবে। সঙ্গে মনিব্যাগ থাকলে কত রকম অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকে তা একবার ভেবে দেখেছ কি? অন্তত গোটা তিনেক এখনি তোমাকে ব'লে দিতে পারি। প্রথমত, পিকপকেট যদি হয় তা হ'লে ত ষোল আনাই গেল, মায় মনিব্যাগটা পর্যন্ত। দ্বিতীয় অনিষ্ট অপব্যয়, যা আমাদের হাতে হাতে এখনি হ'তে চলেছে। পয়সা যখন তোমার কাছে রয়েছে তখন এক পয়সার নেবু কিনতেই হ'ল দেখছি। তার ওপর, তুমিও যদি এক পয়সার কেনো তা হ'লে এই দুটো পয়সা অনর্থক অপব্যয় ছাড়া আর কি বলবে? আমরা ত আর পেটের অসুখের ঠেলায় নেবু কিনতে বেরুই নি যে, সস্তা আর তাজা নেবু পেয়ে খুশি হওয়া যাবে। তারপর তৃতীয় অনিষ্ট হচ্ছে ট্রাম। বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হয়েছ, ট্রাম দেখে উঠে পড়লে, ব্যস্, একেবারে এক ধাক্কায় তিন-তিনটে পয়সা গাঁট থেকে

খসল। কিন্তু গাঁট যদি মূলেই হাবাত হয় তা হ'লে খসবে কি আর বল,—হেঁটে বাড়ি ফিরতে বাধ্য হবে তুমি। তারপর ধর, কথার কথা বলছি, বাড়ি পৌঁছে তেমনই যদি ক্লান্তি বোধ করলে, তা হ'লে এক পয়সার বাতাসা কিনে গোটা দুয়েক মুখে ফেলে চিবিয়ে এক ঘটি কুঁজোর-জল খাও, ব্যস্, একেবারে ঠাণ্ডা! অথচ বেঁচে গেল দু-দুটো পয়সা, আর বেশ কতকগুলো বাতাসা। কেমন, ঠিক বলছি কি-না?"

নেবুর ডালার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া পতিতপাবন বলে, "ঠিক বলছ।"

পতিতপাবনের নিকট কর্জ লইয়া নিবারণ এক পয়সার নেবু কেনে। দুই পয়সায় সাতটা নেবু পাইবার জন্য পতিতপাবন নেবুওয়ালার সহিত দরাদরি করিতেছে দেখিয়া নিবারণ মৃদুকণ্ঠে বলে, "ভুল করছ পতিতপাবন, এক পয়সায় তিনটের জায়গায় দু পয়সায় সাতটা নেবু পেলে সস্তা হবে ব'লে যে তোমার ধারণা, সেটা নিতান্তই ভুল। অদরকারি জিনিসের সস্তা-আক্রা নেই,—তার সবই আক্রা, আক্রা ত আক্রাই, সস্তাও আক্রা। তুমি যে মনে করছ দু পয়সায় সাতটা নেবু পেলে সপ্তম নেবুটা হবে তোমার অতিরিক্ত লাভ,—ঐখানে আসলে গলদ। সপ্তম নেবুটা লাভ ত নয়ই, বরং সর্বনাশের অর্থাৎ লোকসানের মূল। ঐ সপ্তম নেবুর লোভেই তোমার দ্বিতীয় পয়সাটা খসাচ্ছ; আর দ্বিতীয় পয়সায় চারটে নেবুর ব্যাপারে চারটে নেবু হচ্ছে অদরকারি জিনিস, আর পয়সাটা দরকারি। পয়সা হচ্ছে অক্ষর বস্তু,—তার ক্ষরণ নেই। এক পয়সা মানে সব সময়েই এক আনার এক-চতুর্থাংশ,—এক টাকার এক-চৌষট্টি অংশ। তিনটে নেবু কিন্তু সব সময়েই এক টাকার এক-চৌষট্টি অংশ নয়। কেমন, ঠিক কি-না?"

পতিতপাবন বলে, "ঠিক।"

"সুতরাং—"

"সুতরাং এক পয়সারই কিনি।"—বলিয়া পতিতপাবন আলোচনা সংক্ষেপ করে।

নেবু কিনিয়া গৃহাভিমুখ হইয়া নিবারণ বলে, "পয়সা জমানোর মূল মন্ত্র জান পতিতপাবন?"

ঘাড় নাড়িয়া পতিতপাবন বলে, "না। কি বল ত?"

"মাত্র তিনটি কথায় মন্ত্র শেষ,—করব না খরচ। নিতান্ত যে বিষয়টা তোমার হাত মুচড়ে খরচ করিয়ে নেবে তা ছাড়া 'করব না খরচ' পণ ক'রে চেপে যদি বসতে পার পতিতপাবন, তা হ'লে দেখবে, পয়সা আনা হচ্ছে, আনা টাকা হচ্ছে, টাকা নোট হচ্ছে, আর নোট ব্যাঙ্কে গিয়ে জমা হ'য়ে হ'য়ে জমার অঙ্ক ফুলিয়ে তুলছে। তিল তাল হবার এমন চমৎকার দৃশ্য তোমাদের কোনো বায়োস্কোপে কখনো দেখেছ ?"

পতিতপাবন বলে, "মনে ত পড়ে না।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া পড়িয়াছিল, বিপরীত দিক হইতে একটা সোলার টিয়াপাখী হাতে করিয়া এক ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহাকে দেখাইয়া নিবারণ বলে, "ঐ দেখ পতিতপাবন, সঙ্গে মনিব্যাগ থাকার কুফলের একটা দৃষ্টান্ত সামনের ঐ লোকটি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে। ইচ্ছে যদি হয় ওকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখতে পার তুমি। কিন্তু আমি হলফ ক'রে বলতে পারি, পাখী কেনবার মতলব নিয়ে বাড়ি থেকে ও বেরোয় নি, পথ চলতে চলতে দেখতে পেয়ে লোভে প'ড়ে কিনেছে। তবে এইটুকু রক্ষে, আসল পাখা না কিনে সোলার পাখী কিনেছে ব'লে ছোলার খরচা বেঁচে গিয়েছে। সেদিক থেকে ওর বিবেচনার খানিকটা তারিফ করা যেতে পারে।"

এই হচ্ছে বাগবাজারের বহুনামখ্যাত নিবারণ বাঁড়ুজ্যে। এবং ইহার সহিত প্রতিদিবস পতিতপাবন চৌধুরীকে একত্রে দেখা যায় বলিয়া পাড়ার লোকে বলে—নীলাই বল আর নিবারণই বল, সকলের ধাতে সব জিনিস ঠিক সহ্য হয় না।

মাস ছয়েক হইল বিশ্বেশ্বর লাহিড়ীর পিতার শ্রাদ্ধ হইয়া গিয়াছে,—এবং তদুপলক্ষে নিবারণের বিরুদ্ধে পাড়ার লোকের মনে যে ক্রোধ ও বিদ্বেষ উদ্রিক্ত হইয়াছিল এতদিনে তাহা অনেকটা হ্রাস পাইয়াছে।

শ্রাবণ মাস,—সকাল হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়া বৈকালের দিকে একটু ধরণ করিয়াছে। নিবারণ বাঁড়ুজ্যে তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া একটা বহুপুরাতন জীর্ণ শঙ্খ-সংহিতায় পাতা উল্টাইতেছিল, এমন সময়ে ছাতা বন্ধ করিয়া প্রবেশ করিল রাখালরাজ ভট্টাচার্য।

রাখালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনুৎসুক কণ্ঠে নিবারণ বলিল, "এস রাখাল, ব'স।"

শতছিদ্র শতরঞ্জির কয়েকটা ছিদ্র আবৃত করিয়া বসিয়া রাখাল বলিল, "ভাল আছ নিবারণ?"

শঙ্খ-সংহিতাখানা সুতা দিয়া বাঁধিতে বাঁধিতে নিবারণ বলিল, "ভালই ত থাকতে চাই ভাই, কিন্তু লোকে দেয় কই থাকতে?"

শুনিয়া রাখালের মুখ শুকাইল। ভয় হইল, যে উদ্দেশ্য লইয়া সে নিবারণের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে তাহা ব্যক্ত হইবার পর, যাহারা নিবারণকে ভাল থাকিতে দেয় না, সে নিজেও না সেই লোক-শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়!

একটা সেল্‌ফের উপর শঙ্খ-সংহিতা তুলিয়া রাখিয়া নিবারণ বলিল, "তারপর? একটু চা খাবে না-কি রাখাল?—না, দরকার নেই?"

যে অনুরোধের বক্ষের উপর এতখানি ঔদাস্য বিরাজ করিতেছে তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতে যে-পরিমাণ চক্ষুলজ্জাহীনতার প্রয়োজন, রাখালের বোধ করি তাহার কিছু অভাব ছিল; অথবা একটা অসামান্য বিষয় লইয়া এখনি যাহাকে একটু উত্ত্যক্তই করিতে হইবে, সামান্য বিষয় সম্পর্কে তাহার মনের স্থৈর্যকে অক্ষুব্ধ রাখাই সমীচীন মনে করিয়া সে বলিল, "না না, চায়ের কোনো দরকার নেই।"

নিবারণ বলিল, "তা হ'লে থাক্। আর, জিনিসটাও এমন কিছু ভাল নয় যে, জোর ক'রে খাওয়াতেই হবে।" কিন্তু চা ছাড়াও এমন জিনিস দুষ্প্রাপ্য নহে যাহা জোর করিয়া খাওয়াইতে পারা যায়, অন্তত বাগবাজারেরই বিশেষ করিয়া তেমন একটা সরস বস্তুর খ্যাতি আছে, সে কথা অনুক্ত রহিয়া গেল।

দুই-চার মিনিট সাধারণ আলাপ-আলোচনার পর, রাখালরাজ আসল কথার অবতারণা করিল; বলিল, "বড় বিপদে প'ড়ে তোমার কাছে এসেছি ভাই নিবারণ।"

নিষ্কৌতূহলের অলস কণ্ঠে নিবারণ বলিল, "কি বল?"

রাখালরাজের মুখে-চক্ষে গভীর দুঃখের করুণ ছায়া দেখা দিল; বলিল, "মেয়েটার বয়েস উনত্রিশ বচ্ছর পার হ'য়ে গেছে, অথচ কিছুতে পাত্র জোটাতে পারছিলাম না ভাই। অবশেষে এক জায়গায় কথা স্থির করেছি। তুমি যদি নিবারণ, হাজার দুয়েক টাকা কর্জ দাও তা হ'লে এই মহা বিপদ থেকে উদ্ধার হই।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিবারণ বলিল, "বিপদ ত তা হ'লে দেখছি আমার। তুমি কি তোমার নিজের বিপদ আমার কাঁধে চাপিয়ে দিতে এসেছ রাখালরাজ?"

রাখাল বলিল, "কি করি বল ভাই, তোমার কাঁধ শক্ত কাঁধ—লক্ষ্মীর বরপুত্র তুমি।"

নিবারণ বলিল, "লক্ষ্মীর বরপুত্র কি-না জানি নে, কিন্তু তর্কের খাতিরে তোমার কথা যদি মেনেই নিই, তা হ'লে নিশ্চয় জেনো বরপুত্র হয়েছি টাকা জমিয়ে জমিয়ে, প্রতিবেশীর মেয়ের বিয়েতে টাকা নষ্ট ক'রে ক'রে নয়। এখন থেকে যদি সেই কার্য আরম্ভ করি, তা হ'লে লক্ষ্মী আর বর না দিয়ে শাপ দিতে আরম্ভ করবেন।"

রাখাল বলিল, "না, কখনো করবেন না। ভগবানের কৃপায় তোমার টাকা আছে, তুমি দেবে না কেন নিবারণ?"

নিবারণ বলিল, "কি গেরো! থাকলেই দিতে হয় তা তোমাকে কে বললে? ভগবানের কৃপায় তোমারও ত গর্দান আছে, তাই ব'লে কেউ চাইলেই তা দিতে হবে না-কি?"

"বাজে কথা ব'লে এড়িয়ে গেলে চলবে না ভাই।"—বলিয়া রাখাল বহুক্ষণ ধরিয়া বিস্তর অনুনয়-বিনয় অনুরোধ-উপরোধ করিল, এমন কি ভিক্ষাস্বরূপ টাকাটা যাচনা করিতেও ছাড়িল না; কিন্তু ফল হইল না কিছু। অপ্রতিবাদে নিঃশব্দে সকল কথা শুনিয়া নিবারণ বলিল, "টাকা দিতে আমার আপত্তি নেই রাখাল, তুমি যদি প্রমাণের দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পার যে, তোমায় কন্যাদায়ের বিষয়ে কোনো দিক দিয়ে কোনো রকম দায়িত্ব আমার আছে। আচ্ছা, বলতে পার তুমি, তোমার বিয়েতে আমি ঘটকালি করেছিলাম?—বলতে পার, তোমার কন্যার জন্মদান সম্পর্কে কোনো-রকমে আমি তোমাকে উৎসাহিত করেছি?—বাজিতপুরের ষষ্ঠী-গিন্নীর কবচ তোমাকে ধারণ করিয়েছি? খেলাতগঞ্জের বুড়ী ষষ্ঠীর চরণোদক এনে তোমার স্ত্রীকে খাইয়েছি? নিশ্চয় বলতে পার না এসব কথা। তবে? তবে, যে-পাপ আমি করি নি, দু হাজার টাকা খরচ ক'রে আজ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে—এ কথার যুক্তি কোথায় বল?"

"যুক্তি না থাকতে পারে, কিন্তু দয়া থাকতে ত আপত্তি নেই নিবারণ। দয়া ক'রে আমাকে এ টাকাটা দাও।"

"যদি বলি, ছেলের লেখাপড়ার সংস্থান আর মেয়ের বিয়ের খরচের ব্যবস্থা না থাকতে যে-মানুষ ছেলেমেয়ে পয়দা করে সে দয়ার পাত্র নয়, তা হ'লে কি বলবে শুনি?"

এতক্ষণে রাখাল নিঃসংশয়ে বুঝিল যে, নিবারণ এমন একটি পাষাণ, যাহাকে চূর্ণ করিতে পারিলেও এক ফোঁটাও তৈল নিষ্কাশন হইবে না। তাই এ পর্যন্ত মিথ্যা আশার প্রলোভনে যে ধৈর্য সে সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল, সহসা তাহা পরিত্যাগ করিয়া রুষ্ট কণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে বলব, ঐ বাজিতপুরের কবচ ধারণ ক'রে আর বুড়ী ষষ্ঠীর চরণোদক খেয়েও তোমার ছেলেমেয়ে হয় নি ব'লে ছেলেমেয়ের মর্ম তুমি কিছুই বোঝ না। তুমি হচ্ছ একটি শুক্‌নো মরুভূমি। বুঝলে?"

শান্তভাবে নিবারণ বলিল, "বুঝলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আমাকে মরুভূমি জেনেই তুমি এখানে এসেছিলে,—না, এখানে এসে জানলে আমি মরুভূমি? যদি জেনে এসে থাক, তা হ'লে ভুল করেছিলে; আর যদি এসে জেনে থাক, তা হ'লে ভুলটা আর বেশি বাড়িয়ে-চ'লে কোনো ফল নেই।"

তক্তাপোশ ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া রাখাল বলিল, "বুঝেছি, যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা তোমাকে ব'লে যাই। টাকা ত অনেক জমিয়েছ নিবারণ, কিন্তু নিজেও ভোগ করলে না, পরের উপকারেও ছাড়লে না। পরলোকে যাবার সময় তোমার ঐ নিষ্ফল টাকাকড়ি পিঠে বোঁচকা বেঁধে নিয়ে যেও।"

নিবারণ বলিল, "সুবিধে যদি হয় ত নিয়ে যাব, কিন্তু আপাতত পরলোক ছাড়া আর এক লোকে যাবার সুবিধে হয়েছে। সেখানে গেলে ত নিশ্চয়ই নিয়ে যাব। আণবিক বোমার কথা শুনেছ রাখাল?"

কোনো উত্তর না দিয়া প্রজ্বলিত নেত্রে নিবারণের দিকে তাকাইয়া রাখাল অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। মনে মনে বলিল, আণবিক বোমা তোমার মাথায় পড়ুক।

নিবারণ বলিল, "বৈজ্ঞানিকেরা বলছে, আণবিক বোমার দাপট আর কিছু বেশি করতে পারলে তার ঠেলায় চন্দ্রলোকে পৌঁছানো যাবে। চন্দ্রলোকে যদি একান্তই যাই ত টাকাকড়ি নিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই যাব, কারণ শোনা যায় এত ঠাণ্ডা সেখানে যে, কোনো রকম প্রাণীরই অস্তিত্ব

নেই। তবে ভয় হয়, দুটি প্রাণী হয়ত সেখানকার শীতেও কষ্টে-সৃষ্টে জীবন ধারণ ক'রে আছে,—এক কইমাছ, আর দ্বিতীয় কন্যাদায়গ্রস্ত।"

"উচ্ছন্ন যাও তুমি!"—বলিয়া রাখাল সবেগে প্রস্থানোদ্যত হইল।

গভীর কণ্ঠে নিবারণ বলিল, "শোন রাখাল।" কণ্ঠস্বরে আদেশের কাঠিন্য।

রাখাল ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"আমি উচ্ছন্ন যাই আর যেখানেই যাই, তুমি পতিতপাবনের বাড়ি যাও। পতিতপাবন যে পতিতের পাবন তা ত তোমরা সকলেই জান, আর নিবারণ বাঁড়ুজ্যের বাড়ি টাকা ভিক্ষে করতে এসে তুমি যে পতিত হয়েছ তাতে আর সন্দেহ নেই। পতিতপাবনের বাড়ি যাও।"

জ্বলন্ত চক্ষে রাখাল বলিল, "তাই যাব। সত্যিই পতিতপাবন পতিতের পাবন। তবে তার বাড়ি যাবার আগে গঙ্গায় গোটা তিনেক ডুব দিয়ে শুদ্ধ হ'য়ে যাব।"

"গঙ্গায় হাঙর এসেছে রাখাল, সাবধানে ডুব দিও। তবে ভয় নেই, —কন্যাদায়গ্রস্তকে সহজে হাঙরে কাটবে না।"

"যক কোথাকার!"—বলিয়া নিবারণের প্রতি আর এক ঝলক অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ঝড়ের মতো রাখাল নিষ্ক্রান্ত হইল। যাইবার সময়ে এতই রাগিয়া গেল যে, ছাতাটা লইয়া যাইতে পর্যন্ত ভুল করিল। পর-মুহূর্তে ছাতার প্রতি দৃষ্টি পড়ায় তক্তাপোশ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া নিবারণ ছাতা হাতে লইয়া খালি পায়ে দ্রুতবেগে রাখালের প্রতি ধাবিত হইল।—"রাখাল! ছাতা ফেলে গেছ রাখাল। ছাতা, ছাতা!"

শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ছাতা দেখিয়া রাখাল আগাইয়া আসিল।

ছাতা দিতে দিতে নিবারণ বলিল, "মেয়ের বিয়ের দান-সামগ্রী কেনবার সময়ে দেখবে ছাতাটা এমনই দামী জিনিস যে, ভাঙা হ'লেও একাদশী বাঁড়ুজ্যেকে দান করা চলে না।"

ছাতাটা নিবারণের হাত হইতে প্রায় খামচাইয়া কাড়িয়া লইয়া রাখাল চলিয়া গেল।

বৈঠকখানায় ফিরিয়া আসিয়া নিবারণ দেখিল, স্ত্রী সুধাময়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুধাময়ীর বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসর। কিন্তু অটুট স্বাস্থ্যের সুদৃঢ় প্রাকারে আবদ্ধ দুর্মদ যৌবন বয়সের ছাড়পত্র পাইয়াও দেহ হইতে ছাড়ান পায় নাই। বিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর বয়সের যুবকেরাও সুধাময়ীর প্রতি মাত্র একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়াই নিরস্ত হয় না। সঞ্চয়ের দ্বারা নিবারণ যেমন তাহার ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্স বাড়াইয়া গিয়াছে, অনপচয়ের দ্বারা সুধাময়ী ঠিক সেইরূপে তাহার স্বাস্থ্য বাঁচাইয়া আসিয়াছে। আর, সূতিকাগারের অপচয়ই যে স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্বাপেক্ষা অনিষ্টকর অপচয়—এ কথা না বলিলেও চলে।

নিবারণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সুধাময়ী বলিল, "আচ্ছা, অকারণ এই শাপমন্যিগুলো কুড়িয়ে কি লাভ হয় বল ত?"

জিজ্ঞাসু নেত্রে সুধাময়ীর দিকে চাহিয়া নিবারণ বলিল, "শাপমন্যি আবার কে দিলে?"

"কেন, এখনি রাখাল ভট্‌চায সেগুলো দিয়ে গেল না?"

মৃদু হাসিয়া নিবারণ বলিল, "ও, তাই বলছ! ও সাপ হেলে-ঢোঁড়া সাপ—কেউটে-গোখরো নয়,—ওতে বিষ লাগে না।"

"তোমার লাগে না, আমার লাগে।" এক মুহূর্ত কি ভাবিয়া সুধাময়ী বলিল, "দু হাজার টাকাই দেবে ত?"

"তা দিতে হবে বইকি। আজকালকার দিনে মেয়ের বিয়েতে দু হাজার টাকা আবার টাকা! দু হাজারেই কি ক'রে কুলবে তাই ভাবছি। শেষকালে বাড়ি-টাড়ি বাঁধা-টাঁধা দিয়ে আবার জড়িয়ে না পড়ে।"

"পতিতপাবনকে দিয়েই টাকাটা দেওয়াবে ত?"

"নিশ্চয়ই। সোজাসুজি নিজে দিলে আর রক্ষে আছে!—গোটা কলকাতা শহর একেবারে ভেঙে পড়বে। তারপর দেখতে দেখতে সমস্ত টাকাকড়ি লোপাট ক'রে দিয়ে তোমার হাত ধ'রে পথে বেরোতে হবে। কিন্তু এক-এক সময়ে মনে হয় সুধা, তা-ই বোধ হয় ভাল,—লোকের দুঃখকষ্ট দেখে-শুনে আর ব্যাঙ্কে টাকা রাখতে ইচ্ছে করে না। তবে নিতান্তই না-কি কৃপণের স্বভাব, তাই নমাসে-ছমাসে চোখ-কান বুজে কোনো রকমে এক-আধটা কাজ ক'রে ফেলি।...হাসলে যে?"

সুধাময়ী বলিল, "না, এমনি। কিন্তু পতিতপাবনকে দিয়ে দু হাজার টাকা দিলে রাখাল ভট্‌চায ত দু হাজার টাকাই পাবে না, পতিতপাবন

নিজের কমিশন কাটবে। সেবার বিশ্বেশ্বর লাহিড়ীর বাপের শ্রাদ্ধে যেমন ছ্ শ টাকা কেটেছিল।"

যৎপরোনাস্তি সহজ সুরে নিবারণ বলিল, "তা কাটবে বইকি। যে ঝক্কিটা ওকে সামলাতে হয় তাতে ওর কিছু না পোষালে চলবে কেন বল ?"

"কি ঝক্কি সামলাতে হয় শুনি ?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নিবারণ বলিল, "বিষম ঝক্কি। যে টাকাটা ওর হাত দিয়ে আমি দিই, সে টাকা দিয়ে ও ত সহজেই সুনাম উপার্জন করে,—কিন্তু সেই সুনামের ঠেলায় দলে দলে যে সব নতুন প্রার্থী আসে, তাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ওকে কি রকম যে প্রাণান্ত হ'তে হয় তা শুধু ও নিজেই জানে। এক-একটা ঠেলা আসে, আর বেচারাকে গা ঢাকা দিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়।"

"আমার কি মনে হয় জান ?"

"কি মনে হয় ?"

"মনে হয়, কমিশনের আশায় ও সেইসব প্রার্থীদের মধ্যে বেছে বেছে কাউকে কাউকে তোমার কাছে পাঠায়। লাথি-ঝাঁটা খেয়ে কোনো প্রার্থী তোমাকে গাঁথতে পারলেই—ব্যস্, ওর কমিশন লাভ।"

এক মুহূর্তে সুধাময়ীর কথাটা বিবেচনা করিয়া ভাবিয়া দেখিয়া তেমনি সহজ সুরে নিবারণ বলিল, "অসম্ভব নয়। সব ব্যবসারই ত বিশেষ বিশেষ কৌশল আছে,—এ যদি পতিতপাবনের তেমনি একটা কৌশল হয় ত ওকে দোষ দেওয়া যায় না।···হাসছ যে ?"

সুধাময়ী বলিল, "না, এমনি। যাই, তোমার চায়ের জল চড়িয়ে দিই গে।" যাইতে যাইতে মনে মনে বলিল, দুনিয়ার চিড়িয়াখানায় কত বিচিত্র প্রাণীই না আছে, হাসছি সেই কথা ভেবে।

পরদিন সকালে চা পান করিতে করিতে নিবারণ বলিল, "কাল বিকেলে রাখাল ভট্‌চায এসেছিল পতিতপাবন।"

'এক পয়সায় দুখানা' বিস্কুটের একখানার অর্দ্ধে একটু কামড় মারিয়া পতিতপাবন বলিল, "জানি। সন্ধ্যের পর আমার কাছেও গেছল। কি ঠিক করলে ? টাকাটা দেবে না-কি ?"

"বল কি, মেয়ের বয়েস উনত্রিশ বছর পেরিয়ে গেছে, না দিলে চলবে কেন ?"

"দু হাজারই ?"

"চেয়েছে যখন দু হাজার, তখন দু হাজারই দিতে হবে। তা ছাড়া, দু হাজার আর এমনই কি বেশি টাকা বল ? গোটা চারেক গয়না দিতে গেলেই ত শ-আষ্টেক বেরিয়ে যাবে।"

"বেশি।"

"বেশি।"

পরিতৃপ্তিসহকারে এক চুমুক ফিকা চা পান করিয়া নিবারণ বলিল, "কি বলেছ তুমি রাখালরাজকে ?"

"বলেছি, ভেবে দেখব। আজ সন্ধ্যার পর আসতে বলেছি।"

"তা হ'লে যাবার সময়ে টাকাটা নিয়ে যেয়ো,—ওদের হাতে আবার খুব বেশি সময় ত নেই।"

ঈষৎ বিস্মিত কণ্ঠে পতিতপাবন বলিল, "দু হাজার টাকা বাড়িতেই আছে না-কি তোমার ?"

মৃদু হাসিয়া নিবারণ বলিল, "আর বল কেন, ভট্‌চাযের বরাত। পরশু বিকেলে একটা টাকা হাতে এসেছিল। কাল সমস্ত দিন বৃষ্টির জন্যে বেরোবার উপায় ছিল না,—নইলে ব্যাঙ্কে জমা হ'য়েই যেত। আমারও বরাত বলতে হবে।"

"কেন ?"

"ব্যাঙ্ক থেকে টাকাটা বার ক'রে দিতে হ'লে প্রাণটা যতখানি করকর করত, এতে ঠিক ততটা করবে না। বাইরের থেকে এসে বাইরের মাল বাইরেই বেরিয়ে গেল। কিন্তু খবরদার পতিতপাবন, খবরদার ভাই, রাখালরাজ অথবা আর কেউ যেন বিন্দুমাত্র সন্দেহ করতে না পারে যে, টাকাটা তোমার নয়, আমার।"

"সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থেকো।"

"রাখালরাজ ভারি চ'টে গিয়েছে, না ?"

"বেজায়।"

পুলকিত হইয়া নিবারণ বলিল, "কি বলে তবু ?"

ঘাড় নাড়িয়া পতিতপাবন বলিল, "না ভাই, সে কথা আমি বলতে পারব না তোমাকে, এতই বিশ্রী সে কথা।"

মৃদু হাসিয়া নিবারণ বলিল, "এত কাছে কাছে থেকেও চিনলে না

আমাকে পতিতপাবন! আরে, ঐ গালিগালাজের লোভেই ত টাকা-কড়ি দিই আমি,—ঐটেই ত আমার লাভ। কিন্তু সে যাই হোক, দেখো ভাই, বিয়েতে নেমন্তন্নটা যেন আমার না ফসকায়,—রাগ ক'রে রাখালরাজ যেন বাদ না দেয় আমাকে।"

মাথা নাড়া দিয়া পতিতপাবন বলিল, "রামচন্দর! তাই কখনো দিতে পারে! আমি থাকতে তোমার নেমন্তন্ন বাদ পড়বে?"

"না, তাই বলছি, ভাল-মন্দ যা-হোক-দুটো-কিছু চিবিয়ে এসে খানিকটা ত শোধ তোলা চাই।" চা-পান শেষ হইয়া গিয়াছিল; নিবারণ বলিল, "টাকাটা তা হ'লে এনে দিই। অত টাকা সঙ্গে নিয়ে আজ আর মর্নিং ওয়াক্ ক'রে কাজ নেই। সোজা বাড়ি চ'লে গিয়ে সিন্দুকে তুলে ফেলো।"

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া পতিতপাবন বলিল, "বেশ।"

ভিতরের দিকে যাইতে যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া নিবারণ বলিল, "একটু কিন্তু অসুবিধে আছে পতিতপাবন।"

"কি অসুবিধে?"

"দু হাজার টাকা দুখানা নোটে আছে।"

"তাতে আর অসুবিধে কি?"

"একখানা নোট ত তোমাকে ভাঙাতে হবে ভায়া!"

নিবারণের কথা শুনিয়া পতিতপাবনের মুখখানা নিমেষের জন্য লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু পর-মুহূর্তেই পুনরায় স্বাভাবিক বর্ণে ফিরাইয়া আনিয়া সে বলিল, "না, অসুবিধে হবে না।"

টাকা লইয়া পতিতপাবন প্রস্থান করিলে সুধাময়ী বলিল, "কমিশন কাটবার কথাটা ত বেশ ভাল ক'রেই ওকে ব'লে দিলে!"

নিবারণ বলিল, "না ব'লে দিলেও যে-জিনিসটা ও নিশ্চয় কাটবে, সেটা কাটতে ব'লে দিলে, আর কিছু না হোক, মনটা হালকা থাকে সুধা।"

"আচ্ছা, টাকা ত দিলে রাখাল ভট্চাযকে; লুকিয়ে দিলে, তারও না হয় মানে বুঝলাম; কিন্তু কাল বিকেলে রাখালকে অনর্থক অত কঠিন কথা বললে কেন বল দেখি?"

স্মিতমুখে নিবারণ বলিল, "অনর্থক নয় সুধা, আমার অর্থের ঐটুকুই ত ফিরতি পাওনা। রাখাল টাকা পাবে, অথচ কঠিন কথা পাবে না?—

ফুল পাবে, কাঁটা পাবে না? যাকে টাকা দিই নে তাকে ত কঠিন কথা বলি নে সুধা। তাকে ত বাপু-বাছা ব'লে জোড় হাত ক'রে পিঠে হাত দিয়ে বার ক'রে দিই।"

"বিয়েতে নেমন্তন্ন যাবে?"

"নিশ্চয়ই যাব।"

"খাবে?"

"নিশ্চয়ই খাব।...হাসছ যে?"

সুধাময়ী বলিল, "না, এমনি।"

নিবারণের কিন্তু যেই কথা সেই কাজ। যথাদিবসে পরম উৎসাহভরে বিবাহ-গৃহে সে উপস্থিত হইল। কিন্তু একমাত্র পতিতপাবন ভিন্ন অভ্যর্থনা তাহাকে কেহ করিল না। সকলেরই মুখে চক্ষে নিঃশব্দ কিন্তু সুস্পষ্ট অবজ্ঞার ঔদাসীন্য। এমন কি রাখালরাজের সহিত দেখা হইলে একটা সংক্ষিপ্ত নীরস 'এই যে'র অতিরিক্ত নিতান্ত সাধারণ 'এস, ব'স'ও তাহার অদৃষ্টে জুটিল না।

নিবারণকে এক দিকে টানিয়া লইয়া গিয়া পতিতপাবন জনান্তিকে বলিল, "আজ ভারি ডামাডোল নিবারণ।"

উৎসুক কণ্ঠে নিবারণ বলিল, "কি রকম?"

"বিষম উত্তেজনা আজ। ছেলের দল তোমার নামে ছড়া তৈরি করেছে। বড়দেরও মতলব ছিল কোনো উপায়ে তোমাকে কিছু অপমানিত করা। আমি বলেছি, কোনো রকম তোমার অপমান হ'লে জলস্পর্শ করব না এ বাড়িতে, তাই থমথমিয়ে আছে। তবু আমি সাহস করি নে ভাই, পংক্তিতে তোমাকে বসাতে।"

"তা হ'লে?"—নিবারণের মুখে উৎকণ্ঠার ছায়া বিস্তার করিল।

পতিতপাবন বলিল, "সে ভয় নেই তোমার। আলাদা বসিয়ে তোমাকে খাইয়ে দিচ্ছি।"

"তাই দাও। কিন্তু দেখো ভাই, কোনো পদ যেন বাদ-টাদ না পড়ে!"

পতিতপাবন বলিল, "না, তা পড়বে না।"

পাশের দিকের একটা ছোট ঘরে পতিতপাবন নিবারণকে খাওয়াইতে বসাইল। খাওয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে এমন সময়ে

রাখালরাজ, বোধ করি পতিতপাবনেরই পূর্ব নির্দেশক্রমে, একবার তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর পতিতপাবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "সব পড়ছে ত পতিতপাবন?"

উত্তর দিল নিবারণ; প্রসন্ন মুখে বলিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, সব পড়ছে রাখাল, জিনিসপত্র চমৎকার হয়েছে ভাই, তার মধ্যে এই কড়াপাকের সন্দেশের আর তুলনা নেই। আশীর্বাদ করি, তোমার মেয়ে-জামাইয়ের ভবিষ্যৎ জীবন এই কড়াপাক সন্দেশেরই মতো সরস হোক।"

উত্তরে কিছু না বলিয়া রাখাল প্রস্থান করিল।

আহারের পর আঁচাইয়া লইয়া নিবারণ বলিল, "পতিতপাবন, পান?"

পান আনাইয়া দিয়া পতিতপাবন বলিল, "চল, তোমাকে একটু এগিয়ে দিয়ে আসি।"

"চল।"

নিবারণ যখন গৃহে প্রবেশ করিল, তখন তাহার ঘড়িতে নয়টা বাজিতেছে।

সুধাময়ী বলিল, "বিয়ে হ'য়ে গেল?"

নিবারণ বলিল, "এখন বরই আসে নি তা বিয়ে হবে কি? দুটো রাত্রে লগ্ন।"

"খেয়ে এলে?"

"এলুম বইকি। চমৎকার আয়োজন করেছে রাখাল। তার মধ্যে কড়াপাকের সন্দেশটা এমন সরেস করেছে যে, ইচ্ছে হচ্ছিল গোটাচারেক তোমার জন্যে পকেটে ক'রে নিয়ে আসি। কিন্তু কিছু দূরে ব'সে এক ছোকরা কড়াপাকের চেয়েও কড়া নজরে এমন পাহারা দিচ্ছিল যে, সাহস করলাম না পকেটে পুরতে।"

সন্দেশ আনিবার কথাটা নিছক পরিহাস জানিয়া সুধাময়ী কোনো উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিল; মনে মনে বলিল, পকেটে ক'রে সন্দেশ আন নি তার জন্যে দুঃখ করি নে, জুতোয় ক'রে ধুলোটুকু যা এনেছ তাই মাথায় দিয়ে খুশি হব।

কেউ কম নয়

১

১৩৫৩ সালের হেমন্ত কাল।

মৌজা বালুপট্টি ছাপরা জেলার কোনো নিভৃত অঞ্চলের একটি গ্রাম। নিকটতম রেল-স্টেশন অথবা রাজপথ থেকে দূরত্ব খুব বেশি না হ'লেও যানবাহনের উপযোগী পথের অভাব বশত স্থানটা সুগম নয়।

কিছুকাল পূর্বে সূর্য অস্তমিত হয়েছে। হিমধূসর সন্ধ্যার অস্পষ্টতার আবরণে সমস্ত গ্রাম আবৃত। তদুপরি গৃহচুল্লিনির্গত ধূমরাশি অলস-মন্থর বায়ুতে ভূমি পর্যন্ত বিলম্বিত হ'য়ে সেই অস্পষ্টতাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

গ্রামের একেবারে পূর্ব-সীমান্তে দেওনন্দন সিং-এর গৃহ। দেওনন্দন বালুপট্টির একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। একমাত্র তার স্ত্রী মোসম্মাত জান্‌কী ভিন্ন তখন আর বড় কেহ গৃহে উপস্থিত ছিল না। গ্রামের মাতব্বর অধিবাসী জগন্নাথ ঝার বহির্বাটীর বিস্তৃত অঙ্গনে প্রকাশ্য পরামর্শ-সভায় সমস্ত মরদেরা সমবেত হয়েছে।

মশা তাড়াবার জন্য গোয়ালে ধোঁয়া দিয়ে বেরিয়ে আসবার সময়ে হঠাৎ জান্‌কীর মনে হ'ল, অদূরে বিচুলি রাখবার ঘরে দুই ব্যক্তি যেন দ্রুতপদে প্রবেশ করলে। অগ্নিপাত্রটা রাখবার জন্য গৃহমধ্যে প্রবেশ ক'রে শয়ন-কক্ষ থেকে একটা কোনো বস্তু বস্ত্রমধ্যে লুকিয়ে নিয়ে পর-মুহূর্তেই সে বেরিয়ে এল; তারপর বিচুলি-ঘরের দ্বারের সম্মুখে উপনীত হ'য়ে বললে, "ঘরে কে আছ, বেরিয়ে এস।"

জান্‌কীর আদেশের উত্তরে কেহ সাড়াও দিলে না, অথবা বেরিয়েও এল না।

পুনরায় দৃঢ়স্বরে জান্‌কী বললে, "শিগগির বেরিয়ে এস। আমি একটু আগে তোমাদের দেখতে পেয়েছি। এখনো তোমাদের চাপা কথা শুনতে পাচ্ছি। লুকিয়ে থেকে কোনো লাভ নেই।"

অগত্যা এবার বেরিয়ে এল বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সের একটি মেয়ে এবং তার পশ্চাতে দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ এক যুবক। মেয়েটির পরিধানে রঙিন ছাপা শাড়ি, যুবকের মাথায় খদ্দরের গান্ধী-টুপি।

জানকী জিজ্ঞাসা করলে, "কে তোমরা?"

মেয়েটি বললে, "আমরা রঘুনাথপুরের যাত্রী—মুসাফির।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে জানকী বললে, "মুসাফির ত এখানে কেন? মুসাফিরের জন্যে এর চেয়ে ভাল ঘর আমাদের আছে।"

একবার বিচুলি-ঘরের দিকে ফিরে তাকিয়ে মেয়েটি বললে, "কেন, এ ঘরও ত আমাদের পক্ষে মন্দ নয়। একটু বিচুলি বিছিয়ে নিয়ে তার ওপর আশ্রয় গ্রহণ করলে কয়েক ঘণ্টা বেশ আরামে কাটিয়ে দেওয়া যাবে। রাত্রে কিরণ ওঠবার দু-তিন ঘণ্টা আগে আমরা রওনা হব। জানেন ত দিনকাল ভাল নয়, রাত থাকতে থাকতে আমরা রঘুনাথপুরে পৌঁছতে চাই। আপনি দয়া ক'রে এই ঘরে কিছুক্ষণ কাটাতে আমাদের অনুমতি দিন। বড় ক্লান্ত হ'য়ে আছি, একটু শুয়ে পড়ি; কেমন? শেষরাত্রে আমরা চ'লে যাব,—সে সময়ে আপনাদের আর ঘুম ভাঙাতে চাই নে। কি বলেন? হুকুম পেলাম ত?"

জানকী এতক্ষণ তীক্ষ্ণ নেত্রে উভয়ের বেশ-ভূষা পর্যবেক্ষণ করছিল; মেয়েটির দিকে তীব্র দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "তোমার নাম কি?"

স্খলিত কণ্ঠে মেয়েটি বললে, "আমার নাম? আমার নাম যমুনা-কুমারী।"

"যমুনাকুমারী? তা হ'লে ত হিন্দু!"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে মেয়েটি কাতর কণ্ঠে বললে, "শরীর এমন অবশ হ'য়ে রয়েছে যে, দাঁড়াতে পারছি নে। একটু শুয়ে পড়ি, কেমন?"

জানকী বললে, "শোবে বইকি, কিন্তু তার আগে তোমার সঙ্গে গোটা কতক কথা শেষ ক'রে নিই।"

মেয়েটির মুখ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে উঠল; বললে, "কি কথা?"

"তোমার সঙ্গীটি কে? স্বামী?"

"হ্যাঁ।"

"তা হ'লে ত তুমি সধবা। এগিয়ে এস ত দেখি, লাল না মেটে, কোন্ রঙের সিঁদুর তুমি সীঁতেয় ব্যবহার কর।"

এই কথা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এমন বিস্মিত-দ্রুত গতিতে একটা ঘটনা ঘ'টে গেল যে, মনে হ'ল, যেন কোনো কল্পিত নাটকের অভিনয়ের হিসাবেই তা সম্ভব হ'তে পেরেছে। দেখা গেল, সেই যুবক এবং জান্‌কী উভয়েরই হাতে দুটো ভীষণ রক্তপায়ী বৃহৎ ছোরা যুগপৎ ঝক্‌মকিয়ে উঠেছে। কার ছোরা প্রথম আস্ফালিত হয়েছে,—যুবকের, না, জান্‌কীর—তা যেন ঠিক বোঝাই গেল না।

অগ্নিকণার মতো জান্‌কীর চোখ দুটো ঝল্‌সে উঠল; তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বললে, "খবরদার, এগিয়েছ কি মরেছ! আমাকে মেরে দুজনে পালাবে, সে স্বপ্ন না দেখলেও পার। মরি ত দুজনেই মরব।"

এই অতর্কিত অবস্থার উদ্ভবে মেয়েটি ভয়ে এবং দুশ্চিন্তায় বিহ্বল হ'য়ে গিয়েছিল; দু হাত দিয়ে তার স্বামীকে ঠেলে খানিকটা পিছিয়ে দিয়ে তিক্ত কণ্ঠে বললে, "ছি, ছি, এমন ছেলেমানুষ তুমি! এ কি তোমার ব্যবহার?" তারপর জান্‌কীর দিকে ফিরে অশ্রুপূর্ণ চক্ষে বললে, "আমরা অপরাধ করেছি, আপনি ক্ষমা করুন। আর, ক্ষমা যদি না করেন তা হ'লে আমার বুকেই আপনার ছোরাটা বসিয়ে দিয়ে আমাকেই প্রথমে শাস্তি দিন।" ব'লে জান্‌কীর দিকে খানিকটা এগিয়ে এল।

কতকটা শান্ত কণ্ঠে জান্‌কী বললে, "কি তোমার নাম?"

"আমার নাম জেহেনারা।"

"তোমার স্বামীর?"

"আবদুল রসীদ।" তারপর সহসা নতজানু হ'য়ে জান্‌কীর দু পা জড়িয়ে ধ'রে সাশ্রুনেত্রে বললে, "দোহাই আপনার! আমার স্বামীকে আপনি বাঁচান। আমি আপনার শরণাগত হ'য়ে আত্মসমর্পণ করছি।"

হাত ধ'রে জেহেনারাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে জান্‌কী বললে, "আত্মসমর্পণ যদি করছ, তা হ'লে অস্ত্র সমর্পণ কর। তোমার স্বামীর ছোরা আমার কাছে জমা ক'রে দাও।"

"এক্ষুনি।" ব'লে জেহেনারা তার স্বামীর অনিচ্ছুক-মুষ্টি থেকে ছোরাখানা কতকটা ছিনিয়ে নিয়ে জান্‌কীর হাতে দিয়ে বললে, "আমার স্বামীর জান্ বাঁচবে ত?"

জান্‌কী বললে, "তোমার স্বামীকে যখন অস্ত্রহীন করলাম, তখন আর এ প্রশ্ন করছ কেন ?" তারপর আবদুল রসীদের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আপনার ভয় নেই রসীদ সাহেব, যাবার সময়ে আপনি আপনার অস্ত্র ফেরত পাবেন।"

এবার দু-চার পা এগিয়ে এসে নত হ'য়ে জান্‌কীকে সেলাম ক'রে রসীদ বললে, "আপনার মেহেরবানি বিবি সাহেব। কিছু পূর্বে আমি যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলাম তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি।"

জান্‌কী বললে, "কোথায় যাবেন আপনারা ?—রঘুনাথপুরে নিশ্চয়ই নয় ?"

"আজ্ঞে না। আমরা যাব করিমগঞ্জে। সেখান থেকে সুবিধে মতো রেল ধ'রে ছাপরা যাবার ইচ্ছে।"

"আসছেন কোথা থেকে ?"

"পিপরিহা থেকে।"

ঈষৎ বিস্মিত হ'য়ে জান্‌কী বললে, "পিপরিহা থেকে ? সে ত এখান থেকে চার ক্রোশ পথ ! এলেন কি ক'রে দিনের আলোয় ?"

রসীদ বললে, "সে দুঃখের কথা আর কি বলব বলুন ! কাল শেষ রাত থেকে চন্দিহার জঙ্গলে একটা গাছে উঠে সারাদিন আমরা দুজনে লুকিয়ে ছিলাম। মতলব ছিল, সন্ধ্যা হ'লে কোনো রকমে একবার আপনাদের অড়হর-ক্ষেতে ঢুকতে পারলে পায়ে হাতে খানিকটা ক'রে চ'লে চ'লে আর খানিকটা ক'রে বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে করিমগঞ্জের দিকে যতটা সম্ভব এগিয়ে যাব। তারপর, রাত ভারি হ'লে ক্ষেত থেকে বেরিয়ে বনের পথ ধ'রে চলতে আরম্ভ করব। সন্ধ্যার পর গাছ থেকে নেমে গ্রামের বাইরে গা-ঢাকা দিয়ে দিয়ে চলেছি, এমন সময়ে দূর থেকে দুজন লোক আমাদের দেখতে পেয়ে হাত তুলে ডাকছে দেখে ছুটতে ছুটতে এসে আপনাদের এ ঘর খালি পেয়ে ঢুকে পড়েছি।"

রসীদের কথা শুনে ব্যস্ত হ'য়ে জান্‌কী বললে, "কি সর্বনাশ ! এ কথা এতক্ষণ বলেন নি কেন ? তা হ'লে ত তারা খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়ল ব'লে !"

সাগর-গর্জনের মতো দূর থেকে 'বন্দে মাতরম্' আর 'জয় হিন্দ' ধ্বনি শোনা যেতে লাগল।

জানকী বললে, "ঐ! ওঝাজীর বাড়ির সভা ভেঙে গেল, এখনি চারদিকে লোক ছড়িয়ে পড়বে। চলুন, চলুন, ভিতরে চলুন।" ব'লে আশ্রিত দুজনকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুতপদে অন্দর মহলের দিকে অগ্রসর হ'ল।

এ কথা বোধ করি না বললেও চলে, যে সময়কার কথা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত করছি, সে সময়ে বিহার প্রদেশের কয়েকটি জেলায় অগ্নিলীলা চলেছিল। নিষ্ঠুর নির্মম লেলিহান জিহ্বার স্পর্শে সে আগুন শুধু গৃহ হ'তে গৃহান্তরেই ছড়িয়ে পড়ছিল না, ক্ষুব্ধ-তাম্রাভ শিখার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে মানুষের হৃদয় হ'তে হৃদয় অধিকার বিস্তার ক'রে চলেছিল অবমানিত মানবাত্মার অপরিদমনীয় ক্রোধে। কয়েকদিন পূর্বে পূর্ববঙ্গের নোয়াখালী জেলায় নিরপরাধ এবং নিরুপায় মানবসম্প্রদায়ের উপর যে অমানবীয় পৈশাচিক নির্যাতন চলছিল, এ তার পাল্টা আগুন, প্রতিশোধ-বহ্নি।

যুক্তির এবং নীতির নিরপেক্ষ বিচারের মধ্যে এ প্রতিশোধ গ্রহণের সে সমর্থন নেই, তা নিঃসন্দেহ। কিন্তু মানুষের মনে যুক্তি-নীতি এখনো যে সেই নির্বিকল্প এবং অনড় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে নি, যার দরুন কোনো অবস্থাতেই তারা ভেঙে পড়তে পারে না, তারই প্রমাণলীলা চলেছিল মানুষের এই যুক্তিনীতিধ্বংসী অভিযানের মধ্যে।

পুরুষেরা আগুন হ'য়ে উঠেছে পুরুষদের বিরুদ্ধে। পাষাণে-পরিণত ক্ষমাহীন মনে তারা শপথ করেছে, কোনো পুরুষকেই রেয়াৎ করা হবে না—তা সে হোক, অশীতিপর বৃদ্ধ অথবা ছয় মাসের শিশু। মেয়েরা কিন্তু দৃঢ়পদে দাঁড়িয়েছে মেয়েদের স্বপক্ষে। পুরুষদের বিরুদ্ধে যাই-কিছু কর না কেন তোমরা, সে তোমাদের কারবার তোমরা জানো, কিন্তু মেয়েদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পাবে না। এই দাবি তারা স্থাপন করেছিল দাঙ্গার প্রথম দিন সন্ধ্যাকালে জগন্নাথ ঝার গৃহে পরামর্শ-সভায়;—এবং মেয়েদের প্রতি কোনো কিছু অত্যাচার হ'লে আত্ম-নিগ্রহের দ্বারা সে অত্যাচারের তারা প্রায়শ্চিত্ত করবে; এমন কি, তেমন গুরুতর ক্ষেত্রে আত্মহননের দ্বারা অত্যাচারকারী পুরুষদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করতেও পরাঙ্মুখ হবে না—এই ভয় দেখিয়ে পুরুষদের সভায় তাদের দাবি মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছিল।

২

অন্দরে প্রবেশ ক'রে জান্‌কী কপাটের অর্গল লাগিয়ে দিলে। তারপর দৈবাৎলব্ধ অতিথি দুজনকে বারান্দায় বসিয়ে ঘরের ভিতরে ছোরা দুখানা রেখে বেরিয়ে এসে বললে, "তোমার কাছে ছোরা-টোরা কিছু নেই ত জেহেনারা ?"

মাথা নেড়ে জেহেনারা বললে, "না, আমার কাছে ছোরা-টোরা কিছু নেই।" তারপর মৃদু হেসে বললে, "কিন্তু ছোরার চেয়েও ভীষণ জিনিস আমার কাছে আছে।"

"কি ? জহর ?"

"হ্যাঁ। আশ্চর্য ! কি ক'রে বুঝলেন ?"

স্মিতমুখে জান্‌কী বললে, "আচ্ছা, ও-অস্ত্র তোমার নিজের কাছেই থাক্। তবে, অন্তত এ গ্রামে, তোমার ও-জিনিস কোনো কাজেই লাগবে না। আমাদের এখানে মেয়েদের ওপর জুলুমবাজি একেবারেই অচল।"

জেহেনারা বললে, "কিন্তু আমার স্বামীর জীবন যদি হঠাৎ বিপন্ন হ'য়ে ওঠে, তা হ'লে ত কাজে লাগতে পারে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে জান্‌কী বললে, "আমাদের এলাকার মধ্যে তেমন কাজে লাগবার আশঙ্কাও নেই—এ আশ্বাস আমি বোধ হয় তোমাকে দিতে পারি।"

কৃতজ্ঞতার আলোকে জেহেনারার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল ; স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "আপনার মেহেরবানির কথা চিরদিন মনে থাকবে দিদি।"

"কতদিন তোমাদের বিয়ে হয়েছে জেহেনারা ?"

ঈষৎ আরক্ত মুখে জেহেনারা বললে, "মাস ছয়েক।"

মনে মনে মাথা নেড়ে জান্‌কী বললে, তা-ই। আবদুল রসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে প্রকাশ্যে বললে, "আপনার স্ত্রীভাগ্য ভাল রসীদ সাহেব।"

রসীদের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল ; ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, "বেশক ! আপনার এ কথা আমি বিলকুল স্বীকার করি দিদিজী।"

জেহেনারার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে স্মিত মুখে জান্‌কী বললে, "তুমিও ত এ কথা স্বীকার কর জেহেনারা ?"

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হ'ল না। সদর-দরজায় করাঘাতের শব্দ পাওয়া গেল, এবং পর মুহূর্তেই গভীর কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল, "দরজাটা খুলে দে শুকদেও।"

জান্‌কী বললে, "গৃহস্বামী এসেছেন। আপাততঃ তোমরা ঘরের ভিতরে গিয়ে ব'স,—আমি শিকল লাগিয়ে দিচ্ছি।" রসীদ এবং জেহানারা ঘরে প্রবেশ করলে শিকল টানতে টানতে মুখ বাড়িয়ে বললে, "ভয় নেই,—নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'স।" তারপর শিকল টেনে লাগিয়ে দিয়ে দোর খোলবার জন্য দ্রুতপদে প্রস্থান করলে।

ক্ষণকাল পরে স্ত্রীর পিছনে পিছনে বারান্দায় উপস্থিত হ'য়ে দেওনন্দন সিং বললে, "ছেলেদের ঘরে শিকল টানা দেখছি, এখনও শুকদেওরা ফেরে নি না-কি?"

জান্‌কী বললে, "এত বড় হল্লা চলেছে তোমাদের, এখনি তারা ঘরে ফিরবে? দেখ না কত রাত্রি করে।"

"ফুকন? ফুকন কোথায়?"

"ফুকনের কলিজায় দরদ উঠেছে। সে গেছে তার নানীর বাড়ি ঝাড়-ফুঁক করাতে। কাল সকালে আসবে।"

"বুলাকী-মাই?"

"বুলাকী-মাইকে পাঠিয়েছি মুরলীধরদের বাড়ি কিছু গম পিষিয়ে আনতে। আমাদের জাঁতার হাতলটা হঠাৎ ভেঙে গেছে।"

এবার দেওনন্দন সিং হেসে ফেলে বললে, "বহুৎ আচ্ছা। একে একে সকলেরই ত হিসেব দিলে। তোমার হিসেব কি জান্‌কী? একা তুমিই তা হ'লে বাড়ি আছ?"

মৃদু হেসে জান্‌কী বললে, "না, আমি ঠিক একা নেই। আমরা তিনজনে আছি।"

বিস্মিত কণ্ঠে দেওনন্দন বললে, "তিনজনে? আর দুজন কে?"

"একটি মুসলমান মেয়ে আর তার স্বামী।"

চকিত স্বরে দেওনন্দন বললে, "সে কি কথা জান্‌কী?"

আর্দ্র কণ্ঠে জান্‌কী বললে, "প্রাণভয়ে ভীত হ'য়ে তারা আমাদের বিচালি-ঘরে লুকিয়ে ছিল। ধরা প'ড়ে আত্মসমর্পণ ক'রে আমাদের শরণাগত হয়েছে।"

জান্‌কীর কথা শুনে দেওনন্দনের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল। "সর্বনাশ! এরাই তা হ'লে সেই দুজন লোক, আতিপাতি ক'রে যাদের গ্রামের লোকেরা খুঁজে বেড়াচ্ছে!"

মৃদু কণ্ঠে জান্‌কী বললে, "তা হবে। কিন্তু এদের আমি অভয় দিয়েছি, এদের তোমাকে বাঁচাতেই হবে।"

বিরক্তিকটু কণ্ঠে দেওনন্দন বললে, "কিন্তু কোন্ অধিকারে তুমি অভয় দিয়েছ শুনি?"

"ধর্মের অধিকারে। শরণাগত হ'লে অভয় না দিয়ে উপায় নেই।"

প্রবল ভাবে অসন্তোষসূচক মাথা নেড়ে দেওনন্দন বললে, "অন্যায় করেছ। মেয়েটির অবশ্য অনিষ্টের আশঙ্কা নেই, কিন্তু তার স্বামীর বিষয়ে কোনো ভরসা দিতে পারি নে।"

দেওনন্দনের কথা শুনে বিস্ময়চকিত কণ্ঠে জান্‌কী বললে, "বল কি গো তুমি! স্বামীর বিষয়ে ভরসা না দিলেও মেয়েটির কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা নেই—এ কথার কোনো মানে হয় না-কি? স্বামীর অনিষ্টের চেয়ে বড় অনিষ্ট স্ত্রীলোকের আর কি হ'তে পারে শুনি?"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে দেওনন্দন চুপ ক'রে রইল।

"তা হ'লে কথা দিলে ত?"

"কি কথা?"

"বাঁচাবে?"

ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালিত ক'রে দেওনন্দন বললে, "তা আমি বলতে পারি নে।"

জান্‌কীর মুখের ভাব কঠিন হ'য়ে উঠল; দৃঢ় কণ্ঠে সে বললে, "শোন। মেয়েটির কাছে জহর আছে। যদি ওর স্বামীকে বাঁচাতে না পার, আমি আর জেহেনারা দুজনে ভাগ ক'রে সে জহর খাব।"

অদূরে কয়েক ব্যক্তির মিলিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। সঙ্গে সঙ্গে দেওনন্দনের সদর-দরজায় ঘা পড়ল,—দেওনন্দন বাড়ি আছ? দেওনন্দন?

জান্‌কীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেওনন্দন বললে, "ননকুলালরা এসেছে। কোথায় তাদের রেখেছ?"

ছেলেদের ঘর দেখিয়ে দিয়ে জান্‌কী বললে, "ঐ ঘরে।"

তাড়াতাড়ি শিকল খুলে ভিতর দিকে মুখ বাড়িয়ে দেওনন্দন বললে, "শিগগির বেরিয়ে এস তোমরা।" কণ্ঠস্বরে আদেশের দার্ঢ্য।

দুজনে বেরিয়ে এল দ্বিধাজড়িত পদে। মুখ তাদের সীসার মতো পাংশু। সমস্ত কথাই তারা উৎকর্ণ হ'য়ে শুনেছে।

দেওনন্দন বললে, "আমার সঙ্গে এস।"

বিপন্ন-কাতর চক্ষে জেহেনারা একবার জানকীর প্রতি মিনতিমাখা দৃষ্টিপাত করলে।

জানকীর মুখে কিন্তু আশ্বাসের শান্ত হাসি; মৃদুকণ্ঠে কতকটা জেহেনারার কানে কানে সে বললে, "নির্ভয়ে যাও।"

দেওনন্দনের পিছনে পিছনে গিয়ে তারা দেওনন্দনের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করলে।

ওদিকে সদর-দরজার সম্মুখে উচ্ছ্বসিত কথোপকথনের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে হাঁকডাক চলছিল—দেওনন্দন! দেওনন্দন সিং বাড়ি আছ?

জানকীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেওনন্দন বললে, "শিগগির দরজা খুলে ওদের এই ঘরে পাঠিয়ে দাও।" তারপর জেহানারা এবং তার স্বামীকে সম্বোধন ক'রে বললে, "তোমরা তাড়াতাড়ি তক্তপোশের নীচে ঢুকে গিয়ে সোজা হ'য়ে শুয়ে পড়। ক্লান্ত হ'য়ে আছ, খবরদার, যেন ঘুমিয়ে প'ড়ে নাক ডাকিয়ো না। আর, আমার হুকুম ভিন্ন কিছুতে ওখান থেকে বেরিয়ে আসবে না।"

দেওনন্দনের কথা শেষ হ'তে না হ'তে আবদুল রসীদ এবং জেহেনারা ম্যাজিকের মতো তক্তপোশের নীচে অন্তর্হিত হ'য়ে গেল।

নন্‌কুলালরা যখন ঘরে প্রবেশ করলে তখন দেওনন্দন সিং দেহ বিস্তৃত ক'রে তক্তপোশের উপর শুয়ে আছে।

দেওনন্দনের পাশে এসে ব'সে নন্‌কুলাল বললে, "কি হ'ল দেওনন্দন ভাই, সন্ধ্যেবেলা শুয়ে কেন?"

দেওনন্দন বললে, "আর কেন, শরীরটা একদম বে-এক্তিয়ার হ'য়ে গেছে, মাথায় ভীষণ দরদ। একটু ঘুম হ'লে ভাল হ'য়ে যায় বোধহয়। তারপর? সন্ধান পেলে না ত?"

নন্‌কুলাল বললে, "নাঃ, পেলাম না। চতুর্দিকের বন-বাদাড় ঝোপ-

ঝাড় সবই ত দেখা গেল। কোথাও পাওয়া গেল না।" তারপর, ত্রিলোচন ঝা নামক এক ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কি দেখতে কি দেখেছ তুমি ত্রিলোচন, শুধু হয়রান ক'রেই মারলে আমাদের!" ব'লে হেসে উঠল।

চক্ষু কুঞ্চিত ক'রে ত্রিলোচন বললে, "তাই ত! আমরা হাঁক দিতে তুজনে ফিরে তাকিয়ে দেখে দুদ্দাড় ক'রে ছুটে পালাল, আর বলছ কি-না—কি দেখতে কি দেখেছ!" তারপর দেওনন্দনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "মনে হ'ল, তোমারই বাড়ির সামনে এসে যেন জাতুর মতো গায়েব হ'য়ে গেল।"

দেওনন্দন সিং বললে, "বাড়ির মধ্যে গায়েব হ'তে কি আর সাহস করবে?—হ'য়ে থাকে ত। ড়হর-ক্ষেতের মধ্যেই হয়েছে। তবু চল, একবার গোহাল-ঘরের দিকটা ভাল ক'রে খুঁজে দেখা যাক।" ব'লে উঠে বসল।

নন্‌কুলাল বললে, "তোমার তবিয়ৎ খারাপ, তুমি আবার তক্‌লিফ করবে?"

"তা হোক, এখনি ত ফিরে আসব। চল, একবার খুঁজে দেখে নিঃসন্দেহ হওয়া যাক।" ব'লে নন্‌কুলালদের সঙ্গে নিয়ে দেওনন্দন বেরিয়ে গেল।

৩

রাত্রি গভীর হয়েছে। শুকদেও এবং রামদেও—দেওনন্দন সিং-এর তুই পুত্র, বহুক্ষণ পূর্বে আহারাদি সেরে নিদ্রা গেছে। গ্রাম সুপ্ত, নিস্তব্ধ। শুধু শৃগাল-কুকুরের চিৎকারে এবং জনকয়েক প্রহরীর ক্ষণে ক্ষণে উত্থিত 'খবরদার' 'হুঁশিয়ার' রবে সেই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে খণ্ডিত হচ্ছে।

দেওনন্দন সিং-এর শয়ন-কক্ষের পার্শ্বে একটা ছোট ঘরে রসীদ এবং জেহেনারাকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল কয়েক ঘণ্টার বিশ্রামের জন্য। সেই ঘরের দরজায় করাঘাত ক'রে জান্‌কী মৃতু স্বরে ডাক দিলে, "জেহেনারা, জেগে আছ?"

উৎকট দুশ্চিন্তা এবং উৎকণ্ঠার সাময়িক বিরতির আবেশে এবং সযত্ন-অনুরোধঘটিত ঈষৎ গুরুভোজনের মাদকতায় রসীদ এবং জেহেনারা উভয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে ঘুমের মধ্যে উদ্বেগের একটু বিঘ্ন ছিল ব'লে ভাঙতেও বিলম্ব হ'ল না। রসীদের দেহে একটু নাড়া দিয়ে মৃদু কণ্ঠে জেহেনারা বললে, "শুনছ, দিদি ডাকছেন।"

রসীদ বললে, "শুনেছি। চল, যাই।"

দোর খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে উভয়ে দেখলে সম্মুখে জান্‌কী এবং দেওনন্দন সিং দাঁড়িয়ে। দেওনন্দন বললে, "আর দেরি ক'রে কাজ নেই, চল, বেরিয়ে পড়ি। করিমগঞ্জের কাছাকাছি তোমাদের পৌছে দিয়ে আবার আমাকে চক্কর ওঠবার আগে বাড়ি এসে পৌছতে হবে।"

জান্‌কী বললে, "কাল ভোরে ত তোমাদের শকরপুরা যাবার কথা আছে?"

দেওনন্দন বললে, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কথা আছে।" তারপর রসীদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "আর কিছু খেয়ে নেবে তোমরা রসীদ সাহেব?"

দেওনন্দনের কথা শুনে জেহেনারার মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলে। রসীদ বললে, "সর্বনাশ! অত ডাল, রুটি, দহি, চুড়া, মাছ-তরকারি, গুড়-মিঠাই দিয়ে পেট ভরিয়ে এখন আবার কিছু খেলে আর নড়তে পারা যাবে না।"

"আচ্ছা, তা হ'লে তোমরা এস। আমি গাড়িতে বয়েল জুততে চললাম।" ব'লে দেওনন্দন প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

রসীদ বললে, "তা হ'লে গাড়িতে যাওয়াই স্থির করেছেন?"

ফিরে দাঁড়িয়ে দেওনন্দন বললে, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। বললাম ত তখন, পায়ে হেঁটে যাওয়া একটুও নিরাপদ হবে না। এখান থেকে তিন মাইল পর্যন্ত সব জায়গায় আমাদের ঘাঁটি আর পাহারা আছে।"

"গাড়িতে দেখা যাবে না ত আমাদের?"

"তার ব্যবস্থা হবে।" ব'লে দেওনন্দন প্রস্থান করলে।

জান্‌কী বললে, "শোন জেহেনারা, চিরকাল এমন দিন থাকবে না।

চিরদিন যেমন ক'রে এসেছি, আবার আমরা হিন্দু-মুসলমান তেমনি মিলে-মিশে পাশাপাশি বসবাস করব।"

জেহেনারার দুই চক্ষু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল ; বললে, "আল্লা করুন, সেদিন যেন শিগগির ফিরে আসে।"

"সেদিন ফিরে এলে তোমার স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আবার একদিন আমাদের গাঁয়ে আমাদের বাড়িতে আমার ছোট বোনের মতো এসে সমস্ত দিন থেকে আমোদ-আহ্লাদ ক'রে যেয়ো। আজকের মতো ভয়ে ভয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে থেকে নয়।"

আর্দ্র কণ্ঠে জেহেনারা বললে, "আপনি যখন হুকুম করলেন, নিশ্চয়ই আসব। এমনিই বোধ হয় আসতাম।"

মৃদু হেসে জান্‌কী বললে, "বুঝতে পেরেছ ত ?"

"কি ?"

"তা-ও খুলে বলতে হবে ?"

জেহেনারার দুই চক্ষু থেকে আলগা অশ্রু ঝরঝর ক'রে ঝ'রে পড়ল ; বললে, "হ্যাঁ, পেরেছি। পশু হ'লেও ত বুঝতে পারত।"

জেহেনারার বাম স্কন্ধে হাত রেখে স্নিগ্ধ কণ্ঠে জান্‌কী বললে, "আর একটা কথা। আমার স্বামীকে সুস্থ শরীরে ফেরত পাঠিয়ো। যে দুঃখ থেকে তোমাকে আমি রক্ষে করলাম, আমাকে যেন সে দুঃখ পেতে না হয়।"

জান্‌কীর কথা শুনে জেহেনারা শিউরে উঠল। বললে, "জীবন থাকতে ত নয়।"

তিন জনে মিলে বাইরে এসে দেখলে, বিচালি-ঘরের সম্মুখে গাড়িতে বয়েল জুতে দেওনন্দন অপেক্ষা করছে।

রসীদ ও জেহেনারাকে দেওনন্দন গাড়ির উপর লম্বালম্বি ভাবে পাশাপাশি শুইয়ে দিয়ে তারপর তাদের দেহের উপর এমনভাবে একটা শতরঞ্জি বিছিয়ে দিলে, যাতে উভয়ের শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণে কোনো অসুবিধা না হয়। তৎপরে, বিচালি-ঘর থেকে আঁটি আঁটি বিচালি বার ক'রে শতরঞ্জির উপর পরিপাটি ভাবে সাজিয়ে নিয়ে চালকের স্থানে উঠে বসল।

জান্‌কী বললে, "যা বলেছি, মনে থাকে যেন। বিশেষ সাবধানে থাকবে, আর রাত থাকতে থাকতে ফিরে আসবে।"

একটু রসিকতা করবার উদ্দেশ্যে দেওনন্দন গভীর স্বরে বললে, "তার জন্যে দুঃখ কি জান্‌কী, জীবন দিয়ে জীবন বাঁচিয়েও ত আনন্দ আছে, বিশেষত তোমার হুকুমে।" তারপর অল্প একটু হেসে বললে, "না না, ভয় নেই তোমার, ঠিক আমি ফিরে আসব। দরবাজা লাগিয়ে তুমি শুয়ে পড়গে।"

বলদ দুটির পুচ্ছমূলে উৎসাহের শিহরণ জাগিয়ে দেওনন্দন রওনা হ'ল।

আধ মাইলটাক পথ নির্বিবাদে যাবার পর পার্শ্ববর্তী ঝোপ থেকে এক দীর্ঘকায় লাঠিয়াল হঠাৎ নির্গত হ'য়ে গর্জন ক'রে উঠল, "কে যাও? কি আছে গাড়িতে?"

দেওনন্দন বললে, "বিচালি আছে তোমার খাবার জন্যে। খোল আনতে ভুলেছি, বাড়ি গিয়ে জান্‌কীর কাছে সের দুই চেয়ে নিয়ে খেয়ো।"

একটা বিকট হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।—"আরে, কে ও? দেওনন্দন সিং?"

"তা নয় ত তোমার বোনাই মনে করেছিলে না-কি?"

গাড়ির সঙ্গে চলতে চলতে লাঠিয়াল বললে, "না না, তা মনে করি নি, শালা-ই মনে করেছিলাম। কিন্তু এ কি ব্যাপার! এই দুপুর রাতে আধগাড়ি বিচালি নিয়ে কোথায় চলেছ তুমি?"

দেওনন্দন বললে, "টিকৌরিতে।"

"তোমার খলিহানে?"

"হ্যাঁ।"

"তা সেখানে বিচালি নিয়ে যাচ্ছ কি রকম? সেখান থেকেই ত বিচালি তোমার বালুপট্টির ব্যবহারের জন্যে আসে!"

দেওনন্দন বললে, "দুঃখের কথা আর বল কেন মথুরা, ওখানকার বিচালিতে সর্দি লেগে গিয়ে কেমন একটু দুর্গন্ধ হয়েছে, গাই-বলদ খুশি মনে খেতে চায় না। তাই দু-চার দিনের মতো কিছু বিচালি দিতে চলেছি। আর, কয়েক দিনের মতো কিছু ভাল বিচালি কিনে নেবার জন্যে পয়সাকড়িও কিছু দিয়ে আসতে হবে। তারপর ত অল্পদিনের মধ্যে নতুন বিচালি এসে পড়বে।"

"তা, এ কাজের জন্মে তুমি যাচ্ছ কেন? তোমার গাড়োয়ানের কি হ'ল?"

"এতোয়ারির গ্রামে হাঙ্গামা লেগেছে। সে দশ দিনের ছুটি নিয়ে গেছে।"

"ফুকন? ফুকনকে ত পাঠালে পারতে?"

"ফুকনের কলিজায় দরদ উঠেছে।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে মথুরা বললে, "করিমগঞ্জের পথে হাঙ্গামা আছে, ওদিক দিয়ে যেয়ো না। একটু ঘুর হ'লেও, দরবারপুরের পথে যেয়ো।"

"তা-ই যাব।" ব'লে দেওনন্দন সহসা বলদদ্বয়কে উত্তেজিত ক'রে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলল।

৪

দেওনন্দনরা প্রস্থান করলে যতক্ষণ দেখা গেল চলনশীল গোরুর গাড়ির দিকে অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়ে থেকে জানকী পথের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর গৃহে প্রবেশ ক'রে সদর দ্বার এবং ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে শয্যাগ্রহণ করলে।

ঘুমিয়ে পড়বার জন্যই সে ব্যস্ত, কিন্তু কি যেন অস্পষ্ট একটা অস্বস্তি মনকে ঘুমের উপযুক্ত শান্ত হ'তে দেয় না। কেবলই মনে হয়, কোথায় যেন একটা সাংঘাতিক ভুল হ'য়ে গেছে, যা শুধরে নেবার কোনো উপায়ই আর নেই। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নিজের উদ্যোগে যে মানুষকে সে বিদায় দিয়েছে, ফিরে আসবার পথ সে মানুষ কোনো দিনই যদি আর না পায়!

অশুভ চিন্তার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য নিমীলিত চক্ষে জানকী এপাশ-ওপাশ ক'রে নিদ্রার আরাধনা করতে লাগল। কিন্তু, কবিতা এবং বনিতা ছাড়া, নিদ্রা হচ্ছে সেই তৃতীয়বস্তু যা স্বয়মাগতা না হ'লে স্বাগতা হয় না।

সে যাই হোক, বহুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর অবশেষে একসময়ে সেই অনিচ্ছুক নিদ্রা জানকীর বিনিদ্র চক্ষে ধরা দিলে।

ঘুম ভাঙল, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় নয়। শুকদেওপ্রসাদের ডাকাডাকির ফলে ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে সে দেখলে দিবালোকে ঘর ভ'রে গেছে। মনে মনে সঙ্কল্প করেছিল কাক-কোকিল ডাকবার আগে জাগ্রত হ'য়ে স্বামীর অপেক্ষায় ব'সে থাকবে। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ ক'রে দরজা খুলে শুকদেওপ্রসাদকে সম্মুখে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলে, "মালিক এসেছেন? তোমাদের বাবুজী?"

বিস্মিত কণ্ঠে শুকদেও বললে, "বাবুজী কি বাড়িতে নেই? কোথায় গেছেন তিনি?"

অধীরভাবে জান্‌কী উত্তর দিলে, "যেখানেই যান না কেন, ফিরেছেন কি-না তা-ই বল? টিকৌরিতে গেছেন।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে শুকদেও বললে, "না, ফেরেন নি এখনো তা হ'লে।"

জান্‌কীর চক্ষে দিনের আলো নিষ্প্রভ হ'য়ে এল। আর্তস্বরে সে বললে, "তা হ'লেই হয়েছে! ভোরবেলা শকরপুরা যাবার কথা, আর এখনো ফেরেন নি? যাও, দেখে এস গোহাল-বাড়িতে বয়েল-গাড়ি আছে কি-না। হয়ত ফিরে এসে দোর খোলা না পেয়ে বাইরে বেরিয়ে গেছেন।"

জননীর আদেশ পালন করবার জন্য শুকদেও দ্রুতগতিতে ধাবিত হ'ল। শুকদেও ফিরে এসে সংবাদ দেবে, জান্‌কীর কিন্তু সে সবুর সইল না। শুকদেওর পিছনে পিছনে গিয়ে সে দেখলে, গোয়াল-বাড়িতে গাড়ি অথবা বলদ কিছুই নেই।

অনাবশ্যক প্রশ্নে প্রশ্নে বাড়ির এবং পাড়ার লোকেরা বিব্রত হ'য়ে উঠল। সকলকেই বলতে হ'ল, সকাল থেকে তারা দেওনন্দনের কোনো সংবাদ অবগত নয়।

দিন বেড়ে চলল, তার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলল জান্‌কীর দুশ্চিন্তা। অবশেষে বেলা দশটার সময় উনান থেকে অর্ধসিদ্ধ ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে জান্‌কী যখন শয্যা গ্রহণ করলে, তখন তার মুখ দিয়ে ভাল ক'রে কথা বার হচ্ছিল না,—নিঃশ্বাস রোধ হ'য়ে আসছিল। নিভৃত অন্তরে তার মন বারম্বার বলছিল, যা হয়েছে তা বুঝতেই পারছি,—পুনরাগমনহীন বিদায় পাকা হয়েছে।

কিন্তু অর্ধঘণ্টাকাল পরে সহসা একসময়ে চাকা ঘুরল। গৃহের সকলেই জান্‌কীর শোচনীয় মনের কথা অবগত ছিল, রামদেও ছুটে এসে বললে, "মা, ফুকন গাড়ি খুলছে। বাবুজী ফিরে এসেছেন।"

শয্যা পরিত্যাগ ক'রে জান্‌কী ধীরে ধীরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। তখন দেওনন্দন গৃহমধ্যে প্রবেশ করছে। নিকটে এসে হাসিমুখে সে বললে, "এসেছি জান্‌কী।"

আর্দ্র গভীর কণ্ঠে জান্‌কী জিজ্ঞাসা করলে, "এত দেরি ক'রে এলে যে?"

তেমনি হাসিমুখে দেওনন্দন বললে, "দেরি ক'রে এসেছি তার জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছিল, তাতে না এলেও তাজ্জবের কিছু থাকত না।"

নিরুদ্ধনিশ্বাসে জান্‌কী বললে, "কেন?"

অদূরে সমুদ্রগর্জনের ন্যায় শত কণ্ঠের মিলিত ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল, জয় হিন্দ্, বন্দে মাতরম্!

দেওনন্দন বললে, "সে দীর্ঘ কাহিনী পরে তোমাকে বলব। আপাতত এখনি আমাকে দলের সঙ্গে বেরোতে হবে। কিন্তু ধন্য মেয়ে তোমার জেহেনারা! তুমি তার স্বামীকে বাঁচিয়েছ, কিন্তু সে যেমন ক'রে তোমার স্বামীকে বাঁচিয়েছে তা অদ্ভুত! যে আঘাত সে নিজের মাথায় নিয়েছে, সে আঘাতে আমার মাথা গুঁড়িয়ে যেতে পারত!"

"কি সর্বনাশ! বেঁচে আছে ত?" জান্‌কীর মুখে চোখে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ঘনিয়ে উঠল।

দেওনন্দন বললে, "দেখে এসেছি, আছে। কিন্তু এখনো আছে কি-না বলতে পারি নে। তুমি তোমার স্বামীকে দিয়ে তার স্বামীকে বাঁচিয়েছ জান্‌কী, সে তার নিজের দেহ দিয়ে তোমার স্বামীকে বাঁচিয়েছে। তুমিই বল আর জেহেনারাই বল,—দেখছি, কেউ কম নয়।"

পুনরায় আরও নিকটে মিলিত কণ্ঠের সুগভীর ধ্বনি শোনা গেল, জয় হিন্দ্! বন্দে মাতরম্!

তাড়াতাড়ি ঘরে প্রবেশ ক'রে দেওনন্দন কি একটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মনে মনে জান্‌কী গভীর কৃতজ্ঞতাভরে ভগবানকে প্রণাম করলে, তারপর তার সমগ্র অন্তর মথিত ক'রে আশীর্বাদ জেগে উঠল,—বেঁচে থাক ভাই জেহেনারা, ভাল হ'য়ে ওঠ। দীর্ঘজীবী হও।

কমিউনিস্ট্ প্রিয়া

১

বালিগঞ্জের এক নিভৃত বাসিন্দা-পল্লীতে স্থকুমার রায়ের বৃহৎ অট্টালিকা। সুদৃশ্য লৌহদ্বার ঠেলে কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করলে চাঁপাফুলের রঙের ঘুটিং-ঢালা একটা প্রশস্ত পথ গাড়িবারান্দার পূর্বপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। গাড়িবারান্দার পশ্চিমপ্রান্ত দিয়ে সেই পথটা নির্গত হ'য়ে সমস্ত অট্টালিকাটা পরিবেষ্টিত ক'রে পুনরায় গাড়িবারান্দার পূর্বপ্রান্তে এসে মিলিত হয়েছে।

সুরম্য সৌধের বামপ্রান্তের কোণে সু-উচ্চ মিনার। তদুপরি একটা বৃহৎ গুরুভার জাতীয়-পতাকা অলস মন্থরভঙ্গিতে বায়ুভরে ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হচ্ছে।

ছুটির দিন, বেলা তখন নয়টা। গাড়িবারান্দার মধ্যস্থলে এসে বাইসিকেল থেকে অবতরণ ক'রে বিজয়েশ নিকটবর্তী একজন চাপরাসীকে জিজ্ঞাসা করলে, "মিস্টার রায় বাড়ি আছেন? স্থকুমার রায়?"

চাপরাসী বললে, "আছেন, কিন্তু একটু ব্যস্ত আছেন, ঘরে চার-পাঁচজন বাবুর সঙ্গে কথা কইছেন। আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে।" তারপর পকেট থেকে পেন্সিল এবং স্লিপ-ব্লক বার ক'রে বিজয়েশের হাতে দিয়ে বললে, "আপনার নামটা লিখে দিন।"

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে এম্. এস্-সি. পাস ক'রে স্থকুমার বিলাত গমন করে। তথায় পাঁচ বৎসর কাল অধ্যয়ন এবং শিক্ষার পর সে যখন একটা বড়-রকম এঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী অধিকার করলে, তখন ইয়োরোপীয় যুদ্ধের অবস্থা এরূপ সঙ্গীন যে, জল স্থল অথবা অন্তরীক্ষপথে এক-পা অগ্রসর হবার উপায় নেই। অগত্যা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা তখনকার মতো স্থগিত রেখে ইংলণ্ডে একটা বৃহৎ যুদ্ধ-কারখানায় সে চাকরি গ্রহণ করে। কিছুকাল পরে ইয়োরোপীয় যুদ্ধের অবস্থা কতকটা মন্দীভূত হ'লে, অতিকষ্টে কোনোপ্রকারে ব্যবস্থা ক'রে সে দেশে ফিরে আসে। ডিগ্রী পাবার পরেই বিলাতে অবস্থান-

কালে সুকুমার অযাচিতভাবে কলিকাতার এক নামজাদা ইংলিশ এঞ্জিনীয়ারিং ফার্মে অ্যাসিস্ট্যান্ট্ এঞ্জিনীয়ারের চাকরি লাভ করে। মাসিক বারো শত টাকা বেতন, তদুপরি কার-অ্যালাউয়েন্স্ এবং সালিয়ানা একটা মোটা অঙ্কের কমিশনের ব্যবস্থা। কলিকাতায় এসে চীফ্ ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার পরদিন থেকে সে চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছে। পূর্বোক্ত চাপরাসী সুকুমারের অফিসের খাস আরদালী। ছুটির দিনে তাকে সুকুমারের গৃহে হাজিরা দিতে হয়।

চাপরাসীর হাত থেকে স্লিপ-বুক নিয়ে বিজয়েশ নিজের নাম লিখছে দেখতে পেয়ে, সতীশ নামে সুকুমারদের একজন কর্মচারী ছুটে এসে বললে, "চেনো না রামচরিত্তর, এঁকে? এঁর স্লিপ লাগবে না।" তারপর বিজয়েশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিনীত কণ্ঠে বললে, "মিস্টার রায় ঐ পূর্বদিকের কোণের ঘরে আছেন। আপনি যান, স্যার। নাম আপনাকে পাঠাতে হবে না।"

একটু দ্বিধাসহকারে বিজয়েশ বললে, "কিন্তু শুনছি, ওঁর ঘরে লোক আছে?"

"তা থাক্, তার জন্যে আপনার আটকাবে না, আপনি যান।"

এ কথার পর আর কোনো প্রশ্ন না তুলে বিজয়েশ সতীশের নির্দেশিত ঘরের দিকে প্রস্থান করলে।

বিজয়েশ কিয়দ্দূর অগ্রসর হ'লে রামচরিত্র সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলে, "কে ইনি সতীশবাবু?"

সতীশ বললে, "চৌঠা বৈশেখ যে মেয়েটির সঙ্গে তোমার সাহেবের বিয়ে হবে, ইনি তাঁর দাদা বিজয়েশ চৌধুরী। মস্ত পণ্ডিত লোক—কলেজের প্রোফেসার।"

সুকুমারের কক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে বিজয়েশ দেখলে দ্বার আধখানা খোলা। তারই মধ্য দিয়ে দেখতে পেলে, দ্বারের দিকে মুখ ক'রে টেবিলের সামনে ব'সে সুকুমার কয়েকজন যুবকের সঙ্গে কথোপকথন করছে।

অবিলম্বেই চোখাচোখি হ'য়ে গেল। ব্যস্ত হ'য়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সাগ্রহকণ্ঠে সুকুমার বললে, "আসুন আসুন, বড়দা, আসুন।"

কক্ষে প্রবেশ ক'রে ঈষৎ দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বিজয়েশ বললে, "তুমি ব্যস্ত রয়েছ, আমি না-হয় বাইরে একটু অপেক্ষা করি।"

ব্যগ্রস্বরে সুকুমার বললে, "না না, বাইরে অপেক্ষা করতে হবে না।" এঁদের সঙ্গে আমার কাজ শেষ হ'য়ে এসেছে। মিনিট দু-চার অপেক্ষা করতে যদি অসুবিধে না হয়, তা হ'লে ঐ চেয়ারটায় বসুন।" ব'লে ঘরের এককোণে রাখা একটা ঈজি-চেয়ার দেখিয়ে দিলে।

"না, আমার একটুও অসুবিধে হবে না।" ব'লে বিজয়েশ ঈজি-চেয়ারে উপবেশন করলে।

সুকুমার ছাড়া ঘরে পাঁচজন যুবাপুরুষ ছিল। প্রত্যেকের অঙ্গে ধপধপে খদ্দরের পোশাক, মাথায় খদ্দরের টুপি এবং জামার বাম দিকে বুক-পকেটের কাছে আঁটা কংগ্রেস-ব্যাজ।

সুকুমারের টেবিলের উপর একরাশ কংগ্রেস-ব্যাজ এবং চার-পাঁচটা জাতীয়-পতাকা।

যুবকদের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, "নতুন পোস্টার ছাপানো হয়েছে?"

একটি যুবক বললে, "হয়েছে স্যার।"

"এবার ঠিক হয়েছে ত?"

"ভালই হয়েছে। দেখবেন স্যার? বাইরে আমার ব্যাগে খানদুয়েক আছে।"

সুকুমার বললে, "নিয়ে এস, দেখি।"

যুবকটি দ্রুতপদে বাইরে গিয়ে একখানা পোস্টার এনে সুকুমারের সম্মুখে মেলে ধরলে। উজ্জ্বল লাল কালিতে বড় বড় বলিষ্ঠ অক্ষরে ছাপা—কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থী শ্রীযুক্ত হরিনাথ বসুকে ভোট দিয়ে দেশকে স্বাধীনতার পথে অগ্রগামী করুন।

ক্ষণকাল স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে প্রসন্নভাবে সুকুমার বললে, "বেশ হয়েছে, ঠিক হয়েছে এবার। কত ছাপিয়েছ?"

"চার হাজার।"

"আচ্ছা, আজ থেকে মারতে আরম্ভ কর। বেশ সদর জায়গা দেখে দেখে মারবে, কিন্তু লীগ কিংবা কমিউনিস্ট পোস্টারের ওপর মেরো না।"

যুবকদের মধ্যে একজন ঈষৎ উষ্মার সহিত বললে, "কিন্তু ওরা যে আমাদের পোস্টারের ওপর মারে স্যার!"

মৃদু হাসিয়া সুকুমার বললে, "ওরা মারে ব'লে আমরাও মারব, এ ত আমাদের নীতি নয় প্রভাত।"

'মারা' শব্দের দ্ব্যর্থের কৌতুকে সকলে হেসে উঠল।

সুকুমার বললে, "তা ছাড়া, এ কথা সব সময়ে মনে রেখো যে, চাপা দিয়ে বিশেষ কিছু ফললাভ করা যায় না; তা পোস্টার চাপা দিয়েই বল, আর মানুষ চাপা দিয়েই বল।"

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হ'ল।

প্রভাত বললে, "ওদের কিন্তু মতলব ভাল মনে হচ্ছে না স্যার। শুনছি, মণ-দরে ওরা লাঠি কিনতে আরম্ভ করেছে। শেষ পর্যন্ত মারামারি না ক'রে ছাড়বে না দেখছি।"

সুকুমার বললে, "যত ইচ্ছে লাঠি ওরা কিনুক, কিন্তু মারামারি করা হবে না প্রভাত। ওদের মারার উত্তরে আমরাও যদি মারি, তা হ'লে কিছুতেই ওদের বিশ্বাস করানো যাবে না যে, সত্যিসত্যিই আমরা অহিংস।"

সুকুমারের কথা শুনে পুনরায় সকলে হেসে উঠল।

সুকুমার বললে, "তোমাদের সঙ্গে আজকের মতো সব কথাই শেষ হয়েছে।" বিজয়েশকে দেখিয়ে বললে, "এঁকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি, এবার তোমরা কাজে বেরিয়ে পড়। বন্দে মাতরম্!"

সমস্বরে 'বন্দে মাতরম্' ব'লে যুবকের দল ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

নিজের খাস আসন পরিত্যাগ ক'রে বিজয়েশের কাছে উঠে এসে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে সুকুমার বললে, "এবার হুকুম করুন বড়দা। বাড়ির খবর সব ভাল ত? কমলা ভাল আছে?"

সুকুমারের ভাবী বধূর নাম কমলা।

স্মিতমুখে বিজয়েশ বললে, "হ্যাঁ, কমলা ভাল আছে। আমি আসছি তার কাছ থেকে একটা অনুরোধ নিয়ে।"

বিজয়েশের কথা শুনে সুকুমারের মনে কৌতূহল জাগ্রত হ'ল। ঈষৎ বিস্মিতকণ্ঠে সে বললে, "অনুরোধ নিয়ে? কি অনুরোধ নিয়ে?"

পকেট থেকে একখানা খামে-মোড়া চিঠি বার ক'রে সুকুমারের হাতে দিয়ে বিজয়েশ বললে, "চিঠিখানা প'ড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে।"

"কমলার চিঠি ?"

"হ্যাঁ।"

"কমলার চিঠি নিয়ে স্বয়ং বাড়ির কর্তাকে আসতে হ'ল ? চাকর দিয়ে পাঠিয়ে দিলে চলত না ?"

একটু ইতস্তত ক'রে মনে মনে একটুখানি কি ভেবে নিয়ে বিজয়েশ বললে, "চিঠির মধ্যে যে অনুরোধ আছে তা শুধু কমলার অনুরোধই নয়, আমরাও সে অনুরোধে deeply interested, তাই আমি নিজেই এসেছি।"

"ব্যাপার কি বলুন ত!" ব'লে খাম খুলে সুকুমার চিঠিটা পড়তে আরম্ভ করলে। চিঠি পড়তে পড়তে তার মুখমণ্ডলে একটা ঘনছায়া দেখা দিলে। সে ছায়া চিন্তার,—না, বিরক্তির ; না, চিন্তা ও বিরক্তি জড়িত কোনো মিশ্রিত-মনোভাবের, তা ঠিক বোঝা গেল না। অদীর্ঘ চিঠি অবিলম্বে শেষ ক'রে ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিতে সে বললে, "কিন্তু দেবেশ্বর সান্যাল যে কমিউনিস্ট্!"

বিজয়েশ বললে, "সেই জন্যেই ত তোমার প্রতি আমাদের এই অনুরোধ। দেবেশ্বর সান্যাল কংগ্রেসী হ'লে তুমি ত এমনিই তাকে ভোট দিতে।"

"কিন্তু আমি যে নিজে একজন কংগ্রেসী। তায় আবার একেবারে নির্লিপ্ত কংগ্রেসী নই, একজন কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীকে একটু প্রবল ভাবেই সাহায্য করছি।"

"সেই জন্যেই ত তোমার প্রতি আমাদের এত লোভ। তুমি আমাদের দলে যোগদান করলে একজন প্রবল শত্রু প্রবল মিত্রে পরিণত হবে ;—একেবারে ডবল লাভ। আসল কথা কি জান সুকুমার ? তুমি আমাদের এমনই পরমাত্মীয় হ'তে চলেছ যে, ষোল-আনা তোমাকে না পেলে আমাদের পরিতৃপ্তি নেই।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ হাসিমুখে সুকুমার বললে, "কিন্তু এমন ক'রে আমার রাজনৈতিক মত বদলে নিয়ে পাওয়াকে আপনি কি ষোল-আনা পাওয়া বলেন ? আমার ত মনে হয়, তা হ'লেই আমাকে ষোল-আনা পাওয়া হবে না। আমার মাথায় পেছন দিকের চেয়ে সামনের দিকে বড় বড় চুল আছে। ধরুন, আমাকে পাবার এই শর্ত যদি আপনারা

করেন যে, সামনের মাথার চুল ক্লিপ ক'রে আমাকে পেছনের চুলের সমান ক'রে নিতে হবে, আর আমি যদি আপনাদের সেই শর্ত পালন করি, তা হ'লে কি মনে করেন আমাকে ষোল-আনা পাওয়া হবে? আর, মাথা ক্লিপ করলে মানুষের যে-পরিমাণ পরিবর্তন হয়, মত ক্লিপ করলে তার চেয়ে বেশি হয়—এ কথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন।"

অতঃপর প্রায় ঘণ্টাখানেক ধ'রে চলল তর্ক এবং বিতর্ক। তার মধ্যে এসে পড়ল কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট্ পার্টির আদর্শ এবং নীতিগত সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম আলোচনা, এসে পড়ল মুসলীম লীগ এবং মুসলীম লীগের পাকিস্তানি দাবির কথা, জাগ্রত হ'ল নানাপ্রকার অভিযোগ এবং অভিযোগ খণ্ডনের কূট বাদানুবাদ; কিন্তু সেই দুস্তর বিভেদ-সাগরের অসীম জলরাশির মধ্যে এমন একটিও ক্ষুদ্র দ্বীপ দেখা গেল না, যার উপর আশ্রয় লাভ ক'রে একটা সুমীমাংসার সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে।

বিজয়েশ বললে, "তর্ক যথেষ্ট হয়েছে, আর তর্ক ক'রে কোনো লাভ নেই। মোট কথা এই যে, রাজনৈতিক মতভেদ এমন একটা জিনিস, বিশেষ ক'রে আজকালকার দিনে, যা কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। সুতরাং আমাদের সঙ্গে তোমার মতের ঐক্য আমরা একান্ত ভাবে কামনা করি।"

সহাস্যমুখে সুকুমার বললে, "আমিও ত আমার দিক থেকে ঠিক আপনাদেরই মতো আমার সঙ্গে আপনাদের মতের ঐক্য কামনা করতে পারি?"

বিজয়েশ বললে, "নিশ্চয় পার, কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত কর নি। প্রয়োজনটা আমরাই প্রথমে অনুভব করেছি; আর তার প্রমাণস্বরূপ আমরাই প্রথমে তোমার কাছে এসেছি। সুতরাং—"

কথাটা বিজয়েশকে শেষ করতে না দিয়ে সুকুমার বললে, "সুতরাং first come, first have?"

সহাস্যমুখে বিজয়েশ বললে, "হ্যাঁ, first come, first have।"

"কিন্তু আমি যদি আপনাদের এ যুক্তি স্বীকার না করি তা হ'লে?"

এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে থেকে বিজয়েশ বললে, "তা হ'লেই ত বিপদ! তা হ'লে হয়ত গভীর দুঃখের কারণ উপস্থিত হবে।"

"গভীর দুঃখের কারণ উপস্থিত হবে শুধু আপনাদের দিকেই? না, আমার দিকেও?"

"তার মানে?"

"তার মানে, যে-পথে আমি আপনাদের সম্পর্কে অগ্রসর হচ্ছি, সে পথে Road closed-এর বেড়া পড়বে না ত?"

যথাস্থানে আঘাত ক'রে সুকুমারকে একটু সন্ত্রস্ত করতে সমর্থ হয়েছে মনে ভেবে বিজয়েশ মনে মনে ঈষৎ উল্লসিত হ'ল। আর একটু চড়া মাত্রায় সুবিধাটা কাজে লাগাবার অভিপ্রায়ে মুখ গম্ভীর ক'রে সে বললে, "একান্তই যদি বেড়া পড়ে, তা হ'লে সেজন্যে তোমাকেই দায়ী করব। সুতরাং আমাদের যদি পেতে চাও, তা হ'লে—"

এবারও বিজয়েশকে তার কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে সুকুমার বললে, "তা হ'লে আমাকে কি করতে হবে, তার পুনরুক্তির দরকার নেই বড়দা। দয়া ক'রে যদি ক্ষমা করেন, তা হ'লে একটু স্পষ্ট ক'রে একটা সত্যি কথা বলি।"

ঔৎসুক্যভরে বিজয়েশ বললে, "কি সত্যি কথা?"

"আপনাদের পাবার জন্যে আমি ঠিক ততটা ব্যস্ত নই, যতটা ব্যস্ত কমলাকে পাবার জন্যে। কমলা হচ্ছে আসল বস্তু, আর আপনারা হচ্ছেন আনুষঙ্গিক; ঠিক যেমন একটা বোঁটার মধ্যে ফুল হচ্ছে আসল বস্তু, আর তার আশপাশের পাতা হচ্ছে আনুষঙ্গিক। সুতরাং এ কথার চূড়ান্ত মীমাংসার জন্যে কমলার সঙ্গে কথা হওয়া দরকার।"

সুকুমারের কথা শুনে বিজয়েশের মুখখানা কালো হ'য়ে উঠল। ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে সে বললে, "তা হ'লে কমলার সঙ্গেই কথা ক'য়ো। আপাতত কাঁটা না ব'লে আমাদের যে পাতা বলেছ, সে জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে যাচ্ছি।"

সুকুমারও আসন ত্যাগ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠেছিল; মনে মনে বললে, নিতান্ত নিজের বাড়ি তাই পাতা বলেছি, অন্য জায়গা হ'লে কাঁটাই বলতাম। প্রকাশ্যে বললে, "ঠিক চারটের সময়ে কমলার সঙ্গে কথা কইতে যাব, আর সেই সময়ে চা খাব।"

"নিশ্চয় খাবে।" ব'লে বিজয়েশ নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

২

বেলা চারটার সময়ে কমলাদের গৃহে উপস্থিত হ'য়ে সুকুমার দেখলে, বাইরের বারান্দায় বিজয়েশ তার জন্য প্রস্তুত হ'য়ে ব'সে আছে। সুকুমারকে দেখে বিজয়েশ বললে, "যাও, ভেতরে যাও। কমলারা চায়ের আয়োজন ক'রে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তোমাকে দেখলেই জল চড়িয়ে দেবে।"

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, "আপনি চা খাবেন না বড়দা?"

বিজয়েশ বললে, "না, এখন আমি খাব না। সাড়ে পাঁচটার সময়ে আমার এক বন্ধুকে চা খেতে বলেছি, তার সঙ্গে খাব।"

আর কোনো কথা না ব'লে সুকুমার ভিতরে প্রবেশ করলে এবং আধ ঘণ্টাটাক পরে ফিরে এসে দেখলে, ঠিক একই স্থানে বিজয়েশ ব'সে আছে।

বিজয়েশ জিজ্ঞাসা করলে, "চা খেলে সুকুমার?"

সহাস্যমুখে সুকুমার বললে, "খেলাম।"

"কমলার সঙ্গে কথা হ'ল?"

"হ'ল।"

"ফল কি হ'ল জানতে পারি কি?"

হাসিমুখে সুকুমার বললে, "ফল যা হ'ল তাতে উভয় পক্ষের প্রত্যেকের আট-আনা ক'রে হার, আর আট-আনা ক'রে জিত।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ, ইলেক্‌শন ব্যাপারে আমি ব্যাকরণের নঞ্‌ অব্যয় হ'য়ে থাকব; অর্থাৎ, হরিনাথ বসুকেও ভোট দেব না, দেবেশ্বর সান্যালকেও দেব না।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বিজয়েশ বললে, "এ ব্যবস্থায় তোমার হয়ত জাত যাবে, কিন্তু অপর পক্ষের পেট ভরবে না।"

"তা যদি না ভরে, তা হ'লে পেটের দোষও দেওয়া যেতে পারে। অক্ষুধা যেমন পেটের একটা পীড়া, অতিক্ষুধাও তেমনি পেটের পীড়া।" ব'লে সুকুমার প্রস্থানোদ্যত হ'ল।

বিজয়েশ বললে, "এরই মধ্যে চললে কেন? একটু ব'স না। একটু পরেই আমার বন্ধু সুরেশ রায় আসবে—আলাপ ক'রে খুশি হবে।"

"একটু তাড়া আছে বড়দা। পাঁচটার সময়ে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা ক'রে আবার ছটার সময়ে আর একটি ভদ্রলোককে দেখা দেবার জন্যে বাড়িতে আমাকে হাজির থাকতে হবে।—চলি।" ব'লে সুকুমার তাড়াতাড়ি তার গাড়িতে গিয়ে বসল।

৩

সন্ধ্যা সাতটার সময়ে কমলার ছোট ভাই অনিমেষ সুকুমারের কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। ছটার সময়ে যে ভদ্রলোক সুকুমারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, তখনো তার কাজ শেষ হয় নি।

অনিমেষকে দেখে সুকুমার বললে, "কি অনিমেষ? কি খবর?"

অনিমেষ বললে, "সেজদিদির একখানা চিঠি আছে।"

হাত বাড়িয়ে সুকুমার বললে, "কই, দাও।"

চিঠি নিয়ে প'ড়ে দেখে সুকুমার বললে, "আচ্ছা, আধ ঘণ্টাটাক পরে তোমাদের বাড়ি উপস্থিত হব। একটু অপেক্ষা ক'রে তুমি আমার সঙ্গেও যেতে পার।"

অনিমেষ বললে, "না, আমার সাইকেল আছে।"

"আচ্ছা, তা হ'লে এস।" ব'লে সুকুমার পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হ'ল।

সাড়ে সাতটার সময়ে সুকুমার কমলাদের গৃহে উপস্থিত হ'ল। বিজয়েশ তার পড়বার ঘরে ব'সে কি একটা লিখছিল, সুকুমারকে দেখে বললে, "এস সুকুমার, এদিকে এস।"

ঘরে প্রবেশ ক'রে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে ব'সে সুকুমার বললে, "আবার কি হুকুম বড়দা?"

মৃদু হেসে বিজয়েশ বললে, "মনে হচ্ছে, এ পক্ষ আধপেটা থাকতে রাজি নয়, ষোল-আনা উদরপূর্তিরই মতলব। আর-খানিকটা আগে এলে সুরেশ রায়ের সঙ্গে দেখা হ'ত। সুরেশও বলছিল, এস্পার কি ওস্পারই ভাল, মধ্যপথ ভাল নয়। মধ্যপথ অবলম্বন করলে অনেক সময়ে ইতোনষ্ট-স্ততোভ্রষ্টঃ হ'তে হয়।"

"সুরেশ রায়টি কে?"

"সুরেশ রায় আমার বিশেষ বন্ধু, একজন আই. সি. এস., সম্প্রতি এক মাসের ছুটি নিয়ে কলকাতায় রয়েছে।"

"বিবাহিত ?"

"না, অবিবাহিত।"

"তবে এমন পাত্রের সঙ্গে কমলার বিয়ের প্রস্তাব করেন নি কেন ?"

"প্রস্তাব করবার সুযোগ পাই নি সুকুমার।"

সকৌতূহলে সুকুমার জিজ্ঞাসা করল, "কেন বলুন ত ?"

"কারণ, আমাদের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করবার আগেই সুরেশ নিজেই প্রস্তাব করেছিল।"

"তারপর ?"

"তারপর আর কি! তিন বৎসর সুরেশের আর্জি শূন্যে ঝুলে রইল। তারপর হঠাৎ একদিন সুকুমার রায়ের আবির্ভাব, আর সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী কমলা কর্তৃক সুরেশ রায়ের নাম খারিজ, আর সুকুমার রায়ের নাম দাখিল।"

বিস্মিতকণ্ঠে সুকুমার বললে, "কেন ?"

"কেন, সে কথা শ্রীমতী কমলাই বলতে পারেন।"

ক্ষণকাল মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সুকুমার বললে, "আচ্ছা বড়দা, আমি যদি আমার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে আবার ওস্পারে গিয়ে হরিনাথ বসুকে সাহায্য করতে উদ্যত হই, তা হ'লে কি এস্পার আবার সুরেশ রায়ের নাম দাখিল করতে পারে না ?"

বিজয়েশ বললে, "এ কথাও শ্রীমতী কমলাই বলতে পারেন।"

তারপর এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "তবে আমিও এ কথা নিশ্চয়ই বলতে পারি যে, কমলা যদি একবার শুধু ইঙ্গিত মাত্র করে তা হ'লে সুরেশ রায় এস্পারের ঘাটে তার নৌকো ভেড়াতে এক মিনিটও বিলম্ব করবে না।"

সুকুমার বললে, "আমি আজ কমলাকে সে ইঙ্গিত করবার জন্যে অনুরোধ করব।"

ঠিক এই সময়ে অন্দরের দিকে যাবার একটা দরজার পর্দা ন'ড়ে উঠল, এবং সেটা এক পাশে স'রে গেলে দেখা গেল শ্রীমতী কমলার কমনীয় মূর্তি।

বিজয়েশ বললে, "আয় কমলা, আয়।" তারপর চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "তোরা দুজনে এই ঘরে ব'সেই না হয় কথা-বার্তা ক'—আমি একটু গেটের কাছে গিয়ে টহল মারি।"

সুকুমার বললে, "আপনিও বসুন না বড়দা, কোনো অসুবিধে হবে না তাতে।"

বিজয়েশ বললে, "ক্ষেপেছ ভাই, তুমি! আসল বস্তু ফুল যখন হাজির, তখন পাতা-বেচারার ঝ'রে পড়াই উচিত।"

বিজয়েশের মন্তব্য শুনে কমলার মুখ টকটকে হ'য়ে উঠল; আর সুকুমার হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "কথাটা বড়দা এখনও ভুলতে পারেন নি দেখছি।"

"এমন চমৎকার একটি উপমার কথা, সে কি সহজে ভোলা যায়?" ব'লে বিজয়েশ ঘর থেকে বারান্দায় নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

সুকুমারের নিকটে একটা চেয়ার অধিকার ক'রে ব'সে কমলা বললে, "সুরেশ রায়ের কথা তোমাকে কে বললে?"

স্মিতমুখে সুকুমার বললে, "কে বললে, সেটা অবান্তর প্রশ্ন; কিন্তু সুরেশ রায়ের সত্তা তুমি কি অস্বীকার করতে পার কমলা?"

চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিত ক'রে কমলা বললে, "সর্বনাশ! সুরেশ রায়ের সত্তা কখনো অস্বীকার করতে পারি! তোমার সত্তা বরং অস্বীকার করতে পারি, তবু সুরেশ রায়ের পারি নে। সুরেশ রায়কে কি ইঙ্গিত করবার জন্যে আমাকে অনুরোধ করবে বলছিলে, কর না?"

স্মিতমুখে সুকুমার বললে, "লুকিয়ে লুকিয়ে সব কথা শোনা হয়েছে দেখছি!"

কমলা বললে, "তা হয়েছে। কি অনুরোধ করবে বলছিলে?"

সুকুমার বললে, "তুমি হয়ত রাগ করছ কমলা, কিন্তু সুরেশ রায়কে না-মঞ্জুর ক'রে আমাকে মঞ্জুর করায় তোমার কত বড় অপরাধ হয়েছে তা জান?"

"কত বড় অপরাধ হয়েছে?"

"কাঞ্চন ফেলে কাচকে আঁচলে বাঁধার অপরাধ। আমি হচ্ছি অতি সামান্য একজন নিরীহ এঞ্জিনীয়ার, আর সুরেশ রায় একজন দুর্দান্ত আই. সি. এস.। কল-কারখানায় আমরা মজুর মিস্ত্রী খাটাই, আর সুরেশ রায়রা সময়ে-সময়ে আমাদের জেল খাটায়।"

সুকুমারের কথা শুনে খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠে কমলা বললে, "তোমার ওপর সুরেশ রায়ের যে রকম রাগ, বাগে পেলে তোমাকে জেল না খাটিয়ে ছাড়বে না।"

কপট দুশ্চিন্তার উদ্বেগ-মিশ্রিত কণ্ঠে সুকুমার বললে, "তা হ'লেই দেখ, তুমি যদি সুরেশ-জায়া হও তা হ'লে বাগে পেলেও তোমার সুপারিশে সুরেশ রায় আমাকে রেহাই দিতেও পারে!"

সুকুমারের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে কমলা বললে, "তেমন রেহাই পাওয়ার চেয়ে তোমার জেল হওয়ার দুঃখ আমাকে অনেক বেশি সুখী করবে।"

কমলার কথা শুনে সুকুমারের দুই চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল। সাগ্রহকণ্ঠে সে বললে, "সত্যি বলছ কমলা? এ কথা সত্যি বলছ তুমি?"

প্রণয়বিগলিত মৃদুকণ্ঠে কমলা বললে, "হ্যাঁ, সত্যি বলছি।"

উৎসাহপ্রদীপ্ত স্বরে সুকুমার বললে, "তা হ'লে আর তোমাকে অদেয় কিছুই রইল না আমার। কি চাই তোমার বল?"

বিস্মিতকণ্ঠে কমলা বললে, "কিছুই অদেয় রইল না?"

"না, কিছুই রইল না।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে ঈষৎ ভীতিকুণ্ঠিত স্বরে কমলা বললে, "তা হ'লে আমার দ্বিতীয় চিঠিতে আমি যা চেয়েছি, তাই আমাকে দাও।"

"দেবেশ্বর সান্যালকে ভোট দেবার প্রতিশ্রুতি?"

"হ্যাঁ।"

"দিলাম। কিন্তু এতে সুখী হবে ত কমলা?"

"হব।"

"চারটের সময়ে যে লোকের আট-আনা সত্তা অধিকার করেছ, আটটার সময়ে তার বাকি আট-আনা অধিকার করার পর তার ওপর শ্রদ্ধা থাকবে ত তোমার? এত সহজে আত্মসমর্পণকারী দুর্বল প্রতিপক্ষের ওপর ভক্তি থাকবে?"

এবার কিন্তু কমলা অত সহজে বলতে পারলে না, থাকবে; মনে যেন কেমন একটা খটকা বাধল। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "আচ্ছা, কেন তুমি এমন ক'রে আত্মসমর্পণ করলে?"

"তোমাকে পাবার জন্যে। না দিলে কি পাওয়া যায় ?"

"পেয়েছিলে ত আমাকে।"

"অনেক বাকি ছিল—এবার হয়ত সব পাব।"

"তার মানে ?"

"তার মানে, এখন যখন তোমার কাছে ষোল-আনা আত্মসমর্পণ করছি, তখন তোমাকেও হয়ত ষোল-আনা পেতে পারি।"

"তার মানে, আমিও তোমার মতের কাছে ষোল-আনা আত্মসমর্পণ করতে পারি, সেই কথা বলতে চাও না-কি তুমি ?"

এক মুহূর্ত চিন্তা ক'রে সুকুমার বললে, "যদি আত্মসমর্পণ কর ত বিস্মিত হব না।"

সুকুমারের উত্তর শুনে সহসা কমলার মেজাজ বিগড়ে উঠল। ক্ষণকাল নির্বাক থেকে ঈষৎ কঠোর স্বরে সে বললে, "দেখ, কিছু মনে ক'রো না, কিন্তু এতটা প্রত্যাশা তোমার উচিত হয় না। তুমি হয়ত জান না, আমি একজন অতি উগ্র আর গোঁড়া প্রকৃতির কমিউনিস্ট্।"

সহজ স্বরে সুকুমার বললে, "জানি। আর, জানি ব'লেই তোমার প্রতি এত মোহ আমার। কিছু মনে ক'রো না কমলা, তোমার যেমন সুরেশ রায় আছে, আমারও তেমনি বিনতা, মাধুরী, নলিনী আছে ;— কিন্তু কেউ তারা তোমার মতো কমিউনিস্ট্ নয়।"

এ কথার উত্তরে কমলা কিছু বললে না। ক্ষণকাল উভয়ে নির্বাক হ'য়ে ব'সে রইল। মৌন ভঙ্গ করলে কমলা ; বললে, "তুমি যে দেবেশ্বর সান্যালকে ভোট দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছ, সে কথা বড়দাকে বলতে পারি ?"

সুকুমার বললে, "নিশ্চয় পার। শুধু বড়দাকে কেন, যে-কোনো লোককে ইচ্ছে বলতে পার। বড়দাকে ত আমি নিজেই ব'লে যাব ; বাড়ি গিয়েও সকলকে বলব।"

ঔৎসুক্য সহকারে কমলা বললে, "সকলকে বলবে ? বলতে মনে কুণ্ঠা হবে না ?"

সহজ স্বরে সুকুমার বললে, "তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, সে কথা বলতে কুণ্ঠা কেন হবে ? আত্মসমর্পণ করা ত আমাদের গুরু-নির্দিষ্ট প্রণালী। ভুলে গেছ কমলা, এক সময়ে মহাত্মা গান্ধী

সমস্ত হিন্দু-সম্প্রদায়ের ভাগ্য জিন্না সাহেবের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। জিন্না সাহেব কিন্তু সে দায়িত্ব নিতে সাহস করেন নি—পেছিয়ে গেছলেন।"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুকুমার বললে, "আর দেরি করব না, চললাম। আবার, বাড়ি গিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে বিছানাপত্র নিয়ে তোমাদের বাড়ি আসতে হবে।"

বিস্মিত হ'য়ে কমলা বললে, "কেন?"

সুকুমার বললে, "ইলেকশন পর্যন্ত বাড়িতে থাকব না স্থির করেছি। একটা বাসা কিংবা কোনো হোটেলে ঘর খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু যে কয়েক দিন তার ব্যবস্থা না করতে পারি, তোমাদের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নেই।"

"কেন, বাড়িতে থাকবে না কেন?"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে সুকুমার বললে, "সেটা উচিত হবে না কমলা। আমাদের বাড়ির যা মন্ত্র, যা আমাদের বাড়ির প্রাণধারা, ষোল-আনা তার বৈরী হ'য়ে সেই বাড়িতে বাস ক'রে অপর সকলকে বিব্রত ক'রে রাখা সত্যিই আমার পক্ষে অবিবেচনার কাজ হবে। তোমরা যেমন গোঁড়া কমিউনিস্ট্, আমাদের বাড়িও তেমনি নিষ্ঠাবান কংগ্রেসধর্মী; আমার ছোট ভাইরা আমাকে গুরুর মতো মান্য করে; কমিউনিস্ট্ পার্টিতে যোগদান ক'রেও আমি যদি তাদের মধ্যেই বাস করতে থাকি, তা হ'লে তারা এই অত্যন্ত কর্মতৎপরতার সময়ে কাজ করবার জুত পাবে না। হয়ত তারা মনে করবে, সমস্ত আবহাওয়াটা বিষাক্ত ক'রে দিয়ে আমি তাদের ক্রিয়াশীলতার হানি করছি।"

বিস্মিত-বিরক্ত কণ্ঠে কমলা বললে, "বিষাক্ত ক'রে দিয়ে!"

"তারা হয়ত তাদের মনের মধ্যে সেই রকম মনে করবে। আমার মনের ওপর যতটা পরিবর্তন তুমি দাবি করতে পার, তাদের মনের ওপর নিশ্চয়ই ততটা পার না।"

"আমাদের বাড়ি তুমি বাস করতে এলে আমি কিন্তু ভারি লজ্জা পাব।"

"তুমি পাবে লজ্জা, কিন্তু আমি পাব আশ্রয়। লজ্জা পাওয়ার চেয়ে আশ্রয় পাওয়া অনেক প্রয়োজনীয় ব্যাপার।"

"কিন্তু তুমি কি এ ছাড়া আর অন্য কোনো রকম ব্যবস্থা করতে পার না?"

কমলার কথা শুনে সুকুমার হেসে ফেললে; বললে, "গোঁড়া কমিউনিস্ট হ'য়ে তোমার মনে এত কিন্তু কেন কমলা? এত অবলীলাক্রমে একজন কংগ্রেসপন্থীর মন অধিকার ক'রে দু-চার দিনের জন্যে তার দেহ অধিকারে রাখতে যদি ভয় পাও, তা হ'লে তোমার গোঁড়ামিতে আমি সন্দেহ করব।" ব'লে সে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে গেল।

বিজয়েশ তখনও গেটের কাছে টহল মারছিল। তার কাছে উপস্থিত হ'য়ে সুকুমার বললে, "লাল ঝণ্ডেকী জয়; দেবেশ্বর সান্যালকে ভোট দিতে আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি বড়দা।"

উৎফুল্লস্বরে বিজয়েশ বললে, "Good! I congratulate you lucky dog! এখন আর তোমাকে বলতে আপত্তি নেই, সুরেশ রায় তোমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হ'য়ে উঠেছিল। কিন্তু সে ভয় আর রইল না তোমার।"

হাসিমুখে সুকুমার বললে, "না, আর রইল না। এখন আমি বাড়ি চললাম বড়দা—খাওয়াদাওয়া সেরে কিছুক্ষণ পরে জিনিসপত্র নিয়ে আসছি, বাইরের কোনো ঘরের এক কোণে আমার জন্যে একটু জায়গা ক'রে রাখবেন।"

কমলারই মতো বিস্মিত গভীর কণ্ঠে বিজয়েশ বললে, "কেন?"

"দু-চার দিন আপনাদের বাড়িতে বাস করব।"

"কারণ?"

কমলাকে সুকুমার যে কারণ এবং যুক্তি দেখিয়েছিল, বিজয়েশকেও তাই দেখালে।

সমস্ত শুনে গম্ভীর মুখে বিজয়েশ বললে, "তুমি কিন্তু রাগ করছ সুকুমার!"

সহাস্যমুখে সুকুমার বললে, "প্রথমত রাগ করছি নে। আর দ্বিতীয়ত, যদিই বা একটু ক'রে থাকি তাতে আপনার রাগ করা উচিত নয়। মনটা শুধু আপনাদের পছন্দমতো ছাঁটাই ক'রে নিলেই হবে না, আবার প্রসন্ন হ'য়ে হাসিমুখে সে কার্য করতে হবে, এতটা প্রত্যাশা করা আমার প্রতি অবিচার হবে বড়দা।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বিজয়েশ বললে, "তা হ'লে তুমি পরিহাস করছ!"

"ঘণ্টাখানেক পরে বুঝতে পারবেন, পরিহাসও করছি নে।" ব'লে সুকুমার প্রস্থান করলে।

৪

পরিহাস সুকুমার করছিল না, রাগও হয়ত বা করছিল না; কিন্তু তাই ব'লে যে সত্যসত্যই সে জিনিসপত্র নিয়ে তাদের বাড়িতে বাস করতে আসবে, এ কথাও বিজয়েশ কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু রাত্রি সাড়ে নটার সময়ে বিছানাপত্র সহ সুকুমারের গাড়ি যখন গেটের সম্মুখে এসে দাঁড়াল, তখনই যথার্থভাবে বিজয়েশের মনে বিস্ময় দেখা দিল। কিন্তু বিস্ময় যত বেশি পরিমাণেই দেখা দিক না কেন, অপ্রত্যাশিত আতিথ্যের জন্য তখন আর ব্যস্ত না হ'য়ে উপায় ছিল না।

একে একে সকলেই এসে জুটতে লাগল। কেউ করলে আনন্দ প্রকাশ, কেউ করলে পরিহাস, কেউবা শুধু হর্ষবিস্ময়োৎফুল্ল মুখের নির্বাক হাস্যের দ্বারা সম্মানার্হ অতিথির অভ্যর্থনা করলে। একমাত্র যে-ব্যক্তি না এসে সকলের অলক্ষিতে শয্যাগ্রহণ করলে এবং সমস্ত গৃহ সুষুপ্ত হ'য়ে যাবারও বহুক্ষণ পর পর্যন্ত বিনিদ্র হ'য়ে কাটালে, সে কমলা।

বিজয়েশের পড়বার ঘরের পাশের কক্ষের এক কোণে একটা ক্ষুদ্র পালঙ্ক ছিল। চতুর্দিক দেখে শুনে তারই উপর সুকুমার তার আস্তানা গাড়বার অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে। গৃহনিবাসী এবং গৃহনিবাসিনীদের পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সুতীব্র প্রতিবাদ উত্থিত হ'ল। বিজয়েশের স্ত্রী উর্মিলা তার দ্বিতলের দক্ষিণমুখ শয়নকক্ষ সুকুমারের ব্যবহারে অর্পিত করবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জানালে। অনিমেষ তার ত্রিতলের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ সুকুমারকে ছেড়ে দেবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করলে, আরও অনেকের দিক থেকে অনেক প্রকার প্রস্তাব-প্রসঙ্গ উপস্থিত হ'ল, সুকুমার কিন্তু সকলের অনুরোধ কাটিয়ে নিজের ব্যবস্থাই কায়েম করলে।

পরদিন সকাল সাতটার সময়ে চা পান ক'রে স্থকুমার তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। চা-পানের সময়ে গৃহের অনেকেই উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের মধ্যে দেখা যায় নি কমলাকে।

অফিসের পর সিনেমা দেখে হোটেলে ডিনার খেয়ে স্থকুমার যখন কমলাদের গৃহে উপস্থিত হ'ল, তখন রাত্রি দশটা। বিজয়েশ তার পড়বার ঘরে ব'সে লেখাপড়ায় রত ছিল, স্থকুমারকে দেখে বললে, "সকালে খেতে এলে না স্থকুমার ?"

স্থকুমার বললে, "অফিসে খেয়েছিলাম বড়দা।"

"চা খেতে বিকেলে এলে না কেন ?"

"চা-ও অফিসে খেয়েছিলাম।"

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বিজয়েশ বললে, "চল, এবার খেতে যাওয়া যাক। অনেক রাত্রি হয়েছে, আর দেরি ক'রে কাজ নেই।"

বিস্মিতকণ্ঠে স্থকুমার বললে, "আপনি এখনও খান নি না-কি ?"

"তোমাকে ফেলে খেতে পারি কখনো ?"

"কি সর্বনাশ! আমি যে খেয়ে এসেছি বড়দা!"

অবাক হ'য়ে স্থকুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বিজয়েশ বললে, "খেয়ে এসেছ! কেন, আমাদের বাড়ি খাবে না না-কি তুমি ?"

ব্যগ্রকণ্ঠ স্থকুমার বললে, "সে কি কথা বলছেন! আজ সকালেও ত আপনাদের বাড়ি চা খেয়েছি।"

"আচ্ছা, তা হ'লে শুয়ে পড়, আমি একাই খেতে চলি।" ব'লে বিজয়েশ অন্দরের দিকে অগ্রসর হ'ল।

পরদিন অতি প্রত্যুষে চা খাবার পূর্বেই স্থকুমার প্রস্থান করলে। যাবার আগে একটা স্লিপ লিখে একজন চাকরের হাতে দিয়ে গেল :—অনিমেষ, বউদিদিকে জানিও আজও আমি রাত্রে খেয়ে ফিরব।

সেদিন কমলা এবং স্থকুমারের পরস্পরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হ'ল না; পরদিনও না।

পঞ্চম দিনের প্রত্যুষেও স্থকুমার সকলের অগোচরে স'রে পড়বার মতলবে ছিল, কিন্তু হঠাৎ কমলা এসে উপস্থিত হ'ল।

কমলাকে দেখে সুকুমারের মুখে হাসি দেখা দিলে; বললে, "কি কমলা? খবর কি?"

একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে কমলা বললে, "ভাল।"

"এত সকালে উঠে আমার ঘরে এসেছ, লোকে দেখলে বলবে কি? পালাও শীগগির।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে কমলা বললে, "তিন দিন খেলে কোথায়? বাড়িতে?"

"সর্বনাশ! বাড়ি থেকে যে বেচারা নির্বাসিত হ'য়ে আছে, বাড়িতে সে খাবে কোন্ মুখে?"

"তবে কোথায় খেলে?"

"কেন, কলকাতায় খাওয়ার জায়গার অভাব আছে কিছু?"

"স্নান করলে কোথায়?"

"কেন, অফিসে। অফিসে আমার নিজস্ব বাথরুম আছে।"

"রাত কাটাবার একটু জায়গা হয় না অফিসে? কোনোরকম ক'রে, কষ্টেস্ষ্টে?"

কি ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে সুকুমার বললে, "অফিসে কি ক'রে রাত কাটাবার জায়গা হবে?" তারপর হঠাৎ সচেতন হ'য়ে উঠে উল্লসিত মুখে বললে, "হয়, হয়। নিশ্চয় হয়, চমৎকার হয়! আমার খাস কামরায় একটা সিঙ্গল-বেড্ খাট পেতে নিলে রাত কাটাবার আর কোনো অসুবিধেই থাকে না। Thank you কমলা। ভারি খেয়াল করিয়ে দিয়েছ তুমি! আজই ম্যানেজারকে জানিয়ে একটা খাট কিনে পাতিয়ে নোব। অফিসে ব্যবস্থা হ'য়ে গেলে, ন মাসই বা কি আর ছ মাসই বা কি, বাড়ি ছেড়ে থাকার কোনো অসুবিধেই আর থাকবে না।"

মুখ টিপে অল্প একটু হেসে কমলা বললে, "ন মাসের কথা আপাতত না হয় ছেড়েই দিই,—ছ মাস যদি অফিসে থাক, তা হ'লে চৌঠা বৈশাখ বরযাত্রী কি অফিস থেকেই আসবে? আর, ফুলশয্যে অফিস-ঘরেই হবে?"

কমলার কথা শুনে সুকুমারের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল। "ওহো—হো—হো—হো; তাও ত বটে। তবে, অবশ্য, শেষ পর্যন্ত তার

জন্যে কিছু আটকাত না। যেখানেই থাকি না কেন, চৌঠো বৈশাখের আগে বউদিদি টিকি ধ'রে বাড়ি নিয়ে যাবেনই। অফিসে রাত কাটাবার ব্যবস্থা আজই কিন্তু ঠিক ক'রে ফেলব। যে-কটা দিন গৃহহীন হ'য়ে থাকতে হয়, অফিসেই না-হয় থাকা যাবে। আচ্ছা, চলি এবার।"

"চা খাবে না?"

"সন্ধ্যাবেলা বিছানাপত্র নিতে এসে খাব। সে সময়ে চায়ের টেবিলে তুমি উপস্থিত থেকো কমলা।"

কমলা বললে, "উপস্থিত থাকব কি-না বলতে পারি নে, তবে তোমার চা খাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয় করব।"

"আচ্ছা, চলি তা হ'লে।"

"এস।"

৫

কিছুদিনের জন্য সুকুমারের অফিসে বাস করার প্রস্তাবে সম্মত হ'তে ম্যানেজারের এক মুহূর্ত বিলম্ব হ'ল না। মুখে বললে, "তাতে যদি কোনো দিক দিয়ে তোমার সুবিধে হয়, আমি খুশিই হব সুকুমার।" মনে মনে বললে, যদি অফিসের তাতে কিছু সুবিধে হয়, তা হ'লে আরও খুশি হব।

সন্ধ্যা ছটার সময়ে সুকুমার কথামতো কমলাদের গৃহে উপস্থিত হ'ল।

বিজয়েশ বাইরে বারান্দায় ব'সে ছিল; সুকুমারকে দেখে বললে, "এস সুকুমার, ব'স। তোমার জন্যে একটা বিচিত্র খবর আছে।"

সকৌতূহলে সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, "কি খবর বলুন ত?"

ক্ষণকাল চুপ ক'রে থেকে বিজয়েশ বললে, "কমলা বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেছে।"

গভীর বিস্ময়ের উৎকণ্ঠিত স্বরে সুকুমার বললে, "বাড়ি ছেড়ে চ'লে গেছে? কোথায় গেছে সে?"

"তোমাদের বাড়ি।"

"আমাদের বাড়ি? ঠিক জানেন ত, আমাদের বাড়ি?"

"হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। অনিমেষ তাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছে।"

সুকুমারের দুই চক্ষু উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল।

বিজয়েশ বললে, "একটু অন্যায় রকম জেদ ক'রে গেছে, সেইটেই আমাকে দুঃখ দিয়েছে বেশি। অন্তত তোমার আসা পর্যন্ত তার অপেক্ষা করা উচিত ছিল।"

সুকুমার জিজ্ঞাসা করলে, "কিছু লিখে রেখে গেছে আমার জন্যে?"

"একটি লাইনও না।"

"কিছু ব'লে গেছে আমাকে বলতে?"

"এক বর্ণও নয়। শুধু ব'লে গেছে, তোমাকে যেন ভাল ক'রে চা খাওয়ানো হয়।"

স্মিতমুখে সুকুমার মনে মনে বললে, 'এই হচ্ছ তুমি কমলা! এই হচ্ছে তোমার অদ্ভুত প্রকৃতি। আর, হে আমার কমিউনিস্ট্ প্রিয়া, এই জন্যেই তোমার ওপর এত আমার মোহ।' তারপর অনুচ্চকণ্ঠে কতকটা স্বগত উক্তির মতো বলতে লাগল, "এমনি-একটা কিছু হবে, তা আমি জানতাম; কিন্তু এত শীগগির হবে, তা অবশ্য ভাবি নি।"

কথাটা বিজয়েশের কানে গেল। মৃদুস্বরে সে বললে, "তোমার জয় হয়েছে সুকুমার—লাল পতাকার আজ পরাজয়।"

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে তেমনি অনুচ্চকণ্ঠে সুকুমার বললে, "দুর্গতের বুকের রক্তে যে পতাকা লাল, সে লাল পতাকার পরাজয় নেই।"

নাস্তিক

১

পুত্রের নামকরণের সময় উমাশঙ্করের পিতা এ কথা স্বপ্নেও মনে করেন নাই যে, যে-পুত্রের মধ্যে তিনি একাধিক দেবতার নাম অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিলেন, কালক্রমে সে সকল-প্রকার দৈব প্রভাব অতিক্রম করিয়া নাস্তিক হইয়া উঠিবে। যে বয়সে সাধারণত মানুষের ধর্মলক্ষণ প্রকট হয় না, উমাশঙ্করের সেই বাল্যকালে তাহার পিতা পরলোকগমন করিয়া একটা কঠোর আঘাতের হাত হইতে বাঁচিয়া গেলেন। কিন্তু

জীবনের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে যাইবার অপরাধে জননী সারদেশ্বরীকে একদিন সে শাস্তি ভোগ করিতে হইল।

উমাশঙ্কর তখন কলেজে এম. এ. পাঠকালে কয়েকজন সহপাঠী এবং বন্ধুবান্ধব লইয়া 'নিরীশ্বর সংঘ' খুলিয়া একান্ত মনে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ঈশ্বর বিষয়ক গবেষণায় রত হইয়াছে। ঈশ্বর নাই, অন্তত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্তোষজনক প্রমাণ নাই, সমস্ত ঈশ্বরবাদ মানুষের দুর্বল চিত্তের সংশয়, অথবা সবল চিত্তের কৌশলের উপর স্থাপিত, এইরূপ একটা ধারণা যখন তাহার মনের মধ্যে শিকড় গাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন একদিন সে তাহার পারিবারিক সংসারকেও 'নিরীশ্বর সংঘে'র এলাকাভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইল।

দৈনন্দিন নারায়ণ পূজা শেষ করিয়া কুলপুরোহিত প্রস্থান করিবার পর আহ্নিক এবং পূজা সমাপন করিয়া সারদেশ্বরী সবেমাত্র জলযোগ সারিয়াছেন,—এমন সময়ে উমাশঙ্কর আসিয়া বলিল, "মা, মিথ্যার পেছনে অনেক অর্থ আর সময়ের অপব্যয় হয়েছে,—এবার বন্ধ করা যাক।"

বিস্মিত নেত্রে উমাশঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সারদেশ্বরী বলিলেন, "তোর কথা আমি বুঝতে পারছি নে উমা। কিসের অপব্যয় হ'ল ?"

উমাশঙ্কর বলিল, "দেবসেবায়, তোমাদের নারায়ণসেবায়। নারায়ণই যখন নেই, তখন নারায়ণের একটা পাথুরে প্রতিনিধির উপর সময় ও অর্থ নষ্ট ক'রে কি লাভ হবে মা ?"

কথাবার্তা তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়া পুত্রের মতিগতির কিঞ্চিৎ পরিচয় সারদেশ্বরী পূর্বেই পাইয়াছিলেন; কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে যে এতটা অগ্রসর হইয়াছে, তাহা মনে করিতে পারেন নাই। মনে মনে 'নারায়ণ নারায়ণ' স্মরণ করিয়া আহত স্বরে বলিলেন, "এ কি কথা বলছিস তুই উমা! তুই ঈশ্বর মানিস নে ? ধর্ম মানিস নে ?"

মৃদু হাসিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "মানবো না কেন মা, মানি। কিন্তু আমার ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর নয়; আর আমার ধর্মও তোমাদের ধর্ম নয়। আমার ঈশ্বর হচ্ছেন নীতি, আর আমার ধর্ম হচ্ছে যুক্তি। আমার

ঈশ্বরের আসন হচ্ছে আমার বিবেক, আর আমার ধর্মের আশ্রয় হচ্ছে আমার বুদ্ধি।"

পুত্রের কথা শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া সারদেশ্বরী বলিলেন, "তুই কি বলতে চাস, যুক্তি আর নীতি শুধু তোরই আছে, আমাদের নেই?"

উমাশঙ্কর বলিল, "থাকবে না কেন মা, তোমাদেরও আছে; তবে তোমাদের যুক্তি আর নীতির অনেকখানি অংশই বন্দী হ'য়ে আছে তোমাদের তেত্রিশ কোটি পাষাণ-দেবতার কারাগারে। কিন্তু সে কথা যাক। তুমি যদি অনুমতি দাও, তা হ'লে নারায়ণকে বিসর্জন দিয়ে আসি তোমাদের মা-গঙ্গার গর্ভে।"

উমাশঙ্করের প্রস্তাব শুনিয়া একটা গভীর বেদনায় সারদেশ্বরীর মুখ পাংশু হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "আমার আপত্তি নেই উমা, যদি তুই নারায়ণের সঙ্গে আমাকেও বিসর্জন দিয়ে আসিস। কিন্তু 'তোমাদের মা-গঙ্গার গর্ভে' বলছিস কেন? তোরও কি মা-গঙ্গা নয়?"

ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া উমাশঙ্কর বলিল, "নিশ্চয়ই নয়। গঙ্গাও আমার মা-গঙ্গা নয়, গাভীও আমার মা-গাভী নয়। আমার একটি মাত্র মা হচ্ছেন মা-জননী, যাঁর স্নেহের নীরে ডুব দিয়ে আমি পবিত্র হই। গাভী আমার কাছে চতুষ্পদ জন্তু, আর গঙ্গা সুবৃহৎ নদী।" বলিয়া উমাশঙ্কর হাসিতে লাগিল।

যাহা হউক, জননীর অভিমানের খাতিরে এবং স্ত্রী মন্দাকিনীর ওকালতির জোরে সে যাত্রায় নারায়ণ গঙ্গাযাত্রা হইতে রক্ষা পাইয়া গেলেন।

গুরুর নিকট সদুপদেশ পাইলে হয়ত উমাশঙ্করের মনে ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ধর্মভাব জাগ্রত হইতে পারে, এই বিশ্বাসে সারদেশ্বরী কুলগুরু অমরনাথ বিদ্যাভূষণের শরণাপন্ন হইলেন।

অমরনাথ আসিয়া সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "এ হচ্ছে ইংরিজী শিক্ষার কুফল। আমি ঠিক ক'রে দিচ্ছি।"

একেবারে চরম পরিণতির শাখা ধরিয়া টান দিবার অভিপ্রায়ে উমাশঙ্করের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অমরনাথ বলিলেন, "সময় হয়েছে তোমার; দীক্ষা গ্রহণ কর উমাশঙ্কর।"

অমরনাথের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "কিসের দীক্ষা ?"

অমরনাথ বলিলেন, "গুরুমন্ত্রের।"

উমাশঙ্কর বলিল, "ও! কিন্তু গুরুমন্ত্র দেবে কে ?"

প্রশ্নের ভঙ্গি শুনিয়া 'আমি দোব' বলিতে অমরনাথের ঠিক সাহস হইল না। বলিলেন, "কেন, গুরু দেবেন।"

এক মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "আপত্তি নেই, যদি সত্যি-সত্যিই তিনি গুরু হন,—অর্থাৎ, যদি তাঁর তুলনায় আমি লঘু ব'লে প্রমাণিত না হই।"

উমাশঙ্করের কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া অমরনাথ বলিলেন, "তুমি কি নিজেকে এতই গুরু ব'লে বিবেচনা কর, উমাশঙ্কর ?"

উমাশঙ্কর বলিল, "আজ্ঞে না,—আমি নিজেকে এত লঘু ব'লে বিবেচনা করি নে, যাতে বিনা প্রমাণে কাউকে গুরু ব'লে স্বীকার করতে পারি।"

"কি প্রমাণ তুমি চাও ?"

"ঈশ্বর প্রমাণ। আপনি হয়ত জানেন ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমি বিশ্বাস করি নে। যিনি আমার কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন, তাঁকে আমি গুরু ব'লে গ্রহণ করব।"

"তুমি কি ইউরোপীয় নিরীশ্বরবাদের সাহায্যে তর্ক করবে ?"

"আজ্ঞে না, আমি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্য দিয়েই বিচার কামনা করি।"

তখন আরম্ভ হইল প্রশ্নের পর উত্তর, উত্তরের পর প্রত্যুত্তর, বিচারের পর তর্ক এবং তর্কের পর বিতর্ক ; ন্যায় এবং বৈশেষিক, সাংখ্য এবং পাতঞ্জল লইয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা চলিল ; কিন্তু সেই তর্কের ধূলিজালের মধ্যে দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া কোনো দিকেই অমরনাথ ঈশ্বরকে খাড়া করিবার পথ খুঁজিয়া পাইলেন না।

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরিয়া উমাশঙ্করের যুক্তিজালে ক্ষতবিক্ষত হইয়া অবশেষে অমরনাথ বলিলেন, "তুমি কূট তার্কিক। তোমাকে পরাজিত করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি তোমার কুলগুরু, আমার ক্ষেত্রে যাচাই

করবার প্রয়োজন নেই, উমাশঙ্কর। আমার কাছে তুমি দীক্ষা নাও,—তোমার মঙ্গল হবে।"

যুক্তকরে উমাশঙ্কর বলিল, "ক্ষমা করবেন আমাকে। বিনা যাচাইয়ে ভগবানকে যে গ্রহণ করে নি, সে পাষণ্ড বিনা যাচাইয়ে গুরুকে গ্রহণ করবে এমন ভরসা আপনাকে আমি দিতে পারি নে।"

মনে মনে কয়েকবার উমাশঙ্করকে পাষণ্ড বলিয়া গালি দিয়া সারদেশ্বরীর নিকট উপস্থিত হইয়া অমরনাথ বলিলেন, "তোমার ছেলের ব্যাধি কঠিন। আজ আমি কিছু ওষুধ দিয়ে গেলাম। কিছুকাল পরে আবার আসব।"

অন্তরালে থাকিয়া সারদেশ্বরী সব কিছুই শুনিয়াছিলেন, এবং কাহার ঔষধ কে কতটা পান করিয়াছিল তাহাও খানিকটা বুঝিয়াছিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, "আসবেন।"

কিন্তু গুরু আসিবার পূর্বেই সারদেশ্বরীর নিকট পরলোকের ডাক আসিয়া পৌঁছিল। মৃত্যুর কিছু পূর্বে পুত্রবধূর কানে কানে তিনি বলিলেন, "আমি ত চললাম বউমা, কিন্তু অনেক দুঃখে-কষ্টে তোমার সংসারের মধ্যে কল্যাণের যে ক্ষীণ প্রদীপটি জ্বালিয়ে রেখে গেলাম, তুমি তাতে সাধ্যমতো তেল-সলতে জুগিও।"

মন্দাকিনীর কণ্ঠ তখন বাষ্পাবরুদ্ধ হইয়াছিল, কোনো উত্তর দিতে পারিল না।

২

বৎসর ছয়েক পরের কথা। এম. এ. এবং আইন পাস করিয়া উমাশঙ্কর তখন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতেছে। নিরীশ্বর সংঘের কোন চিহ্নই আর কোথাও দেখা যায় না, এবং উমাশঙ্কর ব্যতীত সে সংঘের অপর সকল সদস্য নিরীশ্বরবাদের সাময়িক শখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া প্রসন্নচিত্তে ঈশ্বরের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়াছে।

উমাশঙ্কর কিন্তু ইত্যবসরে তাহার মত পরিবর্তিত করিবার কোনও কারণ খুঁজিয়া পায় নাই। পরন্তু সমধিক অধ্যয়ন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারা পুষ্টতর হইয়া সে মত এমন একটা সহজ এবং

শান্তরূপ ধারণ করিয়াছে, যাহা প্রতিপক্ষকে তত ক্ষুব্ধ করে না, যত চিন্তিত করে। এই প্রতিপক্ষের মধ্যে আবার এমন এক ব্যক্তি আছে, যে উমাশঙ্করের বলিষ্ঠ মতবাদকে বাহিরে আক্রমণ করে যে পরিমাণে, ভিতরে ঠিক সেই পরিমাণেই অশ্রদ্ধা করে না। সে তাহার স্ত্রী মন্দাকিনী।

এ কথা মন্দাকিনীর দিদি আমোদিনী একদিন বেড়াইতে আসিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল, যখন উমাশঙ্করের বিষয়ে আলোচনা-প্রসঙ্গে মন্দাকিনী বলিয়াছিল, "না দিদি, ওঁর জন্যে সংসারের আবহাওয়া ক্রমশ বিষিয়ে উঠবে—এ ভয় তুমি একেবারেই ক'রো না। ওঁর অবিশ্বাস কি সাধারণ লোকের বাজে অবিশ্বাস যে, তার ফল মন্দ হবে? আমার ত মনে হয় ভগবান ওঁর যুক্তি-বিচার দেখে যতটা প্রসন্ন হন, অনেকের ফুলচন্দনেও ততটা হন না। মতের জোর ওঁর যত বেশি, জুলুম ওঁর তত কম। তাই এত বড় নাস্তিকের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজো থেকে আরম্ভ ক'রে চাপড়া-ষষ্ঠী পর্যন্ত কিছুই বাদ প'ড়ে না।"

মন্দাকিনীর কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে আমোদিনী বলিয়াছিল, "তা হ'লে আমি আর মিথ্যে ভয় করছিলাম কোথায়, মন্দা? উমাশঙ্করের মতের ওপর যে-রকম তোর ভক্তি দেখছি, তাতে ত ওর দলে তুই যোগ দিলি ব'লে।"

উত্তরে মন্দাকিনী বলিয়াছিল, "ক্ষেপেছ দিদি! আমি চলি বিশ্বাসের সহজ পথে, উনি চলেন জ্ঞানের কঠিন পথে;—আমার সাধ্য কি যে, ওঁর দলে যোগ দিই।"

আমোদিনী বলিয়াছিল, "সে তোদের কথা তোরা বুঝবি, কিন্তু আমাদের একটু লজ্জা করে ভাই। দুর্গাপূজার সময়ে নিমন্ত্রণে গিয়ে উমাশঙ্কর প্রতিমার সামনে দশ মিনিট দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু একবার মাথা হেঁট করলে না; দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু অসুরের মুখভঙ্গিরই সুখ্যাতি করতে লাগল। ও চ'লে আসার পর শ্বশুর আমাকে বললেন, 'সেজ বউমা, তোমার ভগ্নিপতিটি দেখছি দ্বিতীয় চার্বাক মুনি।'"

ইহার উত্তরে মন্দাকিনী বলিয়াছিল, "তোমাদের যদি লজ্জা করে, তা হ'লে পুজো-পার্বণের সময়ে ওঁকে না হয় আর নিমন্ত্রণ ক'রো না,—কিন্তু তোমার শ্বশুর ওঁকে চার্বাক মুনি বলেছেন শুনলে উনি খুশিই হবেন, চার্বাক মুনির ওপর ওঁর শ্রদ্ধার অন্ত নেই।"

৩

হাইকোর্টের দীর্ঘ ছুটি চলিয়াছে। অফিস-ঘরে বসিয়া উমাশঙ্কর একটা ফার্স্ট আপীলের ব্রিফ দেখিতেছিল, মন্দাকিনী আসিয়া বলিল, "বাসি কাপড় নয় ত ?"

সহাস্যমুখে উমাশঙ্কর বলিল, "না না, বাসি কাপড় নয়। নাস্তিক স্বামীকে নিয়ে তুমি যে সর্বদা সিঁটিয়েই আছ, মন্দা !"

সে কথার উত্তর না দিয়া মন্দাকিনী বলিল, "নাও, হাঁ কর।"

বিনা অনুসন্ধানে এবং বিনা প্রতিবাদে হাঁ করিয়া মন্দাকিনীর হস্ত-বিচ্যুত দ্রব্য গ্রহণ এবং গলাধঃকরণ করিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "মন্দ লাগল না। কিন্তু এটি কোন্ পদার্থ ?"

"ইতুপুজোর প্রসাদ।"

"ইতুপুজোর ? ইতুও একজন দেবতা নাকি ?"

"হ্যাঁ, জাগ্রত দেবতা।"

উমাশঙ্কর বলিল, "তোমাদের তেত্রিশ কোটিই ত ঘুমন্ত দেবতা ; ইতু কি তা হ'লে তেত্রিশ কোটির বাইরে ?"

চক্ষে ভ্রূকুটির শাসন হানিয়া মন্দাকিনী বলিল, "সব কথা নিয়ে ঠাট্টা করতে নেই।"

উমাশঙ্কর বলিল, "আচ্ছা, তা না হয় না-ই করলাম, কিন্তু মাকে নিয়ে তবু পার ছিল, তুমি যে মাকেও হার মানালে মন্দা! আজ মঙ্গলবার, কাল তালনবমী, পরশু শীতলষষ্ঠী, তার পরদিন ইতুপুজো,—কি ব্যাপার বল দেখি ?"

স্মিতমুখে মন্দাকিনী বলিল, "কি করি বল ? সংসারের দাঁড়িপাল্লায় তুমি আছ এক দিকে, আর আমি আছি আর-এক দিকে। এখন, তুমি যদি তোমার দিকে অবিরত বাটখারা চাপাতে আরম্ভ কর, তা হ'লে আমাকেও ত তেত্রিশ কোটি থেকে একটি একটি ক'রে আমার দিকে চড়িয়ে পাল্লা সমান রাখতে হয়। আমার দিকটা বেশি হাল্কা হ'লে তুমি যে একেবারে মাটিতে গিয়ে ঠেকবে !"

সহাস্যমুখে উমাশঙ্কর বলিল, "মাটিকে আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু স্বর্গকে করি নে। দোহাই মন্দা, তোমার তেত্রিশ কোটি দেবতাকে

পাল্লায় চড়িয়ে আমাকে স্বর্গে ঠেলে তুলো না,—সেখানে তোমাদের ভগবানের সঙ্গে দেখা হ'য়ে যাবার ভয় আছে।"

মন্দাকিনী বলিল, "মাটিতেই ভগবানের সঙ্গে তোমার দেখা হবে।" তাহার পর সহসা আমোদিনীর কথা মনে পড়িয়া গিয়া উৎফুল্লমুখে বলিল, "কাল দিদি এসেছিলেন। কি বলছিলেন জান?"

"কি বলছিলেন?"

"বলছিলেন, দিন দিন তুমি যে-রকম প্রবল নাস্তিক হ'য়ে উঠছ, একদিন ভগবানই তোমাকে এসে দেখা দেবেন।" বলিয়া মন্দাকিনী হাসিতে লাগিল।

উমাশঙ্কর বলিল, "বেশ ত, তোমার দিদির বাড়িতে ভগবানের সর্বদা যাতায়াত আছে, একদিন পাঠিয়ে দিতে ব'লো, কোলাকুলি করা যাবে।"

৪

দিন দুয়েক পরে উমাশঙ্কর সেই ফার্স্ট আপীলের ব্রিফটা লইয়া তাহার অফিস-ঘরে বসিয়াছে। কোর্ট খুলিলে মকদ্দমাটার প্রথম সপ্তাহেই উঠিবার সম্ভাবনা।

নিম্ন আদালতের রায়ের সুবিধার এবং অসুবিধার অংশগুলা সে লাল-নীল পেন্সিল দিয়া চিহ্নিত করিতেছিল, এমন সময়ে একটি গৌরবর্ণ বৃদ্ধ আসিয়া বলিল, "জয় হোক বাবা!"

ব্রাহ্মণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "কে আপনি?"

"আমি ভগবান।"

"ভগবান? ভগবান কি?"

বিস্মিত নেত্রে ব্রাহ্মণ বলিলেন, "'ভগবান কি'র মানে?"

উমাশঙ্কর বলিল, "অর্থাৎ ভগবান দাস, ঘোষ, চাটুজ্যে, না কারফরমা—তাই জানতে চাচ্ছি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "আমি ভগবান কারফরমা নই; আমি শুধু ভগবান।"

"নিবাস কোথায়?"

"গোলোকে।"

"কোন্ জেলা ?"

"জেলা অমরাবতী।"

"বুঝেছি; বেরার। কিন্তু আমাদের হাইকোর্টের ত বেরারের আদালতের উপর জুরিস্‌ডিক্‌শন নেই। কি মকদ্দমা আপনার? দেওয়ানি—না, ফৌজদারি ?"

উমাশঙ্করের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মুখে হাসি দেখা দিল; বলিলেন, "আমি তোমার মক্কেল নই উমাশঙ্কর; আমি ভগবান, ঈশ্বর, আদিনাথ, প্রণব।"

এবার উমাশঙ্করের মুখেও মৃদু হাস্য দেখা দিল; বলিল, "বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ?"

"হ্যাঁ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা।"

ইহা আর কিছুই নহে, শ্যালিকা আমোদিনীর পরিহাসকাণ্ড, একজন বৃদ্ধ আত্মীয়কে সাজাইয়া গুছাইয়া ভগবান করিয়া পাঠাইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া উমাশঙ্কর বিশেষ কৌতুক অনুভব করিল। একটা চেয়ার দেখাইয়া বলিল, "বসতে আজ্ঞা হোক।" ব্রাহ্মণ উপবেশন করিলে বলিল, "আপনি যখন আদিনাথ, প্রণব—তখন ত আপনি সর্বজ্ঞ। তা, খুঁজে-পেতে শেষ পর্যন্ত একজন নাস্তিকের গৃহে দেখা দিলেন কেন প্রভু ?"

ভগবান বলিলেন, "আমি তোমাকে দীক্ষিত করতে এসেছি উমাশঙ্কর।"

"কিসে দীক্ষিত করতে এসেছেন ?"

"ঈশ্বরমন্ত্রে।"

"কপিলদর্শন পড়া আছে প্রভুর ?"

"আছে।"

"কপিল ত প্রমাণের অভাবে ঈশ্বরকে অসিদ্ধ করেছেন।"

"সেই অপরাধে কপিলকে আমি সিদ্ধ করেছি।"

"কি ক'রে সিদ্ধ করেছেন জানতে পারি কি ?"

"ফুটন্ত জলে ফেলে।"

উমাশঙ্কর বলিল, "আমিও আপনাকে ফুটন্ত জলে ফেলব; যদি সিদ্ধ হন তা হ'লে বুঝব আপনি ভগবান কারফরমা, আর যদি অসিদ্ধ হন তা হ'লে বুঝব আপনি দেবাদিদেব মহাদেব। ফুটন্ত জলে সময় লাগবে,

আপাতত একটা সামান্য প্রমাণ গ্রহণ করি। জানেন ত বিনা প্রমাণে আপনাকে আমি ঈশ্বর ব'লে স্বীকার করব না!"

"কি প্রমাণ গ্রহণ করবে বল?"

পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া একটা কাঠি জ্বালিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "এই শিখার মধ্যে আপনার একটা আঙল ঢুকিয়ে দিন, তারপর কি প্রমাণ চাই, তা নিজেই মালুম করবেন।"

ভগবানের মুখে পুনরায় হাস্য দেখা দিল; বলিলেন, "তুমি এত অল্পে সন্তুষ্ট হবে উমাশঙ্কর? তোমার ওই অগ্নিশিখায় আমি আঙুল দিলে ও শিখা ত তখনি জল হ'য়ে ঝ'রে পড়তে থাকবে।"

ভগবানের বাক্য এবং কার্যের মধ্যে কোনো পার্থক্য রহিল না,—অগ্নি-শিখায় অঙ্গুলিস্থাপনমাত্র সেই শিখা আকারে শত গুণ হইয়া জলরূপে ঝর ঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

বিস্মিত, চকিত, বাক্‌শক্তিরহিত উমাশঙ্করের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ভগবান বলিলেন, "একটা ভাল প্রমাণ দেখতে চাও উমা?"

স্খলিতকণ্ঠে উমাশঙ্কর বলিল, "কি, বলুন?"

"গীতা পড়েছ?"

"পড়েছি।"

"একাদশ অধ্যায় মনে আছে?"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া উমাশঙ্কর বলিল, "আছে। বিশ্বরূপদর্শন।"

"তুমি আমার বিশ্বরূপ দর্শন করবে?"

ভীতত্রস্তভাবে বিহ্বলকণ্ঠে উমাশঙ্কর বলিল, "করব।"

"তবে কর।" বলিয়া সহসা ভগবান বহু-বাহু, বহু-উদর, বহু-মুখ হইয়া বিরাট অবয়ব ধারণ করিলেন। সেই অবয়বের না দেখা যায় আদি, না দেখা যায় মধ্য, না দেখা যায় অন্ত। দুই চক্ষের মধ্যে চন্দ্র সূর্য জ্বলিতেছে; ভীষণ দন্তশ্রেণীর দ্বারা ভয়ানক মুখমণ্ডল যেন বিশ্বগ্রাসী অনলের রূপ ধারণ করিয়াছে!

* * *

শয্যাত্যাগ করিয়া মন্দাকিনী শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল, তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর দেহে নাড়া দিতে লাগিল।

ধড়মড় করিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া উমাশঙ্কর বিহ্বলভাবে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

মন্দাকিনী বলিল, "স্বপ্ন দেখছিলে?"

মন্দাকিনীর মুখে দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া ত্রস্তকণ্ঠে সে বলিল, "হ্যাঁ, ভীষণ দুঃস্বপ্ন।"

"কি দুঃস্বপ্ন?"

এক মুহূর্ত নিজেকে সামলাইয়া লইয়া উমাশঙ্কর আনুপূর্বিক স্বপ্নের কাহিনী বিবৃত করিল। শুনিতে শুনিতে মন্দাকিনীর দুই চক্ষু ভরিয়া জল আসিতেছিল। বিবৃতি শেষ হইলে বাষ্পনিরুদ্ধকণ্ঠে সে বলিল, "ওগো, একে তুমি দুঃস্বপ্ন বলছ? এ যে মহা সুস্বপ্ন! তুমি ভাগ্যবান, তাই স্বপ্নে ভগবানের দর্শন পেলে। উষা-স্বপ্ন মিথ্যা হবার নয়। এবার জাগ্রত অবস্থাতেও তুমি ভগবানের দর্শন পাবে।"

গলবস্ত্র হইয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করিয়া সাশ্রুনেত্রে মন্দাকিনী কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

ক্ষণকাল আবিষ্ট মনে বসিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে উমাশঙ্কর শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। তাহার পর মুখ হাত পা ধুইয়া চা পান করিয়া সাংখ্য-দর্শন খুলিয়া বসিল।

পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্বে সে মনে মনে বলিল, হে ভগবান, সত্যই যদি তুমি থাক, তা হ'লে আমার মনে পরিপূর্ণ বিশ্বাস উৎপাদন করবার পূর্বে আমার মনকে দুর্বল ক'রো না।

হেমাঙ্গিনীর সুটকেস

১

খেয়াল অনেকের অনেক রকমের থাকে। হেমাঙ্গিনীর ছিল সংগ্রহ করবার।

জন্মের সঙ্গে মানুষ তার প্রকৃতির বীজগুলিকে রক্তমাংসের মধ্যে বহন ক'রে আনে। পরে, ঠিক উদ্ভিজ্জ বীজেরই প্রণালীতে শিক্ষা, শাসন, পরিবেশ প্রভৃতি জল-বায়ু-আলোকের প্রাচুর্য অথবা স্বল্পতার তারতম্য

অনুসারে সেগুলি অঙ্কুরিত ও বর্ধিত হ'তে থাকে। হেমাঙ্গিনীর জীবনে এই সংগ্রহ-প্রবৃত্তির অঙ্কুরোদ্গম দেখা গিয়েছিল তার বাল্যকালের খেলাঘরের সংসারেই। তার পুতুল-পুত্রকন্যাগুলি যখন প্রায় সদ্যোজাত শিশু, বিপণি-সূতিকাগৃহের বদ্ধ কক্ষ থেকে তারা যখন সবেমাত্র নির্গত হ'য়ে হেমাঙ্গিনীর সংসারে প্রবেশলাভ করেছে, কেবলমাত্র একটি ক'রে খাটো হাত-কাটা জামা পরিয়ে দিলেই যখন তাদের ভদ্রোচিত ভাবে আব্রু রক্ষা চলতে পারে—হেমাঙ্গিনীর সংগ্রহ-প্রচেষ্টার ফলে তখনই তাদের পরিণত বয়সের ব্যবহারের উপযোগী এত সাজসজ্জা জ'মে উঠেছিল, যা যে-কোনো পুতুল-যুবক ও পুতুল-যুবতীর বিবাহ-দিনের আড়ম্বরের পক্ষেও অগৌরবজনক নয়।

খেলাঘরের সংসার থেকে বাস্তব সংসারে প্রবেশ করার পরও হেমাঙ্গিনী এই সংগ্রহ করবার প্রবৃত্তিটিকে যথাপূর্ব বহন ক'রে চলেছিল। সংসারের মামুলি প্রয়োজনাদির মধ্যে যখন সে-প্রবৃত্তি গা-ঢাকা দিয়ে থাকত, তখন তার অস্তিত্ব তেমন বোঝা যেত না; কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একটা অবান্তর অসাধারণ বিষয়কে আশ্রয় ক'রে যখন তা প্রকট হ'ত, তখন তাকে খেয়াল ছাড়া আর কিছুই বলা চলত না। হেমাঙ্গিনীর ছাব্বিশ বৎসর বয়সের জীবনের একটি ঘটনা শুনলে এ কথা সুস্পষ্ট হবে।

তখন হেমাঙ্গিনীর স্বামী অবিনাশ আলিপুরে প্রথম শ্রেণীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। আদালত থেকে গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে চাপানাদির পর কোনও প্রয়োজনে দ্রব্যাদি রাখার কক্ষে প্রবেশ ক'রে হেমাঙ্গিনীর একটা স্থটকেসের উপর মূল্যবান সিল্কের একটা ফ্রক দেখে অবিনাশ ঈষৎ বিস্মিত হ'ল। বাড়িতে ত সবেমাত্র চারটি প্রাণী—বিধবা ভগ্নী বিরাজবালা, তার তিন বৎসর বয়সের পৌত্র রমেন, আর তারা দুজনে স্বামী স্ত্রী। এ ফ্রক তবে কার জন্য? ফ্রকটি তুলে নিয়ে দুটো হাতা ধ'রে ঝুলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে নিরীক্ষণ ক'রে অবিনাশ মনে মনে বললে, বড় জোর মাস ছয়েকের খুকীর মতো। মাস ছয়েকের খুকী কে এমন আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে আছে, যাকে এই ফ্রকটি দেওয়া চলবে! কিন্তু সে ভেবে পেলে না।

তবে দিতে ইচ্ছা হয় বটে। ফ্রকটির এমনই অপরূপ কারুকার্য! ধবধবে সাদা বস্ত্রের সঙ্গে নীলাভ রঙের কাপড়ের নয়নানন্দকর সমাবেশ;

তার উপর স্থান বুঝে বুঝে ছোট ছোট চুমকির হাল্কা কাজের সুরুচি-সম্মত সংযত জমক।

ঈষৎ ব্যস্তভাবে হেমাঙ্গিনী কক্ষে প্রবেশ করলে। তখনো ফ্রকটা অবিনাশের হাতে ঝুলছে। মুহূর্তকাল স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে হতাশা-ব্যঞ্জক স্বরে সে বললে, "ঠিক যা ভেবেছি তাই। একটু অসাবধান হয়েছি, অমনি এ ঘরে তোমার কাজ পড়ল, আর ফ্রকটাও চোখে পড়ল!"

স্মিত মুখে অবিনাশ বললে, "এ ঘরে কাজ পড়াতে খুব বেশি অপরাধ হয় নি ; কিন্তু ফ্রকটা চোখে না পড়লে সত্যিই অপরাধ হ'ত।"

মেঘ স'রে গেলে শরৎকালের ছায়ামলিন শস্যক্ষেত্র যেমন নিমেষের মধ্যে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে, অবিনাশের কথা শুনে হেমাঙ্গিনীর মুখমণ্ডলও তেমনি প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল ; হাসিমুখে বললে, "ভাল ?"

"চমৎকার! কিন্তু কার জন্যে তা ত বুঝলাম্ না।"

"একটু ভেবে দেখ না।"

ক্ষণকাল চিন্তা করবার ভান ক'রে অবিনাশ বললে, "পুঁটির মেয়ের জন্যে ?"

"ব'য়ে গেছে।"

পুনরায় একটু চিন্তা ক'রে অবিনাশ বললে, "তবে বোধ হয় বিরাজের ছোট ননদের নাতনীর জন্যে।"

খিল খিল ক'রে হেসে উঠে হেমাঙ্গিনী বললে, "খুব আন্দাজ ত তোমার! বছর তিনেকের মেয়ের জন্যে তিন মাসের মেয়ের ফ্রক! এই বুদ্ধি নিয়ে হাকিমি কর কেমন ক'রে ?"

স্মিত মুখে অবিনাশ বললে, "স্ত্রী-ভাগ্যে লোক ঠকিয়ে করি। কিন্তু হাকিম ত হার মানল, এখন কার জন্যে বল শুনি।"

"কার জন্যে ?" হেমাঙ্গিনীর মুখমণ্ডলের হাসির মৃদু আমেজের মধ্যেই চোখ দুটি ছলছলিয়ে এল ; বললে, "তুমি ত দূরে দূরেই ঘুরলে, কাছে দেখলে না—কেমন ক'রে বুঝবে কার জন্যে ? কেন, আমাদের দুজনের মধ্যে কারো আসবার সম্ভাবনা আর কি একেবারেই নেই ? সুরেনবাবুর স্ত্রীর ত বত্রিশ বৎসর বয়সে হয়েছিল।"

হেমাঙ্গিনীর কথা শুনতে শুনতে অবিনাশচন্দ্রের মুখখানা ম্লান হ'তে আরম্ভ করেছিল, কিন্তু সুরেনবাবুর স্ত্রীর কথার উল্লেখে পুনরায় উজ্জ্বল

হ'য়ে উঠল, বললে, "স্থরেনবাবুর স্ত্রীর কথাই বা বলছ কেন হেম? কুমোরদীঘির সৌরভী পিসিমারও ত বিয়াল্লিশ বছরে হয়েছিল।"

"তবে?"

"তবে আর কি? তবে ত সবই ঠিক আছে!"

"কিন্তু তুমি হয়ত বলবে, এ আমার একটা রোগ।"

"কি রোগ?"

"এই এত আগে-ভাগে জিনিসপত্র সংগ্রহ ক'রে রাখবার খেয়াল। কথায় বলে—গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। এ আবার কাঁঠালও নেই, শুধু গাছ। এটাকে রোগ বলবে না?"

স্নিগ্ধ কণ্ঠে অবিনাশ বললে, "তা যদি বলি, তার উত্তরে তুমি চিরকাল যা ব'লে আসছ তাই হয়ত বলবে। তুমি বলবে, এ রোগ দূরদর্শীদের রোগ। সংগ্রহ তারাই করতে পারে যাদের দূরের অবস্থা দেখবার দৃষ্টি আছে। কিন্তু সে কথা যাক, এ ফ্রক কি তৈরি করালে?"

হেমাঙ্গিনীর মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলে; বললে, "ক্ষেপেছ? যদিই বা দূরদৃষ্টি থাকে, অতটা তা ব'লে নেই। ওসমান পেটিওয়ালা এসেছিল; চোখে লাগল, রেখে দিলাম। ভেবেছিলাম, তুমি আসবার আগে তুলে ফেলব; কিন্তু প্রমীলা বেড়াতে আসায় কথায় কথায় একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।" এক মুহূর্ত নিঃশব্দে কি চিন্তা ক'রে বললে, "দেখেই যখন ফেললে সবটা দেখবে?"

উৎসুক হ'য়ে অবিনাশ জিজ্ঞাসা করলে, "সবটা আবার কি?"

উত্তর না দিয়ে রিং থেকে একটা চাবি বেছে নিয়ে হেমাঙ্গিনী স্থটকেসটা খুললে। বৃহৎ স্থটকেস। বিস্মিত হ'য়ে অবিনাশ দেখলে, তার প্রায় সবটাই পূর্ণ হ'য়ে আছে শিশুদের ব্যবহারের উপযোগী জিনিসপত্রে। খুকীর জন্য ফ্রক, খোকার জন্য কোট; খুকীর জন্য ডলি-পুতুল, খোকার জন্য রেলগাড়ি; খুকীর রিবন, খোকার বেল্ট্। এ সব স্বতন্ত্র প্রয়োজনের বিশেষ বিশেষ দ্রব্যাদি ত আছেই, তদুপরি জাঙ্গিয়া, বীভ, অয়েল ক্লথ, ফিডিং বট্ল, বেবি-স্থদার, ঝুনঝুনি, ঝিনুক প্রভৃতি সাধারণ সামগ্রীর ত অন্ত নেই।

দুঃখিত, সমবেদনাক্লিষ্ট অবিনাশের মনে হ'ল চামড়ার স্থটকেসটা

যেন হেমাঙ্গিনীর শুষ্ক আগ্রহাতুর হৃদয়, আর ভিতরকার বস্তুসমূহ যেন তার গোপন অন্তরের বাসনা বেদনা।

"দেখলে ?"

হেমাঙ্গিনীর প্রশ্নে অবিনাশ তাকিয়ে দেখলে, যে-মেঘ ক্ষণকাল পূর্বে হেমাঙ্গিনীর মুখমণ্ডলে ছায়া বিস্তার করেছিল, জল হ'য়ে তা চোখের সামনে চিক চিক করছে।

২

সংসারে যোগাযোগ ব'লে একটা ব্যাপার আছে, যা মাঝে মাঝে ঘ'টে থাকে ; কিন্তু ঘটবার মূলীভূত কোনো কারণ সব সময়ে থাকে কি-না তা একেবারেই বোঝা যায় না। হয়ত অকারণেই কারো কথা মনে মনে ভাবছি, হঠাৎ চেয়ে দেখি পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসছে।

কতকটা সেই ধরণের ব্যাপার হেমাঙ্গিনীর জীবনে ঘটল। এতদিন তার অন্তরের যে সুতীব্র অভিলাষ কোট ফ্রক এঞ্জিন রিবনের রূপ ধারণ ক'রে চামড়ার সুটকেসের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে অজ্ঞাতবাস করছিল, তা উদ্‌ঘাটিত ক'রে স্বামীকে দেখানোর সঙ্গেই কোনো নিগূঢ় যোগ আছে কি-না বলা কঠিন, কিন্তু দেখানোর অল্পদিনের মধ্যেই মনে হ'ল কাঁঠালগাছে কাঁঠাল ফলবার সম্ভাবনা সামনে দাঁড়িয়ে হাসছে।

কলিকাতার একজন খ্যাতনামা প্রসূতি-চিকিৎসককে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিশ্চিন্ত হবার পর অবিনাশ উৎসাহসহকারে মাস আষ্টেক পরের কথা ভাবতে আরম্ভ করলে : কে হবে ধাত্রী, কে থাকবে ডাক্তার, পরিচর্যার কাজ কে কে করবে, গৃহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর ঘর কোন্‌টা যেটা হবে সূতিকাগার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

হেমাঙ্গিনী মুখ টিপে টিপে হাসে, আর বলে, "সে ত এখনো অনেক দিনের কথা। এত আগে থাকতে ভাবছ কেন ? আমার দূরদৃষ্টির ভূত শেষ পর্যন্ত তোমার কাঁধে সওয়ার হ'ল না-কি ?"

ভ্রূ-কুঞ্চিত ক'রে অবিনাশ উত্তর দেয়, "সত্যি। রোগটা দেখছি সংক্রামক।"

৩

মাস আষ্টেক পরে হেমাঙ্গিনী ও অবিনাশের জীবনের মধ্যে দেখা দিলে একটি শিশু। উষার প্রথম আভাসের মতো স্নিগ্ধ লাবণ্যের প্রভায় শুধু বাপ-মার হৃদয়ই নয়, ঘর পর্যন্ত আলোকিত হ'য়ে উঠল। হেমাঙ্গিনী সাধ ক'রে কন্যার নাম রাখলে উষা। বাপ-মার হৃদয়-আকাশের উষা হ'য়ে উষা দিন দিন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে লাগল।

উষার জন্য কোনো দ্রব্যের প্রয়োজন দেখা গেলে অবিনাশ তৎপর হ'য়ে উঠে বলে, "যাই, বাজার থেকে কিনে নিয়ে আসি।" হাসিমুখে হেমাঙ্গিনী বলে, "যেয়ো। তার আগে স্নটকেসটা একবার খুলে দেখ না, যদি থাকে!"

বাজারে যে একেবারেই যেতে হয় না, তা নয়; কিন্তু প্রায়ই অবিনাশ স্নটকেস থেকে অভীপ্সিত জিনিসটি বার ক'রে এনে হেমাঙ্গিনীকে দেখিয়ে হাসি হাসি অপ্রতিভ মুখে বলে, "ঠিক বলেছ। আছে।"

স্মিতমুখে হেমাঙ্গিনী বলে, "এখন বুঝছ—সঞ্চয় ক'রে রাখার কত গুণ?"

ঘাড় নেড়ে খুশি হ'য়ে অবিনাশ বলে, "বুঝছি।"

এই ভাবে উষাকে অবলম্বন ক'রে হেমাঙ্গিনী ও অবিনাশের দিনগুলি উৎসাহ এবং আনন্দের মধ্যে আলোড়িত হ'তে হ'তে সম্মুখের পথে এগিয়ে চলল।

কিন্তু বেশিদিনের জন্যে নয়। মাস সাতেক পরে সহসা একদিন প্রত্যুষে মনে হ'ল, পথ বুঝি তার দৌড় শেষ ক'রে অস্তদিগন্তের এলাকায় পৌঁছে গেছে।

পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে উষার গা-টা একটু গরম মনে হয়েছিল। রাত্রে উত্তাপটা কিছু বাড়ে, কিন্তু রাত্রি অবসানের সঙ্গে অকস্মাৎ এ কি সর্বনাশ! উষা যেন আর সে উষা নেই, সন্ধ্যার মতো নীলাভ হ'য়ে গিয়ে তার ক্ষুদ্র দুর্বল ফুসফুসের সমস্ত শক্তি সঞ্চিত ক'রে হাঁপাচ্ছে!

আতঙ্কে বাপ-মার প্রাণ উড়ে গেল। অবিলম্বে ডাক্তার এসে পরীক্ষা ক'রে দেখে মুখ গম্ভীর করলে। কঠিন অবস্থা! ফুসফুসে জুড়ে নিউমোনিয়ার প্যাচ।

আর-একজন বড় ডাক্তার এলেন; দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা সেবা করবার জন্য দুজন দুজন ক'রে চারজন উপযুক্ত নার্স নিযুক্ত হ'ল। ঔষধপত্র অল্পস্বল্প পড়তে লাগল। অবিলম্বে অ্যান্টিফ্লজেস্টিন দিয়ে বুক-পিঠ মোড়া হ'য়ে গেল; সঙ্গে সঙ্গে চলল অক্সিজেন। শ্বাসকষ্টের যথাসাধ্য উপশমনের দ্বারা দ্রুত অপচয়ের হাত থেকে ক্ষীয়মাণ জীবনী-শক্তিকে যতটুকু রক্ষা করা যায়।

দুশ্চিন্তার অন্ত নেই, অথচ করবার মতো কোনো কাজও নেই। এই দুই অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে হেমাঙ্গিনী ও অবিনাশ সারা বাড়ি অস্থির চিত্তে ঘুরে বেড়ায়। কখনও পথের দিকের জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, কখনও পাঠাগারে গিয়ে বসে, কখনও বা রোগীর কক্ষে প্রবেশ ক'রে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে।

"মিসেস দত্ত!"

প্রশ্নকারিণী নার্সের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে হেমাঙ্গিনী বলে, "বলুন।"

"অনর্থক ব্যস্ত হ'য়ে কোনো লাভ নেই।"

"সে কথা বুঝেও বুঝি নে। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়? খুকু ভাল হবে?"

"সে জন্যে ব্যবস্থার ত আপনারা কিছু ত্রুটি রাখেন নি। দেখুন, আপনি আর মিস্টার দত্ত এ ঘরে না এলেই ভাল হয়।"

"কেন?"

"তাতে আপনাদের খুকুর কোনো সুবিধে নেই, অথচ আমাদের কিছু অসুবিধে আছে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা ক'রে হেমাঙ্গিনী বলে, "আচ্ছা, তাই হবে, আসব না। কিন্তু আমি কি খুকুকে আর কোলে নিতে পাব না?"

অনুমোদনসূচক ঘাড় নেড়ে নার্স বলে, "পাবেন বইকি। ভগবান দয়া ক'রে যখন আপনার খুকুকে বিপন্মুক্ত করবেন, তখন পাবেন।"

"আর, সে দয়া যদি না করেন?"

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে নার্স বলে, "তা হ'লেও পাবেন।"

হেমাঙ্গিনী ও অবিনাশের সমস্ত দিন কাটল বিহ্বল দৃষ্টিতে পরস্পরের শঙ্কাদীর্ণ মুখের প্রতি চেয়ে চেয়ে; রাত কাটল নিদ্রা-জাগরণের দ্বারা মথিত একটা মোহাচ্ছন্ন অবস্থিতির মধ্যে।

ভোরের দিকে হেমাঙ্গিনী একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। অদূরে একটা ঈজি-চেয়ারে শিথিল দেহটাকে এলিয়ে দিয়ে চক্ষু মুদ্রিত ক'রে অবিনাশ দুশ্চিন্তার জাল বুনছিল। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসল হেমাঙ্গিনী। চকিত নেত্রে এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত ক'রে অবিনাশের দিকে চেয়ে বললে, "দেখ, খুকু বাঁচবে না।"

অবিনাশ আঁতকে উঠল, "কেন বল ত?"

"মা হ'য়ে আমিই তার আয়ু বেঁধে দিয়েছি আজ পর্যন্ত। এখনি সে আমার কাছে এসে বলছিল—মা, তোমার স্যুটকেসে আমার কাপড় শেষ হয়েছে, এবার আমি চললাম।"

একটা দুরতিক্রমণীয় অমঙ্গলের ত্রাসে পাংশু হ'য়ে অবিনাশ বললে, "ও কিছু নয়,—স্বপ্ন।"

"কিন্তু দেখো, সত্যি হবে।"

বাহিরে দরজায় শব্দ হ'ল, ঠক ঠক ঠক।

চকিত হ'য়ে হেমাঙ্গিনী ব'লে উঠল, "ঐ দেখ।"

ঈজি-চেয়ারের উপর খাড়া হ'য়ে ভগ্ন কণ্ঠে অবিনাশ হাঁক দিলে, "কে?"

নারীকণ্ঠে শোনা গেল, "আমি কমলা—নার্স।"

"দরজা খোলা আছে, ভেতরে আসুন।"

অল্প একটু দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে হেমাঙ্গিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে নার্স বললে, "আপনি একবার খুকুকে কোলে নেবেন, চলুন।"

"বুঝেছি। খুকু চ'লে যাচ্ছে বুঝি?"

এক মুহূর্ত নির্বাক থেকে নার্স বললে, "বোধ হয়।" তার পর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চ'লে গেল।

চকিত নেত্রে অবিনাশের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে হেমাঙ্গিনী বললে, "কাল সমস্ত দিন আমাকে শুনিয়েছ, 'মনেরে আজ কহ যে, ভাল মন্দ

যাহাই আসুক, সত্যেরে লও সহজে।' আজ সত্য এসেছে, সহজে তাকে নিও। আমি সহজে নিলাম।" তার পর চ'লে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, "আর দেখ, হরিকে পাঠিয়ে দাও, কিছু ফুল নিয়ে আসুক। সব সাদা ফুল—শ্বেতপদ্ম, গন্ধরাজ, টগর, রজনীগন্ধা—এই সব।"

দরজা ঠেলে হেমাঙ্গিনী নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

৫

অসুখ হ'য়ে পর্যন্ত রোগীর ঘরের দরজা-জানলা দিবারাত্রি খোলা থাকে। তরুণ উষার স্তিমিত আলোকে সমস্ত ঘর ভ'রে গেছে; সেই আলোকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক মহা-বৈরাগ্যের ধূসরতা। এই অপরূপ পরিবেশের মধ্যে কক্ষের ভিতর তখন অভিনীত হ'তে আরম্ভ হয়েছে মহারজনীর তিমির-সাগরে বিগতপ্রভা উষার নিমজ্জনের পালা।

হেমাঙ্গিনী যখন প্রবেশ করলে তখন ডাক্তারেরা স্টেথোস্‌কোপ ইত্যাদি পকেটে পুরতে আরম্ভ করেছে; একজন নার্স ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত জিনিসপত্র একটু গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখছে; আর কমলা পরলোকযাত্রিণীর নাসিকার একটু দূরে অক্সিজেনের নলটা ধ'রে সন্ধিক্ষণের অনুষ্ঠানটা যথাসম্ভব সহজ করবার চেষ্টা করছে।

হেমাঙ্গিনী দেখলে, অ্যান্টিফ্লজেস্টিনের ব্যাণ্ডেজটা খোলা প'ড়ে রয়েছে মেঝের উপর। মহাপ্রস্থানের সুনিশ্চিত পথে যে পদার্পণ করেছে, তাকে আর বন্ধনের মধ্যে চেপে রেখে লাভ কি? অতি সংক্ষিপ্ত জীবনের শেষ নিশ্বাসগুলি যাতে অনন্ত আকাশে কতকটা সহজে মিশতে পারে আপাতত ডাক্তাররা সেই দিকে লক্ষ্য রেখেছে।

শয্যার নিকট উপস্থিত হ'য়ে একজন ডাক্তারের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে শান্ত কণ্ঠে হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলে, "এখনো আছে?"

ঈষৎ ঝুঁকে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন একটু লক্ষ্য ক'রে ডাক্তার বললে, "আছে।"

নত হ'য়ে উষার নীলাভ ঠোঁটের উপর হেমাঙ্গিনী একবার চুম্বন

করলে, তার পর শয্যার উপর উঠে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলে, "কোলে নিতে পারি ?"

"পারেন।"

ধীরে ধীরে উষাকে কোলে তুলে নিয়ে হেমাঙ্গিনী কন্যার অর্ধনিমীলিত নেত্রের উপর দৃষ্টি স্থাপিত ক'রে স্তব্ধ হ'য়ে বসল।

মিনিট পাঁচেক পরে একজন ডাক্তারের সঙ্গে কমলার চোখাচোখি হ'ল। অক্সিজেনের নলটা সরিয়ে নিয়ে কমলা স্টপকক্ বন্ধ ক'রে দিলে।

ডেথ্ সার্টিফিকেট লিখিয়ে নিয়ে ব্যথিত সমবেদনাক্লিষ্ট ডাক্তার ও নার্সদের বিদায় দিয়ে অবিনাশ যখন ফিরে এল, তখনও হেমাঙ্গিনী নিষ্পলকনেত্রে কন্যার মুখের দিকে চেয়ে পাথরের মতো স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে আছে। তার পার্শ্বে উপবেশন ক'রে বিরাজবালা নিঃশব্দে অশ্রুপাত করছে।

অবিনাশের পদশব্দে চেয়ে দেখে মৃদু স্বরে হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলে, "ফুল এসেছে ?"

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছে অবিনাশ বললে, "আনতে গেছে।"

এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা ক'রে হেমাঙ্গিনী বললে, "তা হ'লে অন্য কাজগুলো ততক্ষণে সেরে ফেল।" আঁচল থেকে চাবির রিং খুলে অবিনাশের হাতে দিয়ে বললে, "সুটকেসটা খালি ক'রে কাউকে দিয়ে সব জিনিসগুলো এখানে আনাও।"

"কি হবে ?"

"খুকুর সঙ্গে যাবে।"

ঈষৎ কুণ্ঠিত কণ্ঠে অবিনাশ বললে, "কিন্তু সুটকেসে ত খুকুর আর বিশেষ কোনো জিনিস নেই মনে হচ্ছে।"

বর্ষা-দিনান্তের পাণ্ডুর আলোক-প্রভার মতো একটা অতি-ফিকা হাসি মুহূর্তের জন্য হেমাঙ্গিনীর মুখমণ্ডলে ঝিলিক মেরে গেল। উদাস নেত্রে স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "তবে কার জিনিস আছে ? খোকার ? রক্ষে কর। আবার একদিন একটা ছেলে স্বপ্নের মধ্যে দেখা দিয়ে বলবে—'মা, তোমার সুটকেসের জিনিসপত্র শেষ হয়েছে, আমি চললাম।'—তার পথ একেবারে বন্ধ কর।"

মুখ নত করতে গিয়ে কয়েক ফোঁটা তপ্ত অবাধ্য অশ্রু মৃত কন্যার মুখের উপর ঝ'রে পড়ল। আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিতে গিয়ে সহসা হেমাঙ্গিনী বিরত হ'ল। মনে মনে বললে, তোর মার অন্তরের খানিকটা দুঃখের চিহ্ন সঙ্গে নিয়ে যা খুকু।

হন্তারপুর

১

বৎসর দুই পরে আমার কর্মস্থল সুদূর মারি-অন্-ইণ্ডাস্ থেকে তিন মাসের ছুটি নিয়ে বাংলা দেশে ফিরছিলাম। দীর্ঘ পথের প্রায় চোদ্দ আনা অংশ শেষ ক'রে শাল এবং মহুয়াবন-খচিত সাঁওতাল পরগণায় প্রবেশ করবার পর হঠাৎ মনে হ'ল, একদিনের জন্য বিনয়ের সঙ্গে দেখা ক'রে গেলে মন্দ হয় না।

বিনয় আমার বাল্যসখা। বৎসর খানেক হ'ল অল্প বয়সে তার স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। এ দুঃসংবাদ পাই কলকাতা থেকে আমার ছোট ভাইয়ের চিঠিতে। সে লিখেছিল, দুঃসহ শোকে বিনয়ের মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কথাটা সহজেই বিশ্বাস করেছিলাম। বিনয়ের স্ত্রীকে আমি কয়েকবারই দেখেছি। ও-রকম স্ত্রী লাভ করার ফলে মস্তিষ্কের একটু বিকৃতি ঘটলে খুব বেশি অপরাধী করা চলে না; হারালে ত কথাই নেই।

যথাপরিমিত দুঃখ এবং সমবেদনা জ্ঞাপন ক'রে বিনয়কে চিঠি দিলাম। উত্তর আসতে বিলম্ব হ'ল না। পত্র সংক্ষিপ্ত নয়,—বহু অপ্রত্যাশিত প্রসঙ্গে পূর্ণ, এবং সে প্রসঙ্গগুলির অবতারণা ও আলোচনার মধ্যে যুক্তি ও সঙ্গতির এমন স্বচ্ছন্দ লীলা, যা মস্তিষ্কের একান্ত সুস্থ অবস্থারই কাছে প্রত্যাশা করা যেতে পারে। চিঠিখানার চতুঃসীমার মধ্যে কোথাও যদি মস্তিষ্কবিকৃতির কিছুমাত্র পরিচয় পাওয়া যায় ত তা একমাত্র তার স্ত্রীর মৃত্যুপ্রসঙ্গের অতি-সংক্ষিপ্ততার মধ্যে। সে বিষয়ে বিনয় মাত্র এই কটি কথা লিখেছিল,—"হ্যাঁ হে, কমললতা মারাই

গেছে। শাস্ত্রের উপদেশ, গতস্য শোচনা নাস্তি। কমললতা যখন গত হয়েছে, তখন তার বিষয়ে অনুশোচনা ক'রে কোনো লাভ আছে কি?"

এ প্রশ্ন উত্তরপ্রার্থী নয়। সুতরাং বিনয়ের চিঠির প্রত্যুত্তরে এ প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আমি ব্যস্ত হই নি।

২

দেওঘরের বম্পাস টাউনের পূর্ব-সীমান্তের আরও আধপোয়াটাক পূর্বে প্রাচীর-ঘেরা কম্পাউণ্ড এবং বাগানের মধ্যে গোলাপী রঙের যে সুদৃশ্য অট্টালিকা দেখা যায়, সেইটে বিনয়ের বাড়ি। বিবাহের পর কমললতা নিজে পছন্দ ক'রে জমি কিনিয়ে বাড়ি করিয়েছিল ব'লে বিনয় বাড়ির নাম দিয়েছিল কমলকুঞ্জ। পাঞ্জাব-মেল প্রায় দুই ঘণ্টা লেট্ ছিল; জশিডি স্টেশন থেকে একটা ট্যাক্সি নিয়ে যখন কমলকুঞ্জের সম্মুখে উপস্থিত হলাম, তখন বেলা সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে গেটের বাম দিকের থামে দৃষ্টিপাত ক'রে চমকে উঠলাম। হস্তারপুর! সে আবার কোন্ দেশের কথা! পূর্বে যেখানে প্রস্তর-ফলকে গৃহের নাম কমলকুঞ্জ লিখিত ছিল, এখন সেখানে নূতন ফলকে লেখা হস্তারপুর। একান্তে-অবস্থিত একক এবং দোসরহীন এই গৃহই যে বিনয়ের গৃহ, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তবে যদি বিনয় সম্প্রতি বাড়িখানা অপর কাউকে বেচে দিয়ে থাকে, আর সে অরসিক ব্যক্তি কমলকুঞ্জের পরিবর্তে—

কিন্তু এরূপ চিন্তার মধ্যে প্রবেশ করবার আর কারণ রইল না; এঞ্জিন থামার শব্দ পেয়েই বোধহয় বিনয় সিঁড়ি ভেঙে বারান্দা থেকে নেমে এল, তারপর দূর থেকে আমাকে দেখে দ্রুতপদে নিকটে এসে আনন্দে উজ্জ্বল একমুখ হাসি নিয়ে বললে, "স্বাগত! সুস্বাগত! কিন্তু ভন্তু, চিরকালই কি তুই একই রকম খেয়ালী রইলি? একটা পোস্টকার্ড ছেড়ে এলে, নিজে না যাই, অন্তত বিমলকে ত জশিডি স্টেশনে পাঠাতে পারতাম!"

বিমল বিনয়ের ছোট ভাই।

যতদূর বুঝি, আমিই বিনয়ের অন্তরতম বন্ধু। কিন্তু কে বলবে, স্ত্রীর মৃত্যুর পরে আমার প্রতি তার এই প্রথম সম্ভাষণ! এমন সহজ,

এমন স্বচ্ছন্দ সে সম্ভাষণের কথা,—এমন হর্ষোচ্ছল সে কথার সুর যে, হঠাৎ যেন ভুল হ'য়ে যায়, কমললতা মারা গিয়েছে; যেন মনে হয়, এখনি হয়ত সে আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে হাসিমুখে বিনয়ের পিছনে এসে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাবে।

যাই হোক, তাদের সঙ্গে তাল না মেলালে ছন্দপাতের গ্লানি ভোগ করবার আশঙ্কা আছে। তাই কতকটা হাসিমুখেই বললাম, "আসছি ত তিন দিনের পথ মারি থেকে; শিমুলতলা ছাড়বার পর খেয়াল হ'ল তোর সঙ্গে দেখা ক'রে যাবার। তার মধ্যে কখন্ তোকে পোস্টকার্ড ছাড়ি তা শুনি? কিন্তু এ কি?"

বিস্মিত কৌতূহলে মাথাটা ঈষৎ উপর দিকে নাড়া দিয়ে বিনয় জিজ্ঞাসা করলে, " 'কি' কি?"

থামের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললাম, "হন্তারপুর?"

কথাটা শুনে আশ্বস্ত হওয়ার ভঙ্গীসহকারে বিনয় বললে, "কেন, বাড়ির নাম।"

"বাড়ির নাম ত কমলকুঞ্জ ছিল!"

"সে যখন কমল ছিল তখন ছিল। কমললতার শুকিয়ে যাওয়ার পর কমলকুঞ্জের কোনো মানে হয় না-কি?"

তা যদি না হয়, তা হ'লে পথে দাঁড়িয়ে থেকে এমন করুণ এবং সঙ্কোচজনক প্রসঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করারও কোনো মানে হয় না। বললাম, "কিন্তু, হন্তারপুরের কি মানে?"

ভ্রূকুঞ্চিত চক্ষে বিনয় বললে, "সব কথারই মানে থাকতে হয় না-কি? তোর ডাকনাম যে ভন্তু,—ভন্তু শব্দের কোনো মানে আছে বলতে পারিস?"

তা না পারলেও হন্তারপুরের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলা যেতে পারত, কিন্তু সহসা বিনয় ও-প্রসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হ'য়ে উঠে 'বিমল' 'বিমল' ক'রে ডাকাডাকি লাগিয়ে দিলে।

জোরালো তলবের তাড়নায় দ্রুতপদে উপস্থিত হ'য়ে বিমল আমাকে দেখে হর্ষোজ্জ্বল মুখে প্রণাম ক'রে বললে, "আপনি এসেছেন ভন্তুদা!"

"কি আশ্চর্য! নাই যদি আসবেন, তা হ'লে সশরীরে উপস্থিত হয়েছেন কেমন ক'রে?" ব'লে বিনয় উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল; তারপর

কোন্ ঘরে আমার জিনিসপত্র রাখবে তদ্বিষয়ে বিমলকে উপদেশ দিয়ে আমাকে নিয়ে বারান্দায় উপস্থিত হ'ল।

মিনিট দশেক পরে একজন ভৃত্য একটা ট্রে ক'রে দু সেট পেয়ালা, ডিশ, কিছু সদ্য-প্রস্তুত চা, রুটি-মাখন আর আধসেদ্ধ কয়েকটা ডিম রেখে গেল।

বিনয় বললে, "মধ্যাহ্ন-ভোজনে দেরি হবে, এটা হ'ল ধুলো-পায়ে চা। বেলা দশটার সময়ে স্নান ক'রে হবে দু-নম্বরের সভোজ্য চা; তারপর মধ্যাহ্ন-ভোজন,—তা সে বেলা একটাই হোক, আর দেড়টাই হোক।" বিমলকে ডাকিয়ে বললে, "বাহাদুরকে বাজারে পাঠাও। উৎকৃষ্ট মাংস, দু-তিন রকম মাছ, কিছু টাটকা ডিম, তরিতরকারি যেমন আসে, সব রকম যেন বেশ গুছিয়ে আনে। আর দেখ, কিছু ক্ষীরকদম, কানাইয়ের দোকানের পয়লা-কোয়ালিটির সের খানেক পেঁড়া আর আধ সেরটাক হাওয়া-পাতা দই। বুঝেছ?"

"বুঝেছি।" ব'লে বিমল প্রস্থান করলে।

বললাম, "এত সমারোহ কেন বিনয়? তোর বাড়িতে একটা রাক্ষস এসেছে না-কি?"

স্মিতমুখে বিনয় বললে, "রাক্ষস এলে সে-ই ত সমস্ত গ্রাস করত! সমারোহ ত প্রসাদ যারা পাবে আসলে তাদের জন্যে।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বললাম, "প্রসাদ বলিস কি রে! তা হ'লে দেবতা এসেছে না-কি?"

গম্ভীর মুখে বিনয় বললে, "বিশ্বেশ্বর যদি দেবতা না হন, তা হ'লে কে দেবতা তা জানি নে।"

রহস্য উপলব্ধি ক'রে হাসিমুখে বললাম, "কিন্তু এ বিশ্বেশ্বর যে বিশ্বেশ্বর বাঁড়ুজ্জে?"

তেমনি গম্ভীর মুখে বিনয় বললে, "বোঝা গেল, আমাদের আজকের দেবতা শাণ্ডিল্য মুনির বংশধর।"

কথায় কথায় অনেক কথাই আলোচিত হ'ল,—হ'ল না শুধু কমললতার কথা। অথচ প্রসঙ্গ-অনুরোধে বিনয় কমললতার নাম এমন লঘু ও সহজ ভাবে বার কয়েক উল্লেখ ক'রেও গেল যে, যত্ন সহকারে সে যে কমললতার প্রসঙ্গ অতিক্রম ক'রে চলেছে, এমন রঙেও তার

ঔদাসীন্যকে রঞ্জিত করা চলল না। কমললতার মৃত্যু বিনয়ের জীবনে বিবাহের চেয়েও অনেক বড় ঘটনা। বিবাহের পর সে যে রকম মুখর এবং উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল সে কথা স্মরণ ক'রে তার আজকের এই নীরবতা আমাকে উদ্বিগ্ন ক'রে তুললে। আমি উত্থাপিত করলে পাছে তার মনের গোপন অবস্থার সূত্রের খেইটুকুর সন্ধান না পাই, সেই আশঙ্কায় তারই অন্তরের ঢল নামার প্রতীক্ষায় নির্বাক হ'য়ে রইলাম। বেলা দশটা আন্দাজ বিনয় স্নানঘরে প্রবেশ করলে বিমল এসে কাছে বসল। সাধারণ দু-চারটে কথাবার্তার পর সে জিজ্ঞাসা করলে, "দাদাকে কি রকম দেখছেন ভক্তদা?"

বললাম, "ভাল। তবে এতটা ভাল না দেখে একটু খারাপ দেখলে কিছু কম উদ্বিগ্ন হতাম।"

"কেন বলুন ত?"

"যে-রোগী বিকারের ঝোঁকে লাফালাফি দাপাদাপি করে, তাকে আরাম করা যত কঠিন, তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন সে-রোগীকে আরাম করা, বিকারের গভীরতায় যে ঝিম মেরে চুপচাপ নিঃশব্দে প'ড়ে থাকে। রোগের লক্ষণ স্পষ্ট আর প্রবল হ'লে রোগের মোয়াড়া ধরা অনেক সহজ হয়।"

বিমল বললে, "দাদা যে ঝিম মেরে প'ড়ে আছেন, এ আপনি ঠিকই ধরেছেন ভক্তদা। কিন্তু দাদার অন্তত আর একটা লক্ষণ আছে যা সত্যিই স্পষ্ট আর প্রবল।"

সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বল ত?"

একটু চুপ ক'রে থেকে মনে মনে কোনো কথা ভেবে নিয়ে বিমল বললে, "রাত্রি নটা বেজে দশ মিনিটের সময়ে বউদিদি মারা যান। প্রত্যহ রাত্রি নটা বেজে দশ মিনিটের সময়ে দাদা ছাতে গিয়ে বেশ স্পষ্ট কণ্ঠে একবার বলেন, 'এখন বুঝেছ কমললতা, সেদিন মিথ্যে কথা বলেছিলুম?' আপনি আজ যদি কান পেতে একটু লক্ষ্য করেন, আজও বলতে শুনবেন।"

বললাম, "কি মিথ্যে কথা, তা কিছু জান?"

বিমল বললে, "না।"

"কিছু অনুমান করতে পার?"

"না, তাও পারি নে।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললাম, "হস্তারপুরের কি মানে তা জান?"

"না, তাও জানি নে। অভিধানে হস্তার অথবা হস্তারপুর শব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না।"

"বিনয়ের কাছে জানতে চেষ্টা করেছ?"

প্রশ্ন শুনে বিমলের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হ'য়ে উঠল,—"সর্বনাশ! কার মাথার ওপর মাথা আছে যে, সে চেষ্টা করবে! আর, চেষ্টা করলেই বা জানাচ্ছে কে সে কথা?" তারপর এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন ভক্তদাদা। কাউকে যদি দাদা বলেন ত একমাত্র আপনাকেই বলবেন।"

বিমলের অনুমান মিথ্যা হয় নি। সেই দিন সন্ধ্যাকালে কথাটা জানতে পারলাম। তবে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে হয় নি, বিনয়ই স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে কথাটা উত্থাপিত করেছিল।

৩

কম্পাউণ্ডের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা গোল-বেদী-বাঁধানো বকুল গাছ আছে। এই স্থানটি কমললতার অতিশয় প্রিয় ছিল। সেইখানে ব'সে বিনয় আর আমি গল্প করছিলাম।

কথায় কথায় হঠাৎ এক সময় বিনয় বললে, "তুই তখন হস্তারপুরের মানে জিজ্ঞাসা করছিলি ভক্ত। আচ্ছা, অনুমান করতে পারিস কিছু?"

বললাম, "না।"

"হস্তারপুর শব্দ থেকে কোনো অর্থ তোর মনে suggested হয় না?"

"যা হয় তার কোনো সঙ্গতি হয় না।"

আমার কথা শুনে বিনয়ের মুখে এক অদ্ভুত ধরণের চাপা হাসি দেখা দিল। বললে, "সঙ্গতি ঠিকই হয়। হস্তারপুর মানে হন্তার অর্থাৎ হত্যাকারীর বাড়ি।"

কথা শুনে চমকে উঠলাম, বললাম, "হত্যাকারীর বাড়ি?—কে হত্যাকারী?"

"কে আবার ?—বাড়ির মালিক—আমি।"

"ছোঃ!" ব'লে কথাটাকে একদম তাচ্ছিল্যসহকারে উড়িয়ে দিলাম।

বিনয় বললে, "নিতান্ত ছোঃ নয় ভন্তু। সব কথা ব'লে তোর কাছ থেকেই না হয় verdict নিই। বৎসর খানেক ধ'রে যে-সংশয় দুষ্ট পোকার মতো আমার অন্তরকে কুরে কুরে খাচ্ছে, সব কথা শুনে যদি পারিস সে সংশয়ের সমাধান ক'রে দিস। কিন্তু আসল কথা বলবার আগে একটা প্রাথমিক আইনের কথা তোকে জিজ্ঞাসা করি।"

বললাম, "আমি কিন্তু আইনজ্ঞ নই।"

"তা হোক। এ আইনের নির্দেশের কথা নয়, আইনের নীতির কথা। ধর্, কোনো এক লোকের ফাঁসির হুকুম হয়েছে। সে এমন চূড়ান্ত হুকুম যে, রদ-বদল হবার সব রকম উপায়, এমন কি রাজার কাছে আবেদন নিবেদন পর্যন্ত, সব চুকে-বুকে শেষ হ'য়ে গেছে। শনিবারে তার ফাঁসি, আমি যদি শুক্রবারে ছোরার আঘাতে তাকে মেরে ফেলি, তা হ'লে আমাকে হত্যাকারী বলবি কি-না ?"

প্রশ্ন খুব কঠিন মনে হ'ল না। আইন এবং বিচার যার জীবনের মেয়াদ একটা নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত বেঁধে দিয়েছে, তাকে হত্যা ক'রে সে-মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া নিশ্চয়ই বে-আইনী কাজ। বললাম, "তা বোধ হয় বলব।"

আমার বিচারে যেন একটু খুশি হ'য়েই বিনয় বললে, "তা যদি বলিস, তা হ'লে আমি হত্যাকারী।"

"কাকে তুই হত্যা করেছিস ?"

"কেন, কমললতাকে।"

কথাটা একেবারেই বিশ্বাস করলাম না। বললাম, "এ কথার মধ্যে যদি কিছু সত্যি থাকে ত সে কোনো গভীর কথার সত্যি,—সাদা কথার নয়।"

বিনয় বললে, "গভীর কি সাদা—সে কথা না হয় পরে বিচার করিস,—কাহিনীটা আগে শোন্।" তারপর ক্ষণকাল নিঃশব্দে মনে মনে কি একটা চিন্তা ক'রে নিয়ে বলতে আরম্ভ করল।

—সেবা এবং চিকিৎসার জোরে কমললতা প্লুরিসি রোগের প্রবল

আক্রমণ থেকে ধীরে ধীরে সেরে উঠল। রোগ যতটা সারল, রোগী কিন্তু ঠিক ততটা সারল না। দেহের মধ্যে দুর্বলতা যাই-যাই ক'রেও যেতে চায় না, বাঁ দিকের পাঁজরায় মাঝে মাঝে বেদনা বোধ হয়, থার্মোমিটারের পারার রেখাও সময়ে সময়ে জ্বরহীনতার সীমান্ত ছাড়িয়ে খানিকটা ঠেলে ওপর দিকে ওঠে। স্বাস্থ্য-সৌষ্ঠবের গোলাপী আভা মাঝে মাঝে মুখাবয়বে প্রতিফলিত হয় বটে, কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে কোথাও কিছু ক্রূর ক্রিয়াশীলতার ফলে তা কায়েম হতে পারে না।

ডাক্তার বললেন, ওষুধে এবং চিকিৎসায় যতটা হবার তা হয়েছে, বাকিটুকুর জন্য বায়ু পরিবর্তনের প্রয়োজন। রোগ এখন দেহ ছেড়ে প্রধানত মনের মধ্যে তাঁবু গেড়েছে, সুতরাং কোনো স্বাস্থ্যকর স্থানের বায়ুর তাড়নায় সেই তাঁবুর উচ্ছেদ সাধন করতে হবে।

কমললতা বললে, বিবাহের কয়েক বৎসর পূর্বে একবার দেওঘরের স্বাস্থ্যকর বায়ুর তাড়নায় সেই রকম একটা তাঁবু উচ্ছিন্ন হয়েছিল।

ডাক্তার বললেন, দেওঘরই তা হ'লে ভাল। প্রকৃতির উপকারিতার সঙ্গে প্রত্যাশার রসায়ন যোগ দিলে উন্নতি নিশ্চিত এবং দ্রুত হবে।

একজন বন্ধুর সহায়তায় বম্পাস টাউনে একটা বাড়ি ভাড়া ক'রে কমললতাকে নিয়ে দেওঘরে এসে হাজির হলাম। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পদার্পণ করা থেকে কমললতা যেন উন্নতিলাভ করতে লাগল। দেওঘরের আকাশ-বাতাস জল-মাটি গাছপালা যেন 'এস' 'এস' রবে তাকে সাদরে আহ্বান ক'রে নিয়ে তার দেহের মধ্যে জীবনীশক্তির অমৃত-রসধারা সঞ্চারিত করতে লেগে গেল। মনের এলাকা থেকে ব্যাধির তাঁবু ছিঁড়ে খুঁড়ে কোথায় গেল উধাও হ'য়ে। দেখতে দেখতে কৃশ-পাণ্ডুর কমললতা আবার সেই আগেকার সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী হাস্যময়ী কমললতায় ফিরে এল। যে হ'য়ে গিয়েছিল পঞ্চমীর চাঁদ, সে যেন ষোল কলা ছাপিয়ে আঠার কলায় এসে দাঁড়াল।

পরিহাস ক'রে একদিন বলেছিলাম, দিন দিন তুমি যে রকম দুর্দান্ত হ'য়ে উঠছ কমললতা, তাতে তোমাকে দেখে আমার ভয় হয়।

সুমিষ্ট হাসি হেসে কমললতা বলেছিল, কেন, কিসের ভয় হয়?

বলেছিলাম, ভয় হয়, তুমি যেন ক্রমশ আমার পাবার যোগ্যতার বাইরে চ'লে যেতে আরম্ভ করেছ।

উত্তরে কমললতা বলেছিল, তুমি পেতে চাও, তাই তোমার ও-রকম ভয় হয়। আমি দিতে চাই তাই নিশ্চিন্ত থাকি। আমাকে নিতে পারলে কি-না, তা তুমি ঠিক বুঝতে পার না;—আমি কিন্তু ঠিক জানি যে, নিজেকে দিতে পেরেছি।

কমললতার দিগন্ত-অতিক্রান্ত ভালবাসার পরিচয় আমার অপরিজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু গভীরতাতেও সে ভালবাসা যে নিঃশব্দে নীরবে এতটা অতলস্পর্শী হ'য়ে উঠছে, তা জানতাম না। যাক সে সব কথা, আসল কাহিনীটা বলি।

মাস চারেক পরে হঠাৎ একদিন খেয়াল হ'ল, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের যে প্রবল জোয়ার দুকূল ছাপিয়ে কমললতার দেহে দেখা দিয়েছিল, তাতে যেন ভাঁটার টান ধরেছে। মুখের হাসি থেকে সেই দুর্লভ আলোকের রেখাটুকু অন্তর্হিত হয়েছে; স্বল্পীভূত কথার সুরে আগেকার সুমিষ্ট রণনটুকু আর যেন ঠিক পাওয়া যায় না, সমস্ত দেহ জলভরা মেঘের স্তিমিত বিষণ্ণতা নিয়ে অলস-মন্থর গতিতে ইতস্তত অভিপ্রায়হীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে বল ত?

পাংশু হাসি হেসে কমললতা বললে, সব কথা কি বলা যায়?

বললাম, ডক্টর বাঁড়ুজ্যেকে একবার ডাকব?

বললে, ডক্টর বাঁড়ুজ্জে কি সব রোগই ধরতে পারেন?

কিন্তু আরও মাসখানেক পরে যখন দেখলাম, স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের জলরেখা তটান্তরেখার আরও বেশ খানিকটা নীচে নেমে গেছে, তখন ব্যস্ত হ'য়ে ডক্টর বাঁড়ুজ্জেকে ডেকে আনলাম।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে সমস্ত দেহ তন্ন-তন্ন ভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখে ডক্টর বাঁড়ুজ্জে ব্যাধির কোনো চিহ্ন কোথাও খুঁজে পেলেন না। দিনে তিনবার ক'রে একটা পেটেণ্ট ওষুধ খেতে দিলেন; আর ঘি-দুধ, ছানা-মাখন বেশি ক'রে ব্যবহার করতে বললেন।

ডাক্তার বাঁড়ুজ্জে প্রস্থান করলে বললাম, ডাক্তারের উপদেশ ঠিকমতো পালন ক'রো কমললতা।

কমললতা বললে, করব। কিন্তু, বলার সঙ্গে এমন অদ্ভুত একটু হাসি মিশিয়ে দিলে, যাতে বুঝতে আমার বাকি রইল না যে, চাঁদে কোথায় রাহুর সংক্রমণ হয়েছে, ডক্টর বাঁড়ুজ্জে তা ধরতে পারেন নি।

দিন চারেক পরের কথা।

রাত্ত নটার সময়ে বাড়ি ফিরে দেখি বারান্দায় ঈজি-চেয়ারের উপর কমললতা চুপ ক'রে ব'সে আছে। কাছে এসে একটা হাতলের উপর ব'সে বললাম, আজ বিকেলে ওষুধ খেয়েছিলে ?

মাথা নেড়ে মৃদুকণ্ঠে কমললতা বললে, খেয়েছিলাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, ওষুধ খেয়ে আজকাল একটু ভাল বোধ করছ কি ?

সহসা উত্তেজিত হ'য়ে উঠে কমললতা বললে, ওষুধ খাইয়ে আমাকে বাঁচাতে পারবে না। দেওঘরে আমাকে বাঁচাতে পারবে না। আর কোথাও আমাকে নিয়ে চল।

সমবেদনার স্বরে বললাম, কোথায় যাবে বল ?

ততোধিক উত্তেজিত ভাবে কমললতা বললে, যেখানে হোক, যেখানে হোক। যেখানে তোমার সুভদ্রা থাকবে না, সেখানে। তারপর অপর দিকের হাতলের উপর মুখ গুঁজে নিঃশব্দে কিন্তু উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কাঁদতে লাগল।

সর্বনাশ! তা হ'লে সময়ে সময়ে যে সংশয় আমার মনের মধ্যে অতি ক্ষীণ ছায়াপাত করত, তা ভিত্তিহীন নয়! কথাটা এমনই অলীক এবং নোংরা যে, শুধু সংশয়ের উপর নির্ভর ক'রে সে বিষয়ে আলোচনার দ্বারা কমললতাকে এবং নিজেকে অপমানিত করতে প্রবৃত্তি হ'ত না। কীট যেমন ফুলের মধ্যে বাসা বেঁধে নিরন্তর ফুলকে দংশন করে, ঈর্ষা তেমনি কমললতাকে দংশন করত। সেই মারাত্মক ঈর্ষারই তাড়নায় সে শুকিয়ে-আসা ফুলের মতো শুকিয়ে এসেছে।

যে বন্ধুর মধ্যস্থতায় বাড়ি ভাড়া করেছিলাম, সুভদ্রা তার দূর-সম্পর্কীয়া শালী। সে সুন্দরী, অবিবাহিতা আর সত্যি-সত্যিই সুগায়িকা বলতে যা বোঝায় তাই। কিছুদিনের জন্য সে তার দিদির কাছে বেড়াতে এসেছিল। পরিচয় স্থাপনার পর সে প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়ি এসে কমললতাকে গান শোনাত। প্রথম প্রথম কমললতা গান শুনে যে খুশি হ'ত, এখনও আমি সে বিষয়ে নিঃসংশয়। কিন্তু শেষের দিকে সে যখন প্রায়ই মাথা ধরার অভিযোগ করত, যার ফলে হয় গান বন্ধ করতে হ'ত, নয় আরম্ভই হ'তে পারত না, এখন বুঝি তখন তার মনের মধ্যে কীট প্রবেশ করেছিল।

প্রথম দিকে গানের মজলিসে সুভদ্রাই থাকত একমাত্র গাইয়ে; কমললতা এবং আমি থাকতাম আগ্রহশীল শ্রোতা। আনন্দের স্রোতস্বতী তখন নির্নক্র ছিল। পরে কমললতা নিজেই খাল কেটে কুমীর আনে। কুমীর অবশ্য সুভদ্রা অথবা আমি ছিলাম না, ছিল কমললতার সন্দেহ। কেমন ক'রে সে ঘটনা ঘটল বলি শোন।

হঠাৎ একদিন কমললতা ব'লে বসল, এতদিন ধ'রে সুভদ্রা অনেক পরিশ্রম করেছে। আজকে তার একটু পারিশ্রমিক দাও।

বললাম, কি পারিশ্রমিক?

বললে, গান গেয়ে সুভদ্রাকে শোনাও।

পারিশ্রমিকের স্বরূপ অবগত হ'য়ে সুভদ্রা বিস্মিত এবং কৌতূহলী দুই-ই হ'ল। কিন্তু খানিকটা অনুরোধ-উপরোধের পর সত্য-সত্যই যখন সে পারিশ্রমিক লাভ করলে, তখন বিস্ময় আনন্দ এবং লজ্জা—এই তিন মনোবৃত্তির মধ্যে মনে হ'ল লজ্জাই সে সর্বাধিক অনুভব করলে। দুই হাত দিয়ে আমার দুই পা স্পর্শ ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে বললে, না জেনে অনেক অপরাধ করেছি, কিছু মনে করবেন না। আজ থেকে আপনাকে গুরু ব'লে বরণ করলাম।

দুখানা গান গেয়েছিলাম, তার মধ্যে একটা গান সেই দিনই সে সাধনা ক'রে শিখে নিলে।

কমললতা বললে, গুরুর সন্ধান দিলাম, তার জন্যে আমাকে কি বকশিশ দেবে সুভদ্রা?

স্মিতমুখে সুভদ্রা বললে, যে গানগুলি গুরুদেব শিখিয়ে দেবেন, সেগুলি আপনাকে শুনিয়ে বকশিশ দেব।

কমললতা বললে, ভারি চালাক মেয়ে তুমি! গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করতে চাও!

তার পর থেকে প্রায়ই সঙ্গীত-শিক্ষার বৈঠক বসতে লাগল। বারান্দায় শতরঞ্চির উপর ব'সে সুভদ্রা আর আমি সঙ্গীতচর্চা করতাম। পাশে ঈজি-চেয়ারে কমললতা নিঃশব্দে প'ড়ে থাকত। দিনের পর দিন এই ভাবে প'ড়ে থাকতে থাকতে প্রথম কোন্ দিন সে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থিনীর কলায়সজনিত আবিষ্টতা লক্ষ্য ক'রে রজ্জুতে সর্প ভ্রম ক'রে বসল তা নির্ণয় ক'রে বলবার কোনো উপায় নেই।

যেদিনকার কথা বলছিলাম, সেদিনও সুভদ্রা আমার কাছ থেকে একটা গান শিখে নিয়েছিল। গান শেখার পর তাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা মাত্র এই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ।

চাপা কান্নার আবেগে কমললতার দেহ মৃদু মৃদু কাঁপছিল। সযত্নে তার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে স্নিগ্ধকণ্ঠে বললাম, ছি কমল, তুমি এমন ছেলেমানুষ তা ত জানতাম না! সুভদ্রা তোমার বিন্দুমাত্র অনিষ্ট করে নি, যার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হ'য়ে সুভদ্রাহীন দেশে পালাতে হবে। দেখ, আমি ভদ্রলোক, ভদ্রসন্তান,—কাজেই আমার এ কথা তোমাকে একেবারে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতেই হবে; কারণ আমি আর যা কিছু অন্যায় কাজ করি না কেন, প্রতারণা কখনই করব না, বিশেষত নিজের স্ত্রীর সঙ্গে। এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বললাম, তবে যদি তুমি সাধারণ স্ত্রীলোকের মতো ভদ্রলোকের কথার ওপর আরও কিছু আশ্বাস পেতে চাও, তা হ'লে তোমারই স্বামীর দিব্যি দিয়ে বলব যে, সুভদ্রার বিষয়ে তোমার যা সন্দেহ তার মূলে যদি বিন্দুমাত্র সত্যি থাকে, তা হ'লে তিন দিনের মধ্যে যেন তোমার সীঁথির—

বিদ্যুৎ-স্পৃষ্টের মতো সহসা লাফিয়ে উঠে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে সগর্জনে কমললতা বললে, খবরদার! যা-তা কথা বলতে পারবে না।

বললাম, কিন্তু না বলে উপায় কি বল? তুমি যে ভদ্রলোকের কথা বিশ্বাস করছ না।

একটু উষ্মাসহকারে কমললতা বললে, করছি।

বললাম, ষোল আনা?

চোখ মুছতে মুছতে কমললতা বললে, যখন করছি, তখন ষোল আনাই করছি। তারপর, আবেগভরে আমার দু হাত চেপে ধ'রে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, অকারণ তোমাকে সন্দেহ করেছিলাম, আমাকে তুমি ক্ষমা কর।

হাসিমুখে বললাম, ক্ষমা করব, বলছ কি কমল? তোমার সন্দেহ দেখে এত খুশি হয়েছি যে, কি বকশিশ তোমাকে দেব সেই কথাই শুধু ভাবছি। জান ত ভালবাসা যদি আলো হয় ত সন্দেহ তার ছায়া? আর, ছায়া যত গাঢ়, বুঝতে হবে আলো তত প্রখর। সুতরাং তোমার প্রগাঢ় সন্দেহের পিছনে যে প্রখর ভালবাসা আছে, তার পরিচয় পেয়ে

খুশি ছাড়া আর কি হব? বিশ্বাস ত আমার কথা তুমি করেইছ, তার ওপর তোমাকে একটা আশ্বাসও দিতে পারি।

জিজ্ঞাসুনেত্রে আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কমল বললে, কি আশ্বাস?

বললাম, পাঁচ-ছ দিনের মধ্যে সুভদ্রারা এখান থেকে চ'লে যাচ্ছে।

কমললতা বললে, কিন্তু এ আশ্বাসের আর দরকার নেই।

দরকার যে ছিল না, তার নিঃসংশয় বার্তা পরবর্তী পাঁচ-ছ দিন ধ'রে প্রতিদিনই পেয়েছিলাম সুভদ্রার উপস্থিতিকালে কমললতার মুখের নিরুদ্বেগ প্রশান্তির মধ্যে।

কিন্তু যত বার্তাই পাই না কেন, এ কথা স্বীকার না ক'রেও উপায় নেই যে, যখন সুভদ্রা সত্যি-সত্যিই চ'লে গেল, তখন থেকে কমললতা ঠিক তেমনিভাবে উল্লসিত হ'য়ে উঠতে লাগল—যেমন উল্লসিত হ'য়ে ওঠে শুকনো দুর্বাঘাস আষাঢ় মাসের প্রথম বর্ষণ পাওয়ার পর থেকে।

অল্পকালের জন্য সুভদ্রা একটি অশুভ উল্কার রূপ নিয়ে আমাদের সংসারের আকাশে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু চ'লে যখন সে গেল, তখন ঠিক অপ্রত্যাবর্তনশীল উল্কারই মতো কোনোদিন ফিরে আসবার সম্ভাবনা না রেখেই চ'লে গেল। আমার বিশ্বাস, এতদিনে সে কোনো ভাগ্যবন্ত শ্বশুরঘরের আকাশে তারকারূপে উদিত হয়েছে।

দেখতে দেখতে পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যের কল্যাণে কমললতার কৃশ দেহ পূর্বেকার মহিমায় ফিরে এল।

দেওঘর কমলের ভাল লেগেছিল, তাই তারই ইচ্ছায় আর আগ্রহে এই বাড়ি কিনে পুরানো ইমারৎ ভেঙে নতুন বাড়ি তৈরি ক'রে নাম দিলাম কমলকুঞ্জ—এ-সব কথা তুই ভাল ক'রেই জানিস ভন্তু।

বাড়ি শেষ হবার মাস তিনেক পরে আমরা কলকাতা ফিরে গেলাম। তারপর সুযোগ-সুবিধা মতো দু-তিন মাস অন্তর মাঝে মাঝে দেওঘর এসে বাস ক'রে যেতাম।

বছর দুই কতকটা ভালই কাটল। তারপর প্রবল ইনফ্লুয়েঞ্জার একটা দীর্ঘস্থায়ী আক্রমণের ফলে কমললতার স্বাস্থ্যে ভাঙন ধরল। কোনোদিন বুকে বেদনা বোধ হয়, কোনোদিন পাঁজরায়; ক্রমশ ঘুষঘুষে জ্বর আরম্ভ হ'ল, সঙ্গে সঙ্গে খুসখুসে কাশি।

নিশ্চিন্ত হবার নাম ক'রে ডাক্তার স্পিউটাম পরীক্ষা করালেন।

ফল দেখে খুব নিশ্চিন্ত হ'তে পারলেন ব'লে মনে হ'ল না। তারপর ফুসফুসের এক্স-রে পরীক্ষা করালেন। প্লেট দেখে বললেন, আশঙ্কার মতো তেমন কিছু পাওয়া না গেলেও পূর্বাহ্ণে সাবধান হওয়া ভাল।

ডাক্তারের পরামর্শমতো কিছু ওষুধ-পত্র টাকা-কড়ি আর ব্যাঙ্কের গোটা তিনেক মোটা চেক-বই নিয়ে কমললতাকে সঙ্গে ক'রে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম রাঁচি। সুবিধে হ'ল না। তার পর রাঁচিনিবাসী আমার এক বন্ধুর পরামর্শে গেলাম হিমালয়ের এক অতি নিভৃত পল্লী ধুনাঘাটে। শুনেছিলাম সেখানকার ঘনসন্নিবিষ্ট পাইন-বনের নির্যাসবাহী হাওয়ায় অবসন্ন ফুসফুস দেখতে দেখতে তাজা হ'য়ে ওঠে। কিন্তু বাসস্থানের দুঃসহ অসুবিধার জন্য টেকতে পারলাম না সেখানে। নেমে এলাম আলমোরা শহরে। সেখানে মাস তিনেক অবস্থানের পর নিঃসংশয় হলাম, যে-কীটের মারাত্মক আক্রমণ থেকে নিস্তার পাওয়া দুঃসাধ্য, সেই কীটই কমলের ফুসফুসে প্রবেশ করেছে।

ডাক্তার বললেন, শুধু স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার কাছে আর তেমন কিছু উপকার প্রত্যাশা করা যায় না, বিশেষজ্ঞ দ্বারা বিশেষ প্রণালীর চিকিৎসার সাহায্য নেওয়া দরকার। সেই পরামর্শ অনুযায়ী কমললতাকে নিয়ে ভাওয়ালী যক্ষ্মানিবাসে উপনীত হলাম। তখন ভাই, আমার সোনার কমল দুষ্টব্যাধির দংশনে একেবারে শুকিয়ে এসেছে। জল, বায়ু, ওষুধ-পত্র আর চিকিৎসাপ্রণালীর সাহায্যে মাস চারেক ধ'রে সেই দুষ্টব্যাধির বিরুদ্ধে একটা দুর্দান্ত যুদ্ধ চালানো গেল ;—কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিষ্ফল হ'ল ভাওয়ালী। তখন কথা উঠল পেন্ড্রা রোডে যাবার।

প্রবলভাবে আপত্তি ক'রে কমললতা বললে, তোমারই বল আর আমারই বল, বুঝতে কি আর বাকি আছে কিছু? ভাওয়ালীতে যা হ'ল না, পেন্ড্রা রোডেও তা হবে না। এখনো যদি কোনো রকমে হাড়গুলো নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় ত নিয়ে চল আমাকে কমলকুঞ্জে। বাঁচি ত সেখানেই বাঁচব, মরি ত সেখানেই।

তাই-ই করলাম। অনেক রকম বিধি-ব্যবস্থা ক'রে কোনো রকমে কমললতার অবিগতপ্রাণ-কঙ্কালখানা কমলকুঞ্জে এনে ফেললাম। জষ্টি মাসের পাহাড়ে-নদীর ধারা দেখিছিস ভন্তু? কমললতার তখন সেই মূর্তি। আগেকার সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী গৃহস্বামিনীর বর্তমান অবস্থা দেখে

পুরোনো মালী হাউ মাউ ক'রে কাঁদতে লাগল। সস্কেতে তাকে চুপ করতে ব'লে চিঠি লিখে ডক্টর ব্যানার্জির কাছে পাঠালাম।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ডক্টর ব্যানার্জি এসে হাজির হলেন। মৃত্যুপথ-যাত্রিনী রোগিণীর পাশে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে থেকে তার একখানা শীর্ণ হাত ধীরে ধীরে তুলে নিয়ে নাড়ী দেখতে লাগলেন।

কমললতা বললে, এবার পারবেন না ডাক্তারবাবু।

ঈষৎ আবেগের সঙ্গে ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, না পারাবার ত কোনো কারণ দেখছি নে।

কমল বললে, আশা আছে?

রোগিণীকে আশ্বাস দেওয়ার উদ্দেশ্যেই নিশ্চয়, উচ্ছ্বসিত স্বরে ডাক্তার বললেন, নিশ্চয়ই আছে।

কমলের মুখে কৌতুকের অতি ক্ষীণ মৃদু হাসি দেখা দিলে, বললে, আমার আশা নেই তা জানি। আপনার আশার কথা জিজ্ঞাসা করছি। এখানেই আছে ত?

কৌতুক বুঝতে পেরে ডাক্তার হেসে উঠে বললেন, হ্যাঁ, এখানেই আছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

বহুক্ষণ ধৈর্য ধ'রে আর মনোযোগের সঙ্গে রোগিণীকে পরীক্ষা ক'রে দেখে বারান্দায় বেরিয়ে এসে ডক্টর ব্যানার্জি যে কথা বললেন, তার অর্থ, কমলের জীবনের মেয়াদ মাস খানেকের বেশি অতিক্রম করবে না ব'লে তাঁর অনুমান। বললেন, মাস খানেকের মধ্যে কোনো বিপদ হবে ব'লে আশঙ্কা করি নে।

চিকিৎসার ব্যবস্থা যা করলেন, তার লক্ষ্য রোগ প্রায় কিছুই নয়, সবটাই রোগিণী, অর্থাৎ যতটা সম্ভব সাময়িক ভাবে রোগিণীর যন্ত্রণার লাঘব করা।

দিন পনেরো একটা থমথমে ভাবের মধ্যে কাটল; তারপর হঠাৎ একদিন প্রবল ভাঁটার টান দেখা দিলে। কমললতার বিশীর্ণ দেহের মধ্যে প্রাণশক্তির যে সামান্য অবশেষটুকু ছিল, দেখতে দেখতে তা লুপ্ত হ'য়ে এল।

ডাক্তার এবং রোগিণী উভয়েরই কাছ থেকে প্রায় একই সময়ে একই মর্মের নোটিশ পেলাম। ঠিক আগেকার কথার বাঁধুনি অনুসারে ডাক্তার

বললেন, অবস্থা খুবই গুরুতর, তবে সপ্তাহ খানেকের আগে কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। রোগিণী বললে, দেখ, দেহের মধ্যে এমন সব অদ্ভুত অনুভূতি আরম্ভ হয়েছে, যেমন এর আগে কোনোদিন হয় নি। এ যেন বাঁধন-ছেঁড়ার অনুভূতি। দেহ ছেড়ে প্রাণটা বেরোবার সময় এমনই বোধহয় হয়। কষ্ট সবচেয়ে বেশি কিসের জান?

কমললতার শিয়রে ব'সে ধীরে ধীরে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলাম। বললাম, নিশ্বাসের?

বললে, না না, দেহের নয়, মনের কষ্টের কথা বলছি। তোমাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে, সেই কষ্ট সবচেয়ে বড় কষ্ট। অনেক সৌভাগ্যের জোরে তোমার মতো স্বামী পেয়েছিলাম; তার চেয়েও অনেক বেশি দুর্ভাগ্যের পাপে তোমাকে ফেলে যেতে হচ্ছে। এ যে কী দুঃসহ কষ্ট তা কি তুমি ঠিক বুঝতে পারছ?—ব'লে তার দুর্বল হাতের শীর্ণ আঙুল দিয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরলে। তারপর, তার দুই চক্ষু দিয়ে দরবিগলিত ধারায় নিঃশব্দ অশ্রু ঝ'রে পড়তে লাগল।

নিজের উদ্গতপ্রায় অশ্রুকে কোনো রকমে রোধ ক'রে কোঁচার কাপড় দিয়ে কমলের দুই চক্ষু মুছিয়ে দিয়ে বললাম, ছিঃ কমল, ছেলে-মানুষের মতো কী যা-তা বলছ? এ-সব কথার কোনো মানে নেই।

আমার হাতখানা আর একটু জোরে চেপে ধ'রে কমল বললে, আছে, আছে, মানে আছে। বুঝতে পারছ না, আমি চ'লে যাচ্ছি? কথাগুলো বলতে দিয়ে আমাকে হাল্কা হ'তে দাও। আটকো না। তারপর কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একটু দম নিয়ে বললে, দেখ, এই সুন্দর পৃথিবী, এই দেওঘর, এই এত সাধের কমলকুঞ্জ, তারপর বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন,—এ-সব ছেড়ে যেতে আমার একটুও ইচ্ছে নেই। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যেতে যে কষ্ট হচ্ছে, তার তুলনায় এ-সব ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট একেবারে নগণ্য। তোমার তুলনায় এ-সবের কোনো মূল্যই নেই।

সমস্ত দিন ধ'রে কমল এই ধরণের কথা ব'লে আপ্‌শা-আপ্‌শি করলে। তার প্রতি আমার আকর্ষণের মাত্রা তুই অনুমান করতে পারিস ভক্ত, কিন্তু তার এই বিচ্ছেদ-ব্যাকুল অতি উগ্র আকর্ষণের কাছে আমার ভালবাসা যেন একটা উপায়হীন দীনতায় অপ্রতিভ হ'য়ে উঠল।

ভাষা হারাতে লাগলাম তার কথার উত্তর দেবার চেষ্টায়। ভয় হ'তে লাগল তার কাছে গিয়ে বসতে।

সন্ধ্যার পর কমলের পাশে ব'সে তার একখানা হাত নিয়ে নাড়াচাড়া করছিলাম। এক সময়ে মাথাটা আমার মুখের দিকে একটু ফিরিয়ে সে বললে, দেখ, জন্মান্তরবাদ, আত্মার অমরত্ব—এ-সব কথা আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না। কিন্তু আত্মা যদি সত্যি-সত্যিই থাকে তা হ'লে আমার আত্মার কি গতি হবে জান? কোনো স্বর্গে গিয়ে সে বাসা বাঁধবে না, দিবারাত্র তোমার আশেপাশে ঘুরবে। তা ব'লে ভয় পেয়ো না, অনিষ্ট তোমার নিশ্চয়ই করবে না।—ব'লে অল্প একটু হেসে উঠল।

বললাম, কথা ক'য়ো না কমল, বেশি কথা কওয়া তোমার মানা।

বললে, এখন ত মানামানির বাইরে এসেছি, এখন আবার কিসের মানা? তারপর অল্প একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, এক-এক সময়ে কি মনে হয় জান? মনে হয়, তুমি যদি আমার জীবনে আদৌ দেখা না দিতে তা হ'লেই বোধহয় ভাল ছিল। একবার ত সম্বন্ধ ভেঙেই গেছল। শেষকালে এত দুঃখ তুমি যে আমাকে দেবে, তা জানতাম না।—ব'লে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে ফেললে।

সেই দিন রাত্রি দুটোর সময়ে ঘুম ভেঙে দেখি, কমললতা চিত হ'য়ে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। আসন্ন বিচ্ছেদজনিত যে-দুঃখ এবং বেদনায় সারাদিন সে কষ্ট পেয়েছে, ঘুমন্ত মুখের মধ্যেও যেন তার সুস্পষ্ট ছায়া!

নিঃশব্দ অন্ধকার রাত্রি। বিছানা ছেড়ে বারান্দায় গিয়ে একটা চেয়ারে বসলাম। সমস্ত দিনের কথা ভাবতে ভাবতে মনে হ'ল, কমল যদি এখনও পাঁচ-সাত দিন বাঁচে, এই দুঃসহ যন্ত্রণা ত তাকে পলে পলে দংশন ক'রে মারবে। হঠাৎ একটা কথা বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মতো মনের মধ্যে ঝিলিক মেরে গেল। নিশ্বাস রোধ ক'রে ক্ষণকাল সে-বিষয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করলাম। ঠিক হয়েছে, ঠিক হয়েছে, তাই করা যাক। কি হবে কমললতার জীবনের শেষ কয়েকটা দিন এমন নিদারুণ দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত হ'তে দিয়ে? কার লাভ হবে তাতে? আমার? চুলোয় যাক আমার সেই লাভ, যদি তার পরিবর্তে কমললতাকে মুক্তি দিতে পারি কয়েক দিনের দুর্মদ-মমতার মর্মান্তিক গ্লানি থেকে।

মনে মনে বললাম, হে ভগবান, যদি হিসেবে ভুল ক'রে থাকি, আমার অভিসন্ধি অসৎ নয়, এইটুকু সুবিচার ক'রো।

বাকি রাতটা কেটে গেল একটা নিবিড় চিন্তার আচ্ছন্নতায় বারান্দায় পায়চারি ক'রে ক'রে।

সকালে কমললতার ঘুম ভাঙলে তার মুখ ধুইয়ে দিয়ে সকালবেলাকার বরাদ্দ পথ্য খাইয়ে দিলাম। তারপর একটা ওষুধ খাইয়ে মিনিট দশেক সময় সাধারণ কথাবার্তায় কাটিয়ে একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন অস্ত্র-চিকিৎসকের মতো মনটাকে কঠিন আর অবিচল ক'রে নিয়ে শান্তভাবে বললাম, সুভদ্রাকে তোমার মনে আছে কমল?

একটু চকিত হ'য়ে কমল বললে, আছে বইকি। কেন, সে দেওঘরে এসেছে না-কি? নিষ্প্রভ মুখের মধ্যে একটু যেন উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিলে।

বললাম, না, আসে নি। কোথায় সে আছে, তাও জানি নে।

তীব্র কৌতূহলের কুঞ্চিত চোখে আমার দিকে চেয়ে দেখে বললে, তবে?

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললাম, সুভদ্রার বিষয়ে তুমি যা সন্দেহ করেছিলে তা মিথ্যে নয়। আমি অপরাধী।

মনে হ'ল, অকস্মাৎ কে যেন কমলের বুকের মধ্যে একটা নিষ্ঠুর রক্তপায়ী ছুরি বসিয়ে দিলে। পাংশু মুখে অবর্ণনীয় বিস্ময় আর বেদনার আর্তস্বরে সে ব'লে উঠল, ইস্! তারপর, দু হাত জোড় ক'রে বললে, মিথ্যে দিয়ে এতদিনই যদি ভুলিয়ে রেখেছিলে, দয়া ক'রে আর কয়েকটা দিন রাখলে না কেন? তা হ'লে ত সাধুতার এমন নির্দয় অভিনয় করবার দরকার হ'ত না তোমার! এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, না না, ভালই করেছ। বাঁধন ছেঁড়ার সময়ে আর কোনো কষ্টই থাকবে না। তারপর, নিরতিশয় ঘৃণা আর অভিমানের ক্ষুব্ধ স্বরে 'যাও' ব'লে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে ঘন ঘন হাঁপাতে লাগল।

মুহূর্তের জন্যে মনটা ভেঙে পড়বার উপক্রম করলে। মনে হ'ল, কমললতার আর্ত-ক্ষুব্ধ দেহখানা দু হাত দিয়ে জড়িয়ে ধ'রে বলি, ওরে আমার একান্ত আপনার অন্তরের ধন, কত দুঃখে যে এই নিদারুণ মিথ্যে

কথা তোমাকে বলেছি, তা কি তুমি জান? কিন্তু এই সুতীক্ষ্ণ মিথ্যের সাহায্যে অস্ত্রোপচারের দ্বারা তার মন থেকে নিজেকে কেটে বার ক'রে নিয়ে তাকে হয়ত মোহবিমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি মনে ক'রে চুপ ক'রে রইলাম।

সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও কমল আমার সঙ্গে চোখোচোখি করলে না। অধিকাংশ সময় সে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল। সন্ধ্যার পর নিশ্বাসের কষ্ট একটু বেশি হচ্ছে মনে হাওয়ায় ডক্টর ব্যানার্জির কাছে গেলাম।

ওষুধ নিয়ে ডক্টর ব্যানার্জিকে সঙ্গে ক'রে রাত্রি সওয়া নটার সময়ে বাড়ি ফিরে দেখি, মিনিট পাঁচেক আগে কমললতা পৃথিবী ছেড়ে চ'লে গেছে। তার কাছে আমি অপরাধী—সেই রূঢ় মিথ্যা, যাবার সময়ে সে তার অভিমান-পীড়িত মনের মধ্যে বহন ক'রে নিয়ে গেছে। শেষ-মুহূর্তে যে তার কানে কানে ব'লে দোব, ওগো, শুনে যাও, শুনে যাও, আমি অপরাধী নই, আমি তোমার অনন্যাপরায়ণ স্বামী,—তার সুযোগ দেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে নি।

একবার ভাল ক'রে নাড়ী পরীক্ষা ক'রে দেখে ব্যথিত স্বরে ডক্টর ব্যানার্জি বললেন, যা ছিল অনিবার্য, তাই ঘটেছে। কিন্তু কাল রাত্রেও অবস্থা যা দেখেছিলাম, তাতে একটু যেন অপ্রত্যাশিত ভাবে আকস্মিক হ'ল শেষের দিকটা।

তুই ত জানলি ভন্তু, কেন শেষের দিকটা অপ্রত্যাশিত ভাবে আকস্মিক হয়েছিল! এখন তুই বল্, হন্তা আমাকে বলবি কি-না, আর বাড়ির নাম হন্তারপুর ছাড়া আর কি রাখা যেতে পারত!

৪

অদ্ভুত কাহিনীর মর্মন্তুদ করুণতায় স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলাম, মুখ দিয়ে কোনো উত্তর নির্গত হ'ল না।

রাত্রি নটা থেকে কান পেতে ব'সে ছিলাম। বোধ হয় মিনিট দশেক পরেই ছাতের উপর বিনয়ের কণ্ঠস্বর শুনলাম, "এখন বুঝেছ কমললতা, সেদিন মিথ্যা কথা বলেছিলাম?"

অল্পকাল পরে বিনয় পাশে এসে বসতে বললাম, "আমার যেন মনে হ'ল বিহু, দূর থেকে কমললতা বললে, বুঝেছি।"

চকিত হ'য়ে উচ্ছ্বসিত স্বরে বিনয় বললে, "সত্যি না-কি?" তারপর হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললে, "দূর! আগে আমারও এক-আধবার ঐ ভুল হয়েছে। ও ইউক্যালিপ্টস্ পাতার মর্মর।"

শেষ মীমাংসা

১

সমস্যা মানুষের জীবনেরই বস্তু। সহসা অতর্কিতে আমাদের জীবনের মধ্যে এসে দেখা দেয়; কখনো তার সমাধান সম্ভব হয়, কখনো হয় না। এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার কিছু নেই।

কিন্তু মাস খানেক দেওঘরে স্রেফ বেড়িয়ে আসবার সাধু সঙ্কল্প নিয়ে যেদিন হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে গাড়িতে আরোহণ করলাম, সেদিন যে সমস্যা কয়েকদিন পরে আমার জীবনে উদিত হবার জন্য অলক্ষিতে বিনা টিকিটে সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে এসে সওয়ার হয়েছিল, তার অপরূপত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে বোধহয় তেমন-কিছু অন্যায় হয় না।

বিলাত থেকে ফিরে বেশিদিন উমেদারি করতে হয় নি, একটা পছন্দসই চাকরি পেয়ে গেছি। নিয়োগপত্রও হস্তগত হয়েছে, কিন্তু মাস দুই পরে কাজে যোগ দিতে হবে। কারখানার লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হবার পূর্বে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো কিছুদিন উড়ে বেড়াবার উদ্দেশ্যে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়া।

দেওঘরে বেলাবাগান অঞ্চলে ছোটমাসীমার বাড়ি আছে, সেই বাড়িতেই উঠেছি। বড়দিন পর্যন্ত মাস খানেক সেখানে কাটিয়ে ছোটমাসীমাদের কলকাতায় ফিরে যাবার কয়েকদিন পরেই আমার আবির্ভাব। পুরাতন গৃহরক্ষক তিলোকি আমার অভিভাবকের পদ গ্রহণ করেছে।

আমার দৈনন্দিন কার্যতালিকা সংক্ষিপ্ত এবং পরিবর্তনবর্জিত। সকালে উঠে চা ও ওভাল্টিন সহযোগে মাখন টোস্ট ও ডিমের সদ্ব্যবহার

ক'রে বেরিয়ে পড়া; দু-চার মাইল চক্র দিয়ে, দু-চার জনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ক'রে, মন্মথ ভাণ্ডার থেকে খবরের কাগজ কিনে বেলা দশটা আন্দাজ গৃহে ফিরে আসা; খবরের কাগজ পড়া শেষ ক'রে ইঁদারার শীতল জলে স্নান সেরে মধ্যাহ্ন-আহার সমাপন; তারপর পড়বার ছল ক'রে একখানা বই হাতে নিয়ে ঘুমিয়ে প'ড়ে বেলা তিনটার সময়ে ঘুম ভেঙে উঠে চা খেয়ে মাইল চার-পাঁচ ঘুরে আসা; সর্বশেষে নৈশ-আহার সমাপন ক'রে এক পেয়ালা কফি খেয়ে নিয়ে রাত দেড়টা-দুটো পর্যন্ত বই পড়ার পর বাস্তব জগৎ ছেড়ে স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করা।

প্রায় এক সপ্তাহ ধ'রে একই নিয়মে কার্যতালিকাটি অনুবর্তিত হওয়ার ছন্দে হঠাৎ একদিন যতিভঙ্গ ঘটল। যতিভঙ্গটি যেমন অচিন্তনীয় তেমনই নাটকীয়।

সেদিন অপরাহ্নে চা-পানের পর রিকিয়ার দিকে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যা উপস্থিত হওয়ায় প্রত্যাবর্তন করতে হ'ল। আনাড় অঞ্চলে শীতের পথ জনশূন্য হ'য়ে গেছে। দেওঘরে শ্মশান-ভূমির কাছাকাছি এসে হঠাৎ কানে এল দূরাগত রমণীকণ্ঠের কাতর ধ্বনি। ব্যস্ত হ'য়ে দ্রুতপদে শ্মশানের পাশে উপস্থিত হ'য়ে দেখি, পথের উপর একটা খালি রিক্‌শ প'ড়ে আছে, আর শ্মশানের নাবাল ভূমির উপর দাঁড়িয়ে একটা লোক, স্পষ্টত রিক্‌শওয়ালা, একটি তরুণী মেয়ের কণ্ঠ থেকে সোনার হার খুলে নিচ্ছে।

আমাকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি চিৎকার ক'রে উঠল, "বাঁচান! আমাকে বাঁচান!"

উচ্চস্বরে আমি হুঙ্কার দিয়ে উঠলাম, "কিয়া করতা হৈ রে শুয়ারকা বাচ্চা!"

পিছন ফিরে আমাকে দেখে তার অভীষ্ট লাভের পথে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়েছে বুঝতে পেরে ক্রোধে উন্মত্ত হ'য়ে লোকটা কটিদেশ থেকে একটা তীক্ষ্ণ ছোরা বার ক'রে আমার দিকে ধাবিত হ'ল।

চিন্তিত হলাম। অস্ত্র নিয়ে সে আমাকে আক্রমণ করতে আসছে, নিরস্ত্র অবস্থায় আমি কি ক'রে তার প্রতিরোধ করব, তা নিশ্চয়ই দুশ্চিন্তার কথা। অকস্মাৎ একটা ফন্দি মনের মধ্যে উদিত হ'ল। পকেটে একটা উজ্জ্বল পালিশ-করা যন্ত্র ছিল, রিভলভারের মতো সেটা

দেখতে, কিন্তু তা থেকে বুলেট্ বেরোয় না,—বেরোয় অত্যুগ্র শুভ রশ্মি। অর্থাৎ, রিভলভারের ছদ্মাকারে সেটা একটা শক্তিশালী টর্চ। আসবার সময় বিলাত থেকে কিনে এনেছিলাম। গুলি ছোঁড়বার ভাবে রিভলভারটা তার দিকে উঁচিয়ে ধ'রে কঠোর স্বরে বললাম, "সিধা খড়া হোও। হিলো মৎ।"

ক্রুদ্ধ পদের ধপাধপ শব্দ করতে করতে সে দশ-বারো হাতের মধ্যে এসে পড়েছিল, এমন সময়ে সহসা অমন রিভলভার-আস্ফালিত বিপজ্জনক প্রস্তাব শুনে নিমেষের মধ্যে ধপ্ ক'রে গতিরোধ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছোরাসহ দক্ষিণ হাতটা পিছন দিকে ফিরিয়ে ধ'রে একটু কোঙা হ'য়ে কিন্তু দৃষ্টি উঁচু ক'রে আমার দিকে তাকাতে লাগল। তার দাঁড়াবার আর তাকাবার ভঙ্গি দেখে আমার বুঝতে বাকি রইল না, মরিয়া হ'য়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে অথবা জীবন নিয়ে পালিয়ে বাঁচবার চেষ্টা দেখবে, এই ধরণের দ্বিধায় তার মন বিহ্বল হ'য়ে উঠেছে। সংশয়ের কুজ্‌ঝটিকা গাঢ় থাকতে থাকতেই ব্যাপারটা শেষ ক'রে ফেলা ভাল মনে ক'রে আমি চিৎকার ক'রে উঠলাম, "ঠিক হ্যায়।—এক—দো—"

এ ফন্দিটাও ফলদায়ক হ'ল। 'দো'ও বলা, আর 'বাপ রে, জান্ মারা!' ব'লে একটা বিকট আর্তনাদ ছেড়ে এঁকে-বেঁকে দুদ্দাড় ক'রে লোকটা তার বাঁ দিক ধ'রে পালাতে লাগল। বলা বাহুল্য, এঁকে-বেঁকে পালাবার উদ্দেশ্য রিভলভারের বুলেট্ থেকে পৃষ্ঠদেশকে নিরাপদ করবার যথাসাধ্য সম্ভাবনার সৃষ্টি করা।

শ খানেক হাত দূরে গিয়ে লোকটা একবার ফিরে দাঁড়াল। অনিষ্টকে নির্মূল না ক'রে ছাড়তে নেই। "ভাগো মৎ, নজদিক্ আও।" ব'লে ধপাধপ শব্দ ক'রে তার দিকে দশ-বারো হাত ছুটে গেলাম। পুনরায় একটা আর্তনাদ ক'রে লোকটা নিমেষের মধ্যে জঙ্গলের ভিতর অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

শ্মশানভূমির নাবাল জমির উপর মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে। রাত্রির অন্ধকারে তার আকৃতি দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মুখ বোঝা যাচ্ছে না। এইবার তার প্রতি মনোযোগ দেবার অবসর পেলাম। পথের উপর থেকে খানিকটা নেবে গিয়ে রিভলভারের ব্যবহার করলাম,—এক রাশ উজ্জ্বল আলো মেয়েটির মুখের উপর গিয়ে পড়ল। মনে হ'ল, তিমির-সলিলে সহসা যেন একখানি পদ্ম ফুটল।

আর্তকণ্ঠে মেয়েটি ব'লে উঠল, "আমাকে ধরুন।"

টর্চ নিবিয়ে পকেটে ফেলে তাড়াতাড়ি তার কাছে উপস্থিত হ'য়ে দক্ষিণ হস্ত দিয়ে তার বাম বাহু চেপে ধ'রে বললাম, "কেন বলুন ত? শরীর খারাপ বোধ হচ্ছে? গুণ্ডাটা চোট দিয়েছে না-কি কোথাও?"

ঘাড় নেড়ে মেয়েটি বললে, "না। শরীর আমার কেমন অবশ হ'য়ে আসছে। একটু ব'সে সামলে নেব।"

আমিও অনুভব করছিলাম, আমার হাতের মধ্যে মেয়েটির দেহ ক্রমশ যেন বেশি-বেশি ভারী হ'য়ে আসছে। বললাম, "কিন্তু এখানে বেশিক্ষণ বিলম্ব করাও উচিত হবে না। আশ্চর্য নয়, রিকৃশওয়ালাটা বনের ভেতর গা-ঢাকা দিয়ে আমাদের দিকে যদি এগিয়ে আসে! তারপর, যে রিভলভার দিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে তাড়ালাম, একবারও তা আওয়াজ না দেওয়ায় তার মনে যদি সন্দেহ জাগে—রিভলভারটা হয়ত আসলে রিভলভার নয়, আর তারপর যদি আমাদের ছোরা নিয়ে আক্রমণ করে, তখন একটু অসুবিধা হ'তে পারে ত?"

চকিত কণ্ঠে মেয়েটি বললে, "তবে?"

বললাম, "কিছু হয় নি আপনার, হঠাৎ বেশি রকম উত্তেজনা উপস্থিত হওয়ায় স্নায়ুতন্ত্র সাময়িকভাবে একটু দুর্বল হ'য়ে পড়েছে। এক কাজ করুন,—দু হাত দিয়ে আমার বাঁ হাতটা বেশ ক'রে চেপে ধ'রে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলুন।"

কিন্তু সে উপায়ও ফলপ্রদ হ'ল না। কম্পিতকণ্ঠে মেয়েটি বললে, "জোরে চেপে ধরবার শক্তি পাচ্ছি নে।"

এক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে রইলাম। পর-মুহূর্তে টপ ক'রে তরুণীর শিথিল দেহলতা দুই বাহুর উপর তুলে নিয়ে তিমিরাস্পষ্ট মুখের দিকে মুখ একটু নীচু ক'রে বললাম, "এ নিরুপায় অবস্থায় আমাকে ক্ষমা করতেই হবে।" তারপর ধীরপদক্ষেপে সেই বিবশ শিথিল মাংসভার বহন ক'রে পথে উপনীত হ'য়ে একেবারে রিকৃশর আসনে স্থাপন করলাম।

বললাম, "যে ভাবে রিকৃশায় একপাশ হ'য়ে গুছিয়ে বসলেন, মনে হচ্ছে শক্তি খানিকটা ফিরে এসেছে; বিবেচনা কিন্তু পেছিয়ে আছে এখনো। দু হাত দিয়ে দু দিকের হাতল শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে ভাল হ'য়ে বসুন।"

"আর, আপনি ?"

এবার হেসে ফেললাম ; বললাম, "সাধে কি বলেছি, বিবেচনা এখনো পেছিয়ে আছে ! ডান পাশের আধখানা জায়গা আমার জন্তে রেখেছেন না-কি ?"

কোনো উত্তর না দিয়ে মেয়েটি চুপ ক'রে রইল।

বললাম, "ও-জায়গায় আমি উঠে বসলে ছোরাওয়ালা ফিরে আসা পর্যন্ত তুজনে পাশাপাশি নিঃশব্দে ব'সে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করবার থাকবে না। আপনি মাঝখানে স'রে ব'সে বেশ ক'রে ছু দিকের হাতল চেপে ধরুন।"

আমার উপদেশ পালন ক'রে মেয়েটি বললে, "কিন্তু আপনি কি করবেন ?"

"দেখুন না, একটা অতিশয় সৎকার্য করব।" ব'লে বোম ডিঙিয়ে মধ্যস্থলে উপস্থিত হ'য়ে ছু হাত দিয়ে রিক্‌শ তুলে ধ'রে দেহ অবনত ক'রে শহরের দিকে ছুট দিলাম। মানুষ-টানা রিক্‌শ। যে সময়ের কথা বলছি সে সময়ে দেওঘরে সাইকেল-রিক্‌শ অপেক্ষা মানুষ-টানা রিক্‌শরই বেশি চলন।

রিক্‌শর উপর মেয়েটি চঞ্চল হ'য়ে উঠল।

"এ কি ! এ কি ! এ আপনি কি করছেন ?"

কোন্ দিক দিয়ে সহসা কেমন যেন উৎসাহ লাভ ক'রে গতি আর একটু বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, "ঠিকই করছি। এ অবস্থায় এর চেয়ে ভাল আর কিছু করা যায় না।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে মেয়েটি বললে, "লোকে দেখলে কি মনে করবে বলুন ত ?"

বললাম, "হয় মনে করবে, রিক্‌শওয়ালারা ক্রমশ বাবু হ'য়ে উঠছে ; নয় বাবুরা ক্রমশ রিক্‌শওয়ালা হ'য়ে পড়ছে।"

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বললাম, "কোনো-এক দেশের রাজপুত্তুর কোনো-এক দেশের রাজকন্তেকে দৈত্যের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, আজকালকার এই শুকনো যুগে এমন সরস কথা কেউ মনে করবে না।" ব'লে হেসে উঠলাম।

মেয়েটি চুপ ক'রে রইল।

কয়েক গজ এগিয়ে গিয়ে বললাম, "আচ্ছা, আপনি এত হাল্কা কেন বলুন ত ? খান না বুঝি ভাল ক'রে ? আজকালকার মেয়েরা স্বাস্থ্যকে বাঘের মতো ভয় করে।"

মেয়েটি এ কথার কোনো উত্তর দিলে না।

একটু পরে আবার বললাম, "দেখুন, রিক্‌শ টানা যে এত মজার তা স্বপ্নেও জানতাম না। রিক্‌শওয়ালাদের রিক্‌শ টানতে দেখে মনে কষ্ট পাই। কিন্তু এখন দেখছি এর মধ্যে কষ্টই শুধু নেই, উত্তেজনাও যথেষ্ট আছে।"

এবারও মেয়েটি প্রথমটা চুপ ক'রে রইল; কিন্তু একটু পরেই কথা কইলে। বললে, "একটা কথা বলব ?"

গাড়ির গতি মন্দ ক'রে নিয়ে বললাম, "বলুন।"

"এ আমার একটুও ভাল লাগছে না।"

"কি ভাল লাগছে না ?—এই যে আমি আপনাকে বহন ক'রে নিয়ে চলেছি, তা-ই ?"

"হ্যাঁ।"

"কিন্তু, কেন বলুন ত ?—একজন অজানা অচেনা মানুষ, জীবনে যার সঙ্গে হয়ত আর কোনো দিনই দেখা হবার সুযোগ ঘটবে না, এই নির্জন পথ দিয়ে রিক্‌শ টেনে আপনাকে রাত্রির অন্ধকার ভেদ ক'রে নিয়ে চলেছে, এর মধ্যে কি কোনো নূতনত্ব, কোনো উত্তেজনা পাচ্ছেন না ?"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললাম, "তবে যদি একান্তই কুণ্ঠা জাগে, কিছু না-হয় মাশুল ধ'রে দেবেন। মাশুলের পরিমাণ নিয়ে আমি পেড়াপিড়ি করব না,—প্রসন্ন মনে যা দেবেন দু হাত পেতে তাই নেব।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম।

"একটু রাখুন ত।"

"নাববেন ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন বলুন ত ?"

"দরকার আছে।"

অগত্যা রিক্‌শ নামালাম।

মেয়েটি নেমে প'ড়ে দু-চার পা পায়চারি ক'রে বললে, "দেখুন,

আমার হাত-পায়ের সেই অবশ ভাব সেরে গেছে, এখন হাঁটতে পারব। চলুন, দুজনে হেঁটে যাই। দরকারের সময়ে আপনাকে ত কষ্ট দিতে ছাড়ি নি।"

"কিন্তু হতভাগ্য রিকৃশর কি হবে?"

"এখানে প'ড়ে থাক্।"

বললাম, "সেটা সঙ্গত হবে না, রিকৃশ থানায় জমা দিতে হবে। আপনার ওপর যে রাহাজানি হচ্ছিল, তার দুর্বৃত্তকে ধরবার আর শাস্তি দেওয়াবার জন্যে সাক্ষী-সবুত চাই ত? সাক্ষী হব আমি, আর সবুত হবে ওই রিকৃশ।"

"তার জন্যে রিকৃশ থানায় জমা দেওয়া কি একান্তই দরকার?"

"একান্তই। তবেই ধরুন, আমরা দুজনেই যদি হেঁটে যাই, রিকৃশ টানবে তা হ'লে কে?—আপনি নিশ্চয়ই নয়। আমি? আচ্ছা, আপনি হেঁটে চলেছেন, আর আমি খালি-রিকৃশ টেনে চলেছি, দৃশ্যটা কতদূর বিসদৃশ আর আমার পক্ষে হীনতাজনক হবে বলুন দেখি? একটা কথা আমার বিশ্বাস করবেন?"

তরুণী বললে, "আমি আপনার কোনো কথাই অবিশ্বাস করব না।"

"ধন্যবাদ। কথাটা হচ্ছে, আপনাকে টানতে আমি কষ্টবোধ করি নে। কেন করি নে, সে কথা বুঝিয়ে দিচ্ছি। বেলুন দেখেছেন নিশ্চয়ই?—ছেলেদের খেলবার বেলুন?"

মৃদুস্বরে তরুণী বললে, "দেখেছি।"

"বেলুনে দুটো জিনিস থাকে,—একটুখানি রবার আর খানিকটা হাওয়া। চোপসা রবারটুকুর তবু কিছু ভার অনুভব করা যায়, কিন্তু যাই সেটার পেটের মধ্যে খানিকটা বায়ু আশ্রয় করে অমনি যেন রবারটুকুর ভারও লুপ্ত হ'য়ে যায়। হাতের চেটোয় রাখলে অতি সামান্য আঘাতেই বেলুনটা যেন ছেড়ে পালাবার জন্যে লাফাতে থাকে। আপনার বিষয়েও ঠিক একই কথা। খালি রিকৃশটার নিশ্চয়ই কিছু ভার আছে, কিন্তু আপনি তার সঙ্গে যুক্ত হ'লে মোটের উপর সবটা যেন হাল্কা হ'য়েই ওঠে। আসলে অবশ্য তা হয় না, মনে হয় তা হয়েছে। বেলুনের ক্ষেত্রে এর যেমন বৈজ্ঞানিক কৈফিয়ত আছে, আপনার ক্ষেত্রেও তেমনি আছে মনস্তাত্ত্বিক কৈফিয়ত।" ব'লে হাসতে লাগলাম।

মেয়েটি ধীরে ধীরে বললে, "আচ্ছা, তা হ'লে উঠেই বসি।"

বললাম, "একটু দাঁড়ান, টর্চটা আপনার হাতে দিই। ঘন্টিটা রিক্শওয়ালার কাছে আছে। আমার হাতে থাকলে টুন্‌টুন্‌ ক'রে শব্দ করতে করতে আপনাকে নিয়ে ছুটতে পারলে রিক্‌শ চালাবার ষোল আনা শখ মেটানো যেত। অভাবে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে যাওয়া যাক। দরকার হ'লেই আমি বলব 'আলো ছাড়ুন', আর সঙ্গে সঙ্গে আপনি আলো ছাড়বেন।"

পকেট থেকে টর্চটা বার ক'রে বললাম, "সাধু হ'য়েও গুণ্ডার আকার ধারণ ক'রে এই টর্চটি আজ আপনাকে গুণ্ডার হাত থেকে রক্ষা করেছে। এর প্রতি আপনার একটু কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এই দেখুন, খুলতে হ'লে এই টিপকলটা আঙুল দিয়ে এই রকম ক'রে পিছন দিকে টানতে হয়।"

টর্চের উজ্জ্বল আলোক-ছটার মধ্যে মেয়েটির মুখ প্রদীপ্ত হ'য়ে উঠল। টর্চটা নেবার জন্য কুণ্ঠিত চক্ষে সে হাত বাড়ালে। টর্চটা নিভিয়ে তার হাতে দিলাম। বললাম, "একবার না-হয় পরীক্ষা ক'রে দেখুন।"

বলা মাত্র ঝপ ক'রে আমার মুখের ওপর এক ঝাঁক উজ্জ্বল আলোক এসে পড়ল। হাত দিয়ে আড়াল ক'রে বললাম, "বুঝেছি। ঠিক আছে। নিভিয়ে ফেলুন।"

টর্চ নিভল। তারপর মেয়েটিকে রিক্‌শয় তুলে নিয়ে আবার ছুটে চললাম।

খানিকটা গিয়ে এক জায়গায় পথটা মনে হ'ল একটু বেঁকে গেছে। বললাম, "আলো ছাড়ুন।" টর্চ বোধহয় উদ্যত হ'য়েই ছিল, পথের দু পাশ আলোকিত হ'য়ে উঠল, মাঝখানে আমার বিচিত্র ছায়া ছুটে চলেছে। বললাম, "দয়া ক'রে ঠিক আমার পিঠে ছাড়বেন না।"

ব্যস্ত কুণ্ঠিত কণ্ঠে মেয়েটি বললে, "আপনার পিঠে ছাড়ছি নে ত!"

"মাথায়ও ছাড়বেন না। দয়া ক'রে একটু বাঁ দিক ঘেঁষে ছাড়ুন।"

পথের বাম দিক আলোকিত হ'য়ে উঠল। বললাম, "হয়েছে। নিভিয়ে দিন।"

পথ অন্ধকার হ'য়ে গেল।

সবসুদ্ধ চারবার টর্চ জ্বালাবার প্রয়োজন হয়েছিল। চতুর্থবারে জ্বালতে দেখা গেল অদূরে একজন লোক আসছে। নিকটে এলে শ্রমিক

ব'লে মনে হ'ল। পুরো এক টাকার লোভ দেখিয়ে তাকে রিক্‌শ টানতে রাজি করলাম। একবার মাত্র সে জিজ্ঞাসা করলে, "বাবুজী, আপকা রিক্‌শওয়ালা কাঁহা গিয়া?" বললাম, "শশুরার গিয়া।" এ কথার পর আর কোনো প্রশ্ন খুঁজে না পেয়ে আমার সঙ্গে হাত বদল ক'রে নিলে।

মেয়েটিকে লক্ষ্য ক'রে বললাম, "আর কোনো কুণ্ঠা রইল না ত আপনার?"

মেয়েটি বললে, "না, তা রইল না। আপনি এবার উঠে আসুন।"

দেখলাম, এক পাশে স'রে গিয়ে মেয়েটি আমার বসবার জায়গা ক'রে দিয়েছে। বললাম, "না না, ভাল ক'রে সোজা হ'য়ে আপনি বসুন। আমার ত হেঁটে বেড়াবার জন্যেই দেওঘরে আসা। বাঁ হাতে আপনার গাড়ি ধ'রে গল্প করতে করতে আনন্দের সঙ্গে আমি হেঁটে চলি।"

মেয়েটির শান্ত কণ্ঠস্বর ঈষৎ কঠোর হ'য়ে এল; বললে, "দেখুন, এ পর্যন্ত আমি আপনার সকল কথা শুনে এসেছি, এখন আপনি যদি আমার এ অনুরোধটুকুও না রাখেন, তা হ'লে আমার কি করা উচিত বলুন ত?"

বললাম, "কঠিন প্রশ্ন। এ লোকটাকে বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা ভাল হবে না। রিক্‌শয় উঠে আপনার পাশে ব'সেই তা হ'লে উত্তর কি হ'তে পারে ভাবা যাক।" ব'লে গাড়িতে উঠে বসলাম।

২

অপরিচিতার পাশে ব'সে কিন্তু আমার রসপ্রিয় মনকে কষাঘাতের ভয় দেখিয়ে বললাম, খবরদার! ইতিপূর্বেই কিছু প্রগল্‌ভতা, কিছু কাব্যকলাপ ক'রে চুকেছ; স্থান কাল পাত্র ও অবস্থার বিবেচনায় ক্ষমা হয়ত তার ছিল,—আর কিন্তু থাকবে না। লোকালয় সমীপবর্তী হয়েছে; লৌকিক এলাকায় প্রবেশ করবার পূর্বে তোমার সামাজিক মনকে জাগ্রত ক'রে শিষ্ট হ'য়ে নাও। নিরুপায় অবস্থায় একটি সুন্দরী তরুণীকে হাতের মধ্যে পেয়ে তার প্রতি প্রেমোৎসর্জন যে করতেই হবে, এ অবৈধ দুর্বলতা পরিহার কর।

মনের এক কোণ থেকে এক তার্কিক ব'লে উঠল, কিন্তু এই আপাত-অবৈধ উৎসর্জনকে বৈধ ক'রে নিতে তোমার পক্ষে, সামাজিক অথবা

নৈতিক, কোনো প্রকারের অসুবিধে ত নেই। বিবাহের দ্বারা বৈধীকরণ একটা আইনসঙ্গত রীতি,—এ কথা তুমি নিশ্চয়ই অবগত আছ। উত্তরে বললাম, এ তুমি শুধু এক পক্ষের কথা ভেবে বলছ, অপর পক্ষের কথা ভাবছ না। অপর পক্ষে যদি সীমন্তে সিঁদুর-রেখার উপস্থিতির অথবা অপস্থতির অসুবিধে থাকে, তা হ'লে ?

সত্যিই ত। পরিচয়ের যে সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র সম্মুখে প্রসারিত হয়েছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলাম, নিষেধের লাল আলো অথবা আহ্বানের সবুজ,—কিছুই দেখা যায় না, সুতরাং সতর্ক হওয়াই উচিত। কথোপকথনের রীতি পাল্টে দিয়ে বললাম, "রাতের মুখে অমন নির্জন স্থানে আপনার একা যাওয়া উচিত হয় নি কিন্তু।"

তরুণী বললে, "চার বৎসর আগে আজকের দিনে ঠিক ঐ সময়ে মার চিতায় মালা দিয়েছিলাম। তারপর প্রতি বৎসরই দিয়ে আসছি। আজ দিয়ে ওঠার পর ঐ বিপদ। কখনো ত এখানে এ রকম ব্যাপার শোনা যায় না।"

বললাম, "সঙ্গে কাউকে আনলে ভাল করতেন।"

"কাকে আনব বলুন? অভিভাবকের মধ্যে এখানে ত একমাত্র ঠাকুমা; তিনি ত বাতে পঙ্গু।" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "আপনার সঙ্গে পরিচয় ছিল না; থাকলে আপনাকে সঙ্গে আনতাম।"

কপট ঔদাস্যভরে বললাম, "যদি পরিচয় হয়, আগামী বৎসরে না-হয় নিয়ে আসবেন।"

"পরিচয় হ'তে এখনো বাকি আছে কি ?"

অল্প হেসে বললাম, "পরস্পরের নাম-ধাম-গোত্র পর্যন্ত যখন জানি নে, তখন পরিচয় হ'তে সবই ত বাকি।"

"আমি কিন্তু সে পরিচয়ের কথা বলছিলাম না। আপনি আজ আমার যা উপকার—"

কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, "সেটুকু না করলে আপনার কাছে আমার মুখ দেখাবার জো থাকত না।"

ক্ষণকাল নীরবে অবস্থান করবার পর কুণ্ঠিত স্বরে মেয়েটি বললে, "আমি ভাল ক'রে কথা কইতে পারছি নে ব'লে যেন মনে করবেন না—"

ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, "না না, তাই কখনো কেউ মনে করে! আপনি

কথা কইবার শক্তি হারিয়েছেন ব'লে আমি ত অনুমান করবার শক্তি হারাই নি। যত সামান্যই হোক, কিছু কাজে যখন লেগেছি, মনে মনে একটু কৃতজ্ঞতা বোধ করছেন বইকি।" বুঝতে পারলাম, নিরুপায় বোধ ক'রে মেয়েটি চুপ হ'য়ে গেল। তা যাক্। শুধু নিজেকেই নয়, ওকেও প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। নদীর উভয় তট দৃঢ় থাকলে তবেই মধ্যবর্তী প্রবাহ উচ্ছৃঙ্খল হবার সুযোগ পায় না। নিজের নৈতিক শক্তির সবল হ'য়ে ওঠবার ক্ষমতা দেখে আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম।

৩

কিন্তু আধঘণ্টাটাক পরে থানার প্রধান কর্মচারীর নিকট বিবৃতি লেখাবার সময়ে তরুণী যখন বললে, তার নাম মালতী সেন, এবং পরবর্তী প্রশ্নের উত্তরে ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠে জানালে, সে অবিবাহিতা আর তার পিতার নাম স্বর্গীয় দীননাথ সেন, তখন যে বাসনা-কামনাগুলো নৈতিকতার পাষাণকারার কিছুকাল অবরুদ্ধ হ'য়ে ছিল, সহসা মুক্তিলাভ ক'রে উল্লাসে নৃত্য আরম্ভ করলে। আমার যৌবন-নিকুঞ্জে কোকিল পাপিয়া গান গেয়ে উঠল। মনে মনে বললাম, হে আমার প্রথম ভালবাসার অপরূপা প্রিয়া, জীবন-পণ ক'রে আজ আমি তোমাকে অর্জন করেছি। তুমি আমার, তুমি আমার!

থানার কাজ শেষ হ'লে মালতী সেনের সঙ্গে রাজপথে এসে দাঁড়ালাম। মালতীর জবানবন্দি থেকে অবগত হয়েছিলাম তার গৃহ কার্সটেয়ার্স টাউনে। আমার জবানবন্দি থেকে সে-ও হয়ত লক্ষ্য ক'রে থাকবে, আমার নাম অজয় রায় আর বাস করি বেলাবাগানে।

বললাম, "আপনার জন্যে একটা রিক্‌শ ডেকে দেব?"

মাথা নেড়ে মালতী বললে, "না না, রিক্‌শর কোনো দরকার নেই। এই ত রেললাইন পেরুলেই আমাদের বাড়ি—মিনিট দুয়েকের পথ।"

বললাম, "এবার তা হ'লে আমাদের ঘণ্টা দুয়েকের জীবন-নাট্যের যবনিকা পতন।"

মালতী বললে, "সে কি কথা! আমার ত মনে হয় সবে মাত্র শেষ হ'ল প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য। ভুলে গেলেন, আগামী বৎসর মাকে

মালা দেবার সময়ে আপনি আমার সঙ্গে যাবেন ?—কিন্তু এখন কোথায় যাবেন আপনি ?"

"বেলাবাগান ছাড়া আর কোথায় যাব ?"

"সেখানে কে আছেন আপনার ?"

"সেখানে ? সেখানে আছেন আমার তিলোকি।"

"তিলোকি কে ?"

সহাস্তে বললাম, "তিলোকি আমার ছোটমাসীমার বাড়ির মালী, আর উপস্থিত আমার দেওঘরের অভিভাবক।"

"আপনার স্ত্রী নেই এখানে ?"

"হয়ত আছেন,—কিন্তু এখনো তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয় নি।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম।

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে মালতী বললে, "তিলোকির অভিভাবকত্ব আর কিছুক্ষণের জন্তে অপেক্ষা করুক। এখন দয়া ক'রে চলুন আমাদের বাড়ি।"

"মালতী-নিকুঞ্জে ?"

"মালতী-কুটিরে।"

রাজি হলাম। পথ চলতে চলতে এক সময় দেখা গেল সম্মুখে একটা খালি রিক্শ আসছে। সেটার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে মালতী বললে, "অজয়বাবু, আপনার খেলনার বেলুনের রবার।"

উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠে বললাম, "মনে আছে তা হ'লে দেখছি! কিন্তু শুধু রবারকেই দেখালেন ? শ্রীমতী বায়ুকে দেখালেন না, যিনি অবলীলার সঙ্গে আমাকে টেনে নিয়ে চলেছেন ?" তারপর কণ্ঠস্বর ঈষৎ গাঢ় ক'রে নিয়ে বললাম, "আমাকে বিশ্বাস করুন মালতী দেবী, যে সৌভাগ্যবান জীবনের মধ্যে আপনাকে বহন করবার সুযোগ পাবে, জীবন তার কোনোদিনই ভারাক্রান্ত মনে হবে না।"

"মালতী-বায়ুর সে শক্তি কি আছে ?"

"আমার দশা দেখে সেটা কি এখনো বোঝা যাচ্ছে না ?"

অল্প একটু হেসে মালতী বললে, "দশা ?—না, দুর্দশা ?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললাম, "ঠিক বলেছ মালতী, দুর্দশা! তা হ'লে কি মনে করতে পারি, করুণাময়ীর মনে করুণা জাগতে আরম্ভ করেছে ?"

মৃদুস্বরে মালতী বললে, "করুণাময়ীকে কি এতই অকরুণ মনে করেন ?"

সহাস্যে বললাম, "এ প্রশ্ন থেকে ত করুণাময়ীকে করুণাময়ীই মনে হচ্ছে।" একটু পরে বললাম, "আজ থেকে জীবনে দুটি জিনিস অত্যন্ত প্রিয় হ'য়ে দাঁড়াল মালতী।"

সাগ্রহে মালতী জিজ্ঞাসা করলে, "কি বলুন ত ?"

"মালতী ফুল আর মালতী ছন্দ। মালতী ছন্দ তুমি বোধহয় জান না ?"

সহাস্যে মালতী বললে, "বোধ হয় জানি,

পয়ারের পরে যদি এক বর্ণ হয় হে,
তাহারে মালতী ছন্দ কবিগণ কয় হে ॥"

মালতী যে শিক্ষিত মেয়ে তা তার কথোপকথনের ভঙ্গি থেকে বুঝতে পারছিলাম ; বিস্মিত হলাম তার মালতী ছন্দ সম্বন্ধে জ্ঞানও দেখে। কিন্তু কিছু পরে তার গৃহে উপস্থিত হওয়ার পর কথায় কথায় যখন অবগত হলাম, তার নিবাস কাশীধাম, সেখানে কাকার সঙ্গে সে বাস করে, আর সংস্কৃতে সে এম. এ. পাস, তখন গভীরতর বিস্ময়ের মধ্যে পূর্বের বিস্ময় নিমজ্জিত হ'ল।

মালতী এবং মালতীর শয্যাগতা পিতামহীর সঙ্গে বহুক্ষণ আলাপের পর মালতীর পীড়াপীড়িতে নৈশাহার সমাপন ক'রে যখন গৃহের গেটে এসে দাঁড়ালাম, তখন রাত দশটা বেজে গেছে। পথের উপর একটা রিক্শ অপেক্ষা করছে ; নিশ্চয় মালতী আনিয়ে রাখিয়েছে।

বললাম, "মনের সংবাদ কিছু দিয়ে যাব মালতী ?"

মৃদুস্বরে মালতী বললে, "স্পষ্ট ক'রে দেবার কি এমন-কিছু দরকার আছে ? সংবাদ ত একেবারে অজানা নেই।"

"তবু সবটা হয়ত জান না। 'মন ভ'রে গেছে মালতী ফুলের গন্ধে, আর বুকের স্পন্দন চলেছে মালতী তালের ছন্দে। তোমার মনের সংবাদ কি মালতী ?"

মালতী বললে, "মেয়েদের মনের সংবাদ নিতে নেই, অনুমান করতে হয়। অনুমান করতে পারছেন না ?"

বললাম, "অনুমানের চেয়ে একটু বেশি-কিছু চেয়েছিলাম। মাশুল চেয়েছিলাম সে কথা ভোল নি বোধ হয়।"

"না, নিশ্চয় ভুলি নি।"

"তোমার মনের খবরটা পেলে হয়ত মাশুল শোধ হ'য়ে যেত।"

মালতী বললে, "কাশী থেকে ফিরে কড়ায় গণ্ডায় মাশুল শোধ করব। কাল সকাল সাড়ে সাতটার গাড়িতে আমি কাশী যাচ্ছি।"

আকাশ থেকে পড়লাম। "হঠাৎ?"

মালতী বললে, "একটা বিশেষ জরুরি কাজে।"

"কবে ফিরবে?"

"বুধবার সকাল সাড়ে ছটায় জশিডি পৌঁছব নিশ্চয়।"

"এ পাঁচ দিন আমি মালতীহীন হ'য়ে কি ক'রে কাটাব?"

স্মিতমুখে মালতী বললে, "এ কদিন না-হয় মালতীকে ভুলে থাকার চেষ্টা ক'রেই কাটাবেন।"

পরিহাস নিশ্চয়ই, কিন্তু পরদিন সকালে জশিডি স্টেশনে মালতীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে, এ কথার উত্তর দিলাম। ঘণ্টা পড়েছে, গার্ড হুইস্‌ল্ বাজিয়ে সবুজ পতাকা নাড়ছে, জানলার ধারে ব'সে মালতী ডান হাতখানা একটু ঝুলিয়ে দিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করছে। বললাম, "মালতী, কাল রাত্রে তুমি বলেছিলে তোমার অনুপস্থিতির কয়েক দিন আমি যেন তোমাকে ভুলে যাবার চেষ্টা ক'রে কাটিয়ে দিই। পরিহাস করেছিলে নিশ্চয়ই; তবু আমি তার প্রতিবাদে যে কথা বলছি, তুমি যেন তা ভুলো না।"

মৃদুস্বরে মালতী বললে, "কি কথা?"

মালতীর বিলম্বিত হাতখানা চেপে ধ'রে বললাম, "তোমাকে নিশ্চয় জানান দিলাম—এ জীবনে হয় তুমি, নয় আর কেউ নয়।"

গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছিল। মালতীর হাত ছেড়ে দিয়ে দেখি, তার দুই চক্ষে অপরিসীম সহানুভূতির ছায়া।

৪

দেওঘরের প্রথম মাঘের দুর্দান্ত শীত। তার উপর পূর্ব রাত্রি থেকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া আরম্ভ হয়েছে। বুধবার প্রত্যূষে জশিডি স্টেশনে মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার যখন প্রবেশ করল, তার কিছু পূর্ব থেকে বৃষ্টির প্রকোপ অনেকটা কমেছিল বটে, কিন্তু কন্‌কনে বায়ুর তীক্ষ্ণ দংশনে প্ল্যাটফর্মের নর-নারী আর্ত হ'য়ে উঠেছে।

গাড়ি সম্পূর্ণ থামবার পূর্বেই মালতীকে দেখতে পেলাম। কুলি ডাকবার উদ্দেশ্যেই বোধহয় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আছে। সানন্দে চিৎকার ক'রে উঠলাম, "মালতী!"

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে আনন্দের নিঃশব্দ প্রসন্নতায় মালতীর মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল। একটা কুলির দ্বারা তার শয্যা এবং সুটকেস নামিয়ে দিয়ে সে এক ধাপ ফুটবোর্ডের উপর নেমে এল। জশিডির প্ল্যাটফর্ম নীচু, মালতীর দিকে দু হাত প্রসারিত ক'রে দিলাম। দু হাত দিয়ে আমার প্রসারিত দু হাত চেপে ধ'রে মালতী লাফিয়ে পড়ল প্রায় আমার বুকের উপর। হাত ছেড়ে দিয়ে হাসিমুখে বললে, "এত দুর্যোগেও এসেছ তুমি!"

বললাম, "অজয় হ'য়ে ত জন্মাও নি, বুঝবে কেমন ক'রে অজয়ের ছটফটানির কথা?"

কুলি জিনিস নিয়ে ব্রাঞ্চ লাইনের দিকে এগিয়ে চলেছিল। চলতে চলতে মালতী বললে, "মালতী হ'য়ে যদি জন্মাতে, তা হ'লে বুঝতে মালতীর ধড়ফড়ানির দুঃখ।"

হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখনও আবার কিসের ধড়ফড়ানির দুঃখ মালতী?"

মালতী বললে, "সে ধড়ফড়ানির দুঃখ বিশ্বেশ্বরের কাছে জানিয়ে এসেছি, তোমাকে জানিয়ে আর দুঃখ দিই কেন?"

একটু বিস্মিত হ'য়ে বললাম, "সংশয় কেন মালতী? এখনো কি তোমাকে আমি পরিপূর্ণভাবে পাই নি?"

হাসিমুখে মালতী বললে, "তা হ'লে কি দু মিনিট আগে, তোমার দু হাত ধ'রে অমন ক'রে ঝাঁপিয়ে পড়ি?"

হঠাৎ খেয়াল হ'ল মালতী আমাকে 'তুমি' ব'লে সম্বোধন করছে। ভারি খুশি হলাম। বুঝলাম, কাশী থেকে ফিরে জশিডিতে পদার্পণ ক'রেই সে তার কথামতো মাশুল পরিশোধ করতে আরম্ভ করেছে। কাশী যাবার পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত সে আমাকে 'আপনি' ব'লে সম্বোধন করেছিল।

আবার বৃষ্টিটা একটু জোরে এসেছে, তাড়াতাড়ি একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে কুলির হাতে একটা টাকা দিলাম। বকশিশের অবিশ্বাস্য আয়তনে খুশি হ'য়ে দীর্ঘ সেলাম বাজিয়ে কুলি প্রস্থান করলে। সে

বুঝলে না বকশিশের আয়তনের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার নিজের পাওয়া বকশিশের আয়তন।

মালতী বললে, "তুমি দিলে যে ?"

বললাম, "এখন থেকে আমার উপস্থিতিতে তোমার সব খরচ আমার।"

মালতী হাসতে লাগল; বললে, "আচ্ছা, আজই সন্ধ্যের সময়ে গয়নার দোকানে গিয়ে এ কথার পরীক্ষা নেওয়া যাবে।"

বললাম, "আশা করি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পারব।"

দুটো বেঞ্চে দুজনে সামনাসামনি বসলাম। এতক্ষণ মালতীকে ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ পাই নি। বললাম, "মালতী, তোমার কিন্তু ঠাণ্ডা লেগেছে।"

"কেন ?"

"তোমার গলার স্বর একটু ভারি ভারি মনে হচ্ছিল, মুখও দেখছি একটু যেন ভারি।"

মালতী বললে, "সারারাত যা ঝড়ঝাপটা খেতে হয়েছে, ঠাণ্ডা লাগা আশ্চর্য নয়।"

বললাম, "এখনো ঠাণ্ডা লাগছে। আর বেশি লাগলে জ্বর হ'য়ে পড়বে। তোমার ও-জামা গরম কাপড়ের হ'লেও, সৌন্দর্য যতটা বাড়িয়েছে গরম ততটা বাড়ায় নি।" উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, "নাও, উঠে দাঁড়াও ত দেখি।"

হাসিমুখে উঠে দাঁড়িয়ে মালতী বললে, "কেন, কি হবে ?"

আমার দেহ থেকে চেস্টারফিল্ড্‌টা খুলে ফেলে মালতীর পেছন দিকে গিয়ে বললাম, "হাত দুটো পেছিয়ে দাও।"

পিছন ফিরে তাকিয়ে সহাস্যমুখে মালতী বললে, "কি বিপদ! ঐ পুরুষের চেস্টারফিল্ড্‌ আমার অঙ্গে চাপাবে না-কি ?"

বললাম, "পুরুষের বটে, কিন্তু পরপুরুষের নয়; তোমার নিজের পুরুষেরই।"

মালতী বললে, "কিন্তু আমাকে গরম করতে গিয়ে নিজে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে যে ?"

উত্তর দিলাম, "লেখাপড়া শিখে তোমার বিদ্যে হয়েছে মালতী, কিন্তু

বুদ্ধি হয় নি। আমার চেস্টার্‌ফিল্ড্‌ তোমার দেহে উঠলে আমার দেহ যে আপনাআপনি গরম হ'তে থাকবে, এ কথাও কি তোমাকে বুঝিয়ে বলবার দরকার আছে ?"

শেষ পর্যন্ত মালতীকে চেস্টার্‌ফিল্ড্‌ পরতেই হ'ল।

গাড়ি ছেড়ে দিলে। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের কামরায় আর কেউ উঠল না। কথায় কথায় একবার মালতীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "একটা কথা বলব মালতী ? কথাটা জানবার জন্যে মনে কৌতূহলের সীমা নেই।"

মালতী বললে, "কি কথা ?"

"আচ্ছা, ঠিক কোন্‌ মুহূর্তে আমার প্রতি তোমার ভালবাসার উদ্রেক হয়েছিল বল ত ?—যখন তোমার দেহ রিক্‌শর দিকে বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন ?"

মাথা নেড়ে মালতী বললে, "না, তখন নয়। তখন ত উত্তেজনায় এমন অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম যে, সব-কিছু প্রবৃত্তিই স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল।"

"আচ্ছা, তা হ'লে যখন তোমাকে রিক্‌শয় চড়িয়ে টেনে নিয়ে চলেছিলাম, তখন কি ?"

মৃদু হেসে মালতী বললে, "তখন মনের মধ্যে একটা প্রবল কৃতজ্ঞতা দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল।"

"তা হ'লে কি, যখন জানতে পেরেছিলে আমি অবিবাহিত, তখন ?"

"তখন একটা সম্ভাবনার আনন্দে উল্লসিত হ'য়ে উঠেছিলাম।"

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, "তখনো সম্ভাবনার আনন্দে! আশ্চর্য সাবধানী আর সতর্ক তোমার প্রেম ত! আচ্ছা, তা হ'লে সে প্রেম জাগল কখন্‌ শুনি ?"

মৃদুকণ্ঠে মালতী বললে, "কাশীতে স্থির শান্ত অবস্থায় যখন নিবিড়ভাবে তোমাকে অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম, তখন।"

শুনে মনের মধ্যে একটু বেদনা বোধ করলাম। তা হ'লে দেওঘরে মালতী আমার প্রতি যে মনোবৃত্তি দেখিয়েছিল, তার মধ্যে প্রেমের জাদুস্পর্শ ছিল না! বললাম, "আমার প্রেম কিন্তু তোমার প্রেমের মতো সাবধানী হিসেবী প্রেম নয় মালতী। আমার প্রেম অন্ধ, বধির, অবুঝ, উদ্দাম। কখন সে প্রেম তোমার প্রতি জাগ্রত হয়েছিল, জান ?"

জানবার সময় পাওয়া গেল না। জশিডি থেকে দেওঘর আধ ঘণ্টারও পথ নয়, গাড়ি প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে চেস্টার্‌ফিল্ডের বোতাম খুলতে খুলতে মালতী বললে, "নাও, তোমার কোট প'রে নাও।"

বাধা দিয়ে বললাম, "তোমার এ অপরূপ বেশ ঠাকুমাকে দেখিয়ে খুশি করতে হবে। কে তোমাকে ভিড়ের মধ্যে লক্ষ্য করবে মালতী? লক্ষ্মীটি, কোটটা প'রেই চল।"

ওদের বাসায় পৌঁছে মালতীর পিতামহী প্রতিভাময়ীর কক্ষের দ্বারে উপস্থিত হ'য়ে বললাম, "আসতে পারি ঠাকুমা? মালতীকে নিয়ে এসেছি।"

প্রতিভাময়ী তখনও লেপের মধ্যে ছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বললেন, "এস ভাই, এস। কাল রাত্রের দুর্‌যুগ দেখে মনে করতে পারি নি তুমি জশিডি গিয়ে উঠতে পারবে।" মালতী প্রণাম করলে তার চিবুক স্পর্শ ক'রে বললেন, "চমৎকার দেখাচ্ছে মালতী! এ কোট কবে করালি?"

মালতী ও আমি উভয়েই হেসে উঠলাম। মালতী বললে, "এ কোট আমার নয় ঠাকুমা।"

"তবে?"

আমাকে দেখিয়ে আরক্তমুখে বললে, "ওঁর।"

সহাস্যমুখে প্রতিভাময়ী বললেন, "নাতজামাইয়ের?" তারপর আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "তোমার জিনিস, তুমি যেমন ইচ্ছে সাজাবে-পরাবে, তাই দেখেই আমাদের আনন্দ।" একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, "যাও, তোমরা মুখ-হাত ধুয়ে চা খাও। মন্নুয়ার মা সব ঠিক ক'রে রেখেছে।"

প্রতিভাময়ীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মালতী বললে, "এবার তোমার কোট নাও।" ব'লে নিজের দেহ থেকে খুলে নিয়ে পিছন দিকে গিয়ে আমাকে পরিয়ে দিলে।

বললাম, "সুদ শুদ্ধু ফিরে পেলাম মালতী। আসলের চেয়ে সুদ কিন্তু বেশি মিষ্টি লাগছে।"

সকৌতূহলে মালতী জিজ্ঞাসা করলে, "সুদ কি?"

"তোমার দেহের উত্তাপ। আমার কোটের কল্যাণে তোমার দেহের অনেকখানি উত্তাপ আমার দেহে প্রবেশ লাভ করল।"

মালতী হাসতে লাগল।

বললাম, "আমাদের এখনো মালা-বদল হয় নি, কিন্তু কোট-বদল হ'য়ে গেল মালতী। আধুনিক মতে এও হয়ত এক রকমের একটা বিয়ে।" ব'লে হাসতে লাগলাম।

একটু চুপ ক'রে থেকে মালতী বললে, "মালা-বদল আমাদের হয় নি, কিন্তু তোমার গলায় মালা দেওয়া আমার হয়েছে।"

সবিস্ময়ে বললাম, "কোথায় মালতী? সেই তোমার কাশীতে না-কি?"

মালতী হেসে ফেললে; বললে, "হ্যাঁ, কাশীতেই। তোমার গলার কথা ভেবে গাঁথা মালা আমি বিশ্বেশ্বরের পায়ে দিয়ে এসেছি।"

বললাম, "বেশ কথা, তোমার গলার জন্যে গাঁথা মালা আমিও না হয় একদিন বৈদ্যনাথের পায়ে দিয়ে আসব।"

চা-খাবার খেয়ে ঘণ্টাখানেক পরে বিদায় নিলাম। যাবার সময়ে মালতীকে ব'লে গেলাম, "তিনটের সময়ে আসব। তৈরি থেকো। একটা রিকৃশ নিয়ে যতদূরে যত নির্জন স্থানে সম্ভব পাড়ি দিতে হবে।"

উল্লসিত মুখে মালতী বললে, "তৈরি থাকব।"

৫

মালতী-চর্চায় আটটা দিন একটা অখণ্ড স্বপ্নের মতো কেটে গিয়েছে। প্রণয়-প্রতিযোগিতায় মালতীর কাছে আমি পরাভূত। আমি যদি তাকে দিয়েছি দেহ, সে আমাকে দিয়েছে মন; আমি যদি দিয়েছি মন, সে দিয়েছে আত্মা। বুঝতে আমার একটুও বাকি নেই, নিঃশেষে আমার কাছে সে নিজেকে দান করেছে। তার আত্মসমর্পণের প্রগাঢ়তা দেখে আমি মনে মনে চঞ্চল হ'য়ে উঠি। সেই প্রগাঢ়তার অতল দেশে কোন্ দুর্জ্ঞেয়তা আত্মগোপন ক'রে আছে কে জানে, হঠাৎ কখন আবির্ভূত হ'য়ে মহা অনর্থের সৃষ্টি করবে!

আজ সকালে মালতী আমাকে ডেকেছে। বলেছে, আজ আমাকে এক অদ্ভুত কথা শোনাবে। কি কথা, তার কোনো আন্দাজ দেয় নি;

তার মুখের দিকে চেয়ে আমারও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয় নি। অশরীরী প্রেতাত্মার মতো সেই অজানা কথা সমস্ত রাত্রি আমাকে নিদ্রা ও নিদ্রাহীনতার মধ্যে ভয় দেখিয়েছে।

মুখ হাত ধুয়ে চায়ের আয়োজনে ব'সে শুধু এক পেয়ালা চা পান ক'রে উঠে পড়লাম।

তিলোকি কাছে দাঁড়িয়ে ছিল, ব্যস্ত হ'য়ে বললে, "সে কি দাদাবাবু, আর কিছু খাবেন না?"

বললাম, "না তিলোকি, আজ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। এ সব তোমার ছেলেদের দিয়ো।"

"যাচ্ছেন ত কস্টারটাউন?"

"হ্যাঁ।"

"মালতী দিদিমণি আজ আপনার সঙ্গে আসবেন?"

"বোধ হয় না।"

"দুটো ডিম-সিদ্ধ খেয়ে যান।"

"না তিলোকি।"

"তা হ'লে এক পেয়ালা ওভল্‌টিন ক'রে দিই?"

"তা-ও না।"

মালতীর বাড়ি পৌঁছে দেখি, কম্পাউণ্ডে পলাশগাছতলায় একটা চেয়ারে মালতী ব'সে আছে। সামনে আরও দুখানা চেয়ার, মাঝখানে একটা ছোট গোল টেবিল। আমি নিকটে যেতেই মালতী দাঁড়িয়ে উঠে বললে, "এস।" মুখ তার আরক্তচকিত।

উভয়ে উপবেশন করলে মালতী বললে, "একটু চা দিতে বলি?"

বললাম, "না, দরকার নেই, খেয়ে এসেছি।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বললাম, "কী তোমার অদ্ভুত কথা বল।"

আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে মালতী বললে, "আমার অদ্ভুত কথা, আমি মালতী নই, মল্লিকা।"

বিস্মিত হ'য়ে বললাম, "তার মানে?"

"তার মানে, সেদিন দেওঘরের গাড়িতে তুমি ঠিকই ধরেছিলে। মালতীর চেয়ে আমার মুখ এমনিই একটু ভারি,—ঠাণ্ডায় ভারি হয় নি।"

এক মুহূর্ত বিস্মিত হ'য়ে থেকে বললাম, "এ সব তুমি নিশ্চয়ই সত্যি কথা বলছ না মালতী ?"

"নিশ্চয় বলছি। মল্লিকা আর পরিহাস ক'রেও তোমার সঙ্গে অসত্য কথা বলবে না। আমি সত্যিই মালতী নই। এই যে আর একখানা চেয়ার রয়েছে, এতে মালতী এসে বসবে। আজ সকালের গাড়িতে কাশী থেকে সে এসেছে।"

"মালতী কে ?"

"মালতী আমার যমজ বোন,—আমার চেয়ে দশ মিনিটের বড়।"

"দস্যুর হাত থেকে আমি উদ্ধার করেছিলাম তা হ'লে কাকে ?"

"মালতীকে ; আমাকে নয়।"

মাথার মধ্যে দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠল। কঠোর স্বরে বললাম, "তবে কাশী থেকে মালতী না এসে তুমি এলে কেন ?"

মল্লিকা বললে, "মালতী এলে তোমাকে পাওয়া যেত না ; মালতী দু বৎসর হ'ল অপরের কাছে বাগ্‌দত্তা।"

একটা মর্মান্তিক আঘাত পেলাম। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললাম, "নাই পেতে তা হ'লে আমাকে। আমাকে পাবার জন্যে দিন আষ্টেকের এ কপট প্রেমাভিনয় করবার কি প্রয়োজন ছিল ? প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিভূ পাঠানো কি চলে ?"

মল্লিকা বললে, "আমি মালতীর প্রতিভূ হ'য়ে আসি নি, আমি এসেছি নিজে থেকে তোমাকে ভালবেসে। আমার দারুণ ভয়, এ কথাটা হয়ত আমি তোমাকে ঠিক বোঝাতে পারব না। এক সময়ে এক মাতৃগর্ভে একই প্রাণরসে পুষ্ট আমি আর মালতী। তুমি যদি সাধারণ সহোদরা বোনের কল্পনা দিয়ে আমাদের দুজনের মানসিকতাকে বিচার কর, তা হ'লে অবিচার করবে। আমি যখন মালতীর মুখে আনুপূর্বিক সমস্ত কাহিনী শুনলাম, তখন বাগ্‌দত্তা না হ'লে তোমার প্রতি মালতীর যে প্রেম নিশ্চয়ই সঞ্চারিত হ'ত, সেই প্রেম আমার মধ্যে সঞ্চারিত হ'ল। যে ভাবে তোমাকে পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'ল না, তার নিকটতম ভাবে তোমাকে পাবার জন্যে মনে-মনে প্রস্তুত হওয়ার পর আমি দেওঘরে ছুটে এসেছিলাম। আর তাই জশিডি স্টেশনে তোমাকে সর্বপ্রথম দেখে

তোমার দু হাত ধ'রে তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। মনে ক'রো না শুধু আমার দেহই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, আমার মনও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।"

বললাম, "তুমি মালতী নাম ধারণ ক'রে এ কয়দিন কপট অভিনয় করলে কেন?"

মল্লিকার মুখে ক্ষীণ হাস্য ফুটে উঠল; বললে, "যার জন্যে চুরি করলাম সেই বলে চোর! তুমি জশিডি স্টেশনে আমাকে মালতী ব'লে সম্বোধন করেছিলে কেন? আমি ত মালতী নই।"

"ভুল ক'রে করেছিলাম।"

"ধর, আমিও ভুল ক'রে সেই নাম বজায় রেখেছিলাম; কিন্তু তার জন্যে এমন কিছু অন্যায় হয়েছে কি?"

বললাম, "নিশ্চয়ই হয়েছে, তোমার সেই মালতী নাম ধারণের কপটতার দোষে মল্লিকা কিছুই পায় নি আমার কাছ থেকে। যদি কেউ পেয়ে থাকে, পেয়েছিল মালতী।"

মল্লিকা বললে, "ও। 'নামমাত্র' ব'লে একটা কথা আছে জান? মালতী নাম ধারণ করার জন্যে আমার যদি কিছু কপটতা হ'য়ে থাকে সে নামমাত্র কপটতা। এই নামমাত্র কপটতার জন্যে আমি যদি তোমার কাছ থেকে কিছুই না পেয়ে থাকি, আর মালতী অপরের বাগ্‌দত্তা স্ত্রীলোক জেনেও তোমার মনে এখনও যদি তার প্রতি প্রেম লেগে থাকা অবৈধ মনে না কর, তা হ'লে এ কথার এখানেই শেষ। তুমি সহৃদয় মানুষ, তোমার বুদ্ধি আছে, বিচার আছে,—সব দিক বিবেচনা ক'রে তোমার শেষ মীমাংসা আমাকে জানিও। এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করবার জন্যেই ব্যস্ত হ'য়ে চিঠি লিখে মালতীকে আমি কাশী থেকে আনিয়েছি। একটা কথা তোমাকে জানাই, এ নিয়ে তোমার কাছে আমি কান্নাকাটি অথবা করুণাভিক্ষা কিছুই করছি নে। আর একটা কথা, শুনলাম মল্লিকা তোমার কাছ থেকে কিছু পায় নি, কিন্তু মল্লিকার কাছ থেকে তুমি যা পেয়েছ তার পরিমাণ জানাবার সাধ্য আমার নেই।" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "মালতীর সঙ্গে দেখা করবে নিশ্চয়ই?"

বললাম, "দয়া ক'রে তিনি যদি দেখা দেন।"

"আচ্ছা, তাকে ডেকে দিচ্ছি।" ব'লে মল্লিকা উঠে দাঁড়াল।

বললাম, "তুমি একটু ব'স না এখানে ; তাকে ডাকিয়ে পাঠাও।"

মল্লিকার মুখে মৃদুহাস্য দেখা দিলে, চেয়ারে ব'সে প'ড়ে বললে, "এখনো সন্দেহ!" চাবির রিঙে একটা হুইস্‌ল্‌ ছিল, সেটা বাজালে।

পর-মুহূর্তে বারান্দায় মালতীকে দেখা গেল। সে এসে ধীরে ধীরে চেয়ার অধিকার ক'রে বসল। মুখে তার অপরিসীম আশঙ্কার ছায়া।

বললাম, "তোমার কাছে কি এমন অপরাধ করেছিলাম মালতী যে, এমন ক'রে আমাকে দণ্ডিত করলে?"

মালতী কোনো উত্তর দেবার আগেই মল্লিকা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আমি তা হ'লে চললাম মালতী, এখানে আমার আর কোনো কথা বলবার অথবা শোনবার নেই।"

এর পর বহুক্ষণ ধ'রে মালতীর সঙ্গে যুক্তির দিক দিয়ে, নীতির দিক দিয়ে, বিবেচনার দিক দিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক হ'ল। মালতী কিন্তু আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারলে না। বললাম, "তুমি যে বাগ্‌দত্তা, সে কথা প্রথমেই আমাকে জানিয়ে দাও নি কেন? তা হ'লে কোথায় থাকত মল্লিকা, আর কোথায় বা থাকত মালতী? একই অপক্ষপাতের সঙ্গে দুজনকে পিছনে ফেলে রেখে হালকা মন নিয়ে ফিরে যেতাম কলকাতায়।"

কাতর কণ্ঠে মালতী বললে, "ঠিক সেই জন্যেই জানাই নি অজয়, তোমাকে একেবারে হারাতে আমি কিছুতেই প্রস্তুত ছিলাম না।"

বললাম, "মল্লিকাকে একবার ডেকে দেবে?"

মালতী প্রস্থান ক'রে মল্লিকাকে পাঠিয়ে দিলে। মল্লিকা এসে ধীরে ধীরে একটা চেয়ার গ্রহণ ক'রে বসল। তাকে বললাম, "মালতী দেওঘর ছেড়ে যাবার পূর্ব-মুহূর্তে তাকে বলেছিলাম—এ জীবনে হয় তুমি, নয় আর কেউ নয়। এ কথার প্রথমাংশ যখন আর হ'তে পারে না, শেষ অংশটাই তখন কায়েম রইল।"

শান্ত কণ্ঠে মল্লিকা বললে, "অর্থাৎ, আর কেউ তোমার নয়?"

"হ্যাঁ।"

ঘাড় নেড়ে "আচ্ছা" ব'লে মল্লিকা উঠে দাঁড়াল।

বললাম, "আজ বেলা দেড়টার ট্রেনে আমি কলকাতা রওয়ানা হব।

পিছনে প'ড়ে থাকবে আমার জীবনের দুই সমস্যা—মালতী আর মল্লিকা।"

তেমনি সহজভাবে ঘাড় নেড়ে মল্লিকা বললে, "আচ্ছা।"

৬

বাসায় ফিরে তিলোকিকে বললাম, "তিলোকি, আজ আমি দেড়টার এক্সপ্রেসে কলকাতায় যাব।"

বিস্মিত হ'য়ে তিলোকি বললে, "এত শীগগির চ'লে যাচ্ছেন দাদাবাবু?"

সংক্ষেপে বললাম, "বিশেষ দরকার।"

দেড়টায় সময় জশিডিতে এক্সপ্রেসে উঠে বসেছি, হঠাৎ কানে এল, 'আমি মল্লিকা।'

তাকিয়ে দেখি প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে মল্লিকা,—মুখে তার এক ধরণের অপরূপ মিষ্ট হাসি। বললাম, "আবার আপনি কষ্ট ক'রে এলেন কেন?"

মল্লিকা বললে, "অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, শুধু একটা কথা জানাতে।"

"কি কথা?"

"আপনি যেমন মালতীকে জানিয়েছিলেন তেমনি আপনাকেও জানিয়ে যেতে এসেছি। এ জীবনে হয় আপনি, নয় আর কেউ নয়। কিন্তু প্রার্থনা কিছু নেই।"

এক্সপ্রেস চলতে আরম্ভ করল। আমি মল্লিকার দিকে চেয়ে রইলাম। মল্লিকা কিন্তু পিছন ফিরে বাইরে যাবার পথের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল।

এক্সপ্রেসের গতিবৃদ্ধির সঙ্গে আমার মনের গতিও সমান ভাবে বেড়ে চলল। চিরদিন আমি জশিডি থেকে মধুপুরের পথের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্য দু চোখ দিয়ে পান করি। আজও জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম, কিন্তু আজ চিন্তার সঙ্গে জড়িত হ'য়ে বাইরের সেই দৃশ্যরাজি এক হ'য়ে মিশে যেতে লাগল; তার মধ্যে মাঝে মাঝে যেন ফুটে ওঠে মল্লিকার মুখ।

আচ্ছা, আজকের মল্লিকার মুখ আরো যেন ফোলা-ফোলা মনে হচ্ছে? সে বলেছিল, কান্নাকাটি করবে না, পরে করে নি ত? স্টেশনে তার মুখে হাসিই ত দেখেছিলাম, কিন্তু সে কি বৃষ্টির পর রৌদ্রের ক্ষীণ করুণ হাসি? গভীর চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হলাম।

মধুপুরের পথ কখন্ ফুরিয়েছে, কখন্ মধুপুর স্টেশনে এসে গাড়ি দাঁড়িয়েছে কিছুই খেয়াল করি নি; খেয়াল হ'ল গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দে। তাড়াতাড়ি স্যুটকেস আর বেডিং দোরের সামনে রেখে দোর খুলে প্ল্যাটফর্মের এক কুলিকে বললাম, "শীগগির নাবা।"

মাথায় জিনিস চড়িয়ে কুলি জিজ্ঞেস করলে, "কোথায় যাবেন বাবু, ঘোড়ার গাড়িতে ত?"

বললাম, "না, ঘোড়ার গাড়িতে নয়। পশ্চিম যাবার ওদিকের প্ল্যাটফর্মে।"

সারদা মাতাল

১

সারদা মাতাল আমার বাল্যবন্ধু।

শুধু বাল্যবন্ধুই নয়, আমরা উভয়ে এক গ্রামের অধিবাসী। ই. আই. রেলের উত্তরগামী লুপ লাইন যে স্থলে অজয় নদ অতিক্রম করতে উদ্যত হয়েছে, তার অব্যবহিত পূর্বদিকে নদীর উপকূলে আজকাল যে পাঁচ-সাত ঘর ভগ্ন ও অর্ধভগ্ন কোঠা বাড়ির সমষ্টিরূপে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যায়, তথায় সুদূর অতীতকালে আমাদের বন্ধুত্বের সূত্রপাত।

গ্রাম নগণ্য। যে সময়ের কথা বলছি তখন সেখানে, স্কুল ত দূরের কথা, একটা চলনসই পাঠশালা পর্যন্ত ছিল না। আমাদের পাঠগ্রহণ চলত গৃহে সকাল-সন্ধ্যায় অভিভাবকদের নিকট যৎ-সামান্যর তালে; এবং গৃহের বাইরে সারাদিন অজয়ের তীরে তীরে বনে-জঙ্গলে প্রকৃতির পাঠশালায় আড়াঠেকার বেয়াড়া ছন্দে। এরূপ শিক্ষার দ্বারা মানুষ হওয়া যায় যতটা, পুরুষ মানুষ ততটা হওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের

বংশের ও গ্রামের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী সারদা এবং আমি বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্যে অল্প বয়সেই বর্ধমান শহরের একটি গৃহে বাসা বাঁধলাম।

বাসা আমাদের জন্য নতুন ক'রে বাঁধতে হয় নি। বহুদিন থেকে এই বাসাটি আমাদের এবং আমাদের আশপাশের দু-তিনখানা গ্রামের অধিবাসীদের জন্য বাঁধা আছে। স্কুল-কলেজের ছাত্র থেকে আরম্ভ ক'রে আপিসের কেরানী, মামলা-মকদ্দমাকারীর দল, বিবাহ-উপনয়নের বাজারকর্তা পর্যন্ত যার যখন এবং যেমন প্রয়োজন এ বাসায় এসে আশ্রয় নেয়; তার পর প্রয়োজন শেষ হ'লে প্রস্থান করে। এণ্ট্রান্স পাস ক'রে ফার্স্ট আর্টস পড়তে পড়তে একদিন সারদার এ বাসার প্রয়োজন শেষ হ'ল। এক সঙ্গে রেলকর্মচারী-দুহিতা আর রেলের চাকরি লাভ ক'রে বাসা ছেড়ে সে চ'লে গেল।

২

বছর পনের পরের কথা। আমি তখন পাটনার দেওয়ানি আদালতে ওকালতি করি। বছর দশেকে পসার একরকম জমিয়ে নিয়েছি।

কোর্ট থেকে ফিরে মুখ হাত ধুয়ে সবে মাত্র জলযোগে বসেছি, এমন সময়ে বাইরে ডাকাত-পড়া-পড়ি চিৎকার, "কিষ্টো! কিষ্টো! কিষ্টোরাম আছিস না-কি রে?"

চকিত হ'য়ে উঠলাম! 'কিষ্টোরাম আছিস না-কি রে' ব'লে পাটনা শহরে আমাকে কে ডাকে! মক্কেলরা কিষণরামবাবু ব'লে ডাকে, বাঙালীরা ডাকে কৃষ্ণরামবাবু, বড় জোর কেষ্টোরামবাবু ব'লে। কিষ্টোরাম ত মথুরার ডাক নয়, এ যে একেবারে ব্রজের ডাক! কণ্ঠস্বরও যেন পরিচিত মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠাহর করতে পারছি নে ঠিক। 'যাই' ব'লে উচ্চৈঃস্বরে সাড়া দিয়ে খাদ্যদ্রব্য অভুক্ত রেখে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

গৃহিণী ছিলেন কাছেই; ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন, "ও কি? উঠছ কেন? অসময়ে কে এসে হাজির হ'ল, কতক্ষণ জ্বালাবে, খেয়ে তারপর যেয়ো।"

বললাম, "ক্ষেপেছ! কোন্ এক ব্রজের বালক এসে ডাক দিয়েছে, কিষ্টোরাম কখনো নিশ্চিন্তি হ'য়ে খেতে পারে?"

মুচকি হেসে গৃহিণী বললেন, "নামটা তা হ'লে পছন্দ হয়েছে দেখছি।"

"খুব বেশি রকম পছন্দ হয়েছে।" ব'লে দ্রুতপদে প্রস্থান করলাম।

বাইরে এসে দেখি, সারদা। তার আকৃতি দেখে বিস্মিত হলাম। ছেলেবেলায় সারদা ছিল কৃশ ও দীর্ঘ। পরিহাস ক'রে আমরা ছেলেবেলায় তাকে GL, অর্থাৎ Geometrical Line বলতাম। সেই অতিদীর্ঘতায় কেমন ক'রে, কোথা থেকে একরাশ মাংসের আমদানি হ'য়ে এখন সে হ'য়ে উঠেছে দশাসই। নিকষকৃষ্ণ দেহের শীর্ষদেশে ভ্রমরকৃষ্ণ হাফ বাবরি চুল। পান খেয়েছে বোধকরি একসঙ্গে তিন-চার খিলি, মুখের দুই কশ বেয়ে পিকের দরানি নেমেছে লাল রঙের।

হিসাবমতো সারদাকে না চিনতে পারাই উচিত ছিল, যদি না তার অদ্ভুত উজ্জ্বল জ্বলজ্বলে চোখ জোড়া তাকে সনাক্ত করিয়ে দিত।

সবিস্ময়ে বললাম, "এ কি, হঠাৎ সারদা কোথা থেকে রে!"

অট্টহাস্য ক'রে উঠে সারদা বললে, "অবাক হচ্ছিস বটে? জামালপুর থেকে এক লাফ মেরে তোর মাথা ডিঙিয়ে একেবারে দানাপুরে এসে বসেছি।"

"বদলি হ'য়ে এসেছিস?"

কুঞ্চিত চক্ষে স্মিত মুখে সারদা মাথা নাড়লে।

"তা এতদিন আসিস নি কেন?"

নিমেষের মধ্যে সারদার কুঞ্চিত চক্ষু গোল-গোল হ'য়ে উঠল, "ওই! কেমন বেকুবের মতো কথা বলে দেখ!" ডান হাতের পঞ্চাঙ্গুলি আমার দিকে স্থাপিত ক'রে বললে, "পাঁচ দিন সবে এসেছি; তার মধ্যে চার দিন গেল সংসার পাততে; পাঁচমা দিনে আপিস কামাই ক'রে তোর কাছে হাজির হয়েছি;—আর বলছিস কি-না এতদিন আসিস নি কেন?"

বললাম, "তা হ'লে ঠিক আছে। ব'স্ সারদা, ব'স্।"

দুখানা চেয়ার নিয়ে দুজনে মুখোমুখি উপবেশন করলাম।

সারদা বললে, "পাটনায় এসে তুই কিন্তু একদম গোরু ব'নে গেছিস কিষ্টোরাম।"

হাসিমুখে বললাম, "কেন রে? আমাকে গোরু খোঁজা করতে হয়েছিল না-কি?"

সারদা ফুঁসিয়ে উঠল, "উওহ্! সে কথা আর বলিস কেন? যাকে তোর ঠিকানা শুধাই সে-ই মাথা নাড়ে, বলে—জানি নে। শেষকালে

বুদ্ধি ক'রে আদালতে গিয়ে বার লাইব্রেরির কেরানীর কাছ থেকে তোর ঠিকানা নিই। তারপর খুশি হ'য়ে আত্মারামকে সওয়া তেরো আনার সিন্নি চড়িয়ে তোর কাছে হাজির হয়েছি।" ব'লে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

বললাম, "তা বুঝেছি আত্মারামের মুখ থেকে এখনো সিন্নির গন্ধ ছাড়ছে।"

সারদার মুখে নিঃশব্দ হাস্য উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল; বললে, "খোসবায় পাচ্ছিস না-কি? তবুও তোর ভয়ে একরাশ জর্দা দিয়ে খিলি চারেক পান চিবুতে চিবুতে এসেছি। কিন্তু শাক দিয়ে কি মাছের গন্ধ ঢাকা চলে রে ভাই? বদ্‌বু ছাপিয়ে খুসবু বেরোবেই।" ব'লে পুনরায় উচ্চ হাস্য ক'রে উঠল।

বললাম, "মদ ধরলি কবে?"

বিস্ময়ে সারদার চক্ষু কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল; বললে, "এই দেখো আহাম্মুকের মতো কথা বলে! ছাড়বার সময় হ'ল, আর বলে কি না— মদ ধরলি কবে? তুই ধরেছিস?"

অনুশোচনার আর্তকণ্ঠে বললাম, "না ভাই, এ পর্যন্ত ধ'রে উঠতে পারি নি। আমাদের পয়সায় ধানের ব্যবস্থা উচিত মতো হ'তে পারে না, তা আবার ধান্যেশ্বরী! তোর মতো তো আর রেলের কাঁচা পয়সা নয়!"

সন্তোষসূচক ঘাড় নেড়ে সারদা বললে, "সে কথা মিছে বলিস নি। মালবাবু হ'য়ে কাঁটার পাশে বসতে পারলে দিনান্তে দশ টাকা গালাগাল কিষ্টোরাম, গালাগাল! মাস কাবারে মাইনেটা ঠেকে উপরির মতো।" ব'লে হা-হা ক'রে হাসতে লাগল।

সারাদিন আদালতে চেঁচামেচি ক'রে ক্ষুধার্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরে খেতে বসব, এমন সময়ে অকস্মাৎ সারদার আবির্ভাব। পেটের মধ্যে দুর্বিনীত ক্ষুধা অসম্ভব রকম দাপাদাপি লাগিয়েছে। এর একমাত্র প্রতিকার সারদাকে সরিক ক'রে কিছু খেয়ে নেওয়া। বললাম, "সারদা, কি খাবি বল্?"

সারদা বললে, "চাট।"

বিস্মিত হ'য়ে বললাম, "চাট? চাট আবার একটা খাবার না-কি?"

সারদা বললে, "এ অবস্থায় ওর চেয়ে ভাল খাবার আর নেই রে ভাই কিষ্টো। ঘোড়া খায় চানা, আর মাতাল খায় চানাচুর।" তারপর কতকটা সুর সংযোগে আবৃত্তি লাগালে,—

"চানাচুর ঘুগনিদানা
নেই তো ঘরে কিনে আনা!
দু-চার আনার কিনে আনা।"

বুঝলাম সারদার নেশার বাতাস লেগেছে, খালি পেটে থাকলে হু-হু ক'রে বেড়ে উঠবে। তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে দুজনের জায়গা করালাম। সারদার পাতে চাট থেকে চাটনি কিছুরই অভাব দেখা গেল না। ডজন তিনেক লুচি এবং তদনুযায়ী আনুষঙ্গিকের সদ্ব্যবহার ক'রে বৈঠকখানায় ফিরে এসে চুরুট ধরালে; তারপর একটা বিকট আয়তনের ঢেঁকুর তুলে লাঠি বাগিয়ে ধ'রে ওঠবার উপক্রম করলে।

বললাম, "ওঠবার মতলব না-কি?"

সারদা বললে, "হ্যাঁ ভাই। একাওয়ালার সঙ্গে কড়ার আছে, রাত নটার মধ্যে দানাপুরে ফিরতে হবে।"

বিস্মিত হ'য়ে বললাম, "বরাবর এক্কা আছে না-কি সঙ্গে?"

"আছে বইকি। ঐ এক্কাওয়ালাই ত তোর বাসা খুঁজে বার করলে।"

"এখন বরাবর বাসায় ফিরবি ত?"

মাথা নেড়ে সারদা বললে, "বরাবর বাসাতেই ফিরব, তবে এক জায়গায় মিনিট দশেক বিলম্ব হবে। সওয়া তেরো আনার আর এক দফা সিন্নি চড়িয়ে নোব।"

"কেন, আত্মারাম এখনো ঠাণ্ডা হন নি না-কি?"

হেসে উঠে সারদা বললে, "বেকুবের মতো কথা শোন। আরে, আত্মারাম ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে ব'লেই ত আর এক দফা সিন্নি চড়িয়ে গরম ক'রে নিতে হবে। তবে না পুরো মৌজে বাসায় পৌঁছে আমার এই লাঠিতে আর কাদুর ঝাঁটায় লড়াই চলবে!"

"কাদু কে?"

"কাদু আমার স্ত্রী বটে। পুরো নাম কাদম্বিনী।"

বিস্মিত হ'য়ে বললাম, "তোর স্ত্রী তোর সঙ্গে ঝাঁটা নিয়ে লড়াই করে?"

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল সারদা, "করবে না ?—আলবাৎ করবে। মাল টেনে বাড়ি ঢুকে আমি তার চোদ্দ পুরুষকে উদ্ধার করব, আর সে ছেড়ে কথা কইবে ?"

"তবে আবার লাঠি নিয়ে লড়াই বাধাস কেন ?"

সারদার মুখে নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল। "ওটা বুঝলি নে ? লাঠি দিয়ে ভয় দেখাই, আর ঝাঁটা থেকে দেহ রক্ষে করি। তবে মৌকা মাফিক এক-আধ ঘা বসিয়েও যে দেই নি তা নয়।" তারপর জিভ কেটে মাথা নেড়ে বললে, "কিন্তু তাই ব'লে জোরে নয়, আস্তে। আঁটকুড়ীর বেটীকে ভালও বাসি কিষ্টোরাম।" হঠাৎ তার কণ্ঠস্বর গদগদ হ'য়ে এল।

বললাম, "তুই আমাকে কথায় কথায় বেকুব বলছিস, তুইও ত কম বেকুব নোস।"

ভ্রূভঙ্গভরে সারদা বললে, "ক্যানে ?"

"তোর বউ আঁটকুড়ীর বেটী কেমন ক'রে হবে ?"

সদর্পে আমার প্রতি কঠোর দৃষ্টিপাত ক'রে সারদা বললে, "ক্যানে, ওর যে একটিও সন্তান হয় নি।"

"কিন্তু সে কারণে তোর শাশুড়ীকে আঁটকুড়ী বলছিস কেমন ক'রে ?"

সারদার মুখে-চক্ষে বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না ; তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে, "এই দেখ্, বেকুবের মতো শাশুড়ীকে এর মধ্যে টেনে আনে ! আমি কি এ পাপমুখে শাশুড়ীর নাম একবারও করেছি ?"

স্ত্রী আঁটকুড়ীর বেটী হ'লে শাশুড়ীর আঁটকুড়ী না হ'য়ে উপায় নেই, এই অতি-স্থূল যুক্তিটি উপস্থিত যে-ক'রেই হোক সারদার মস্তিষ্ক থেকে বিদায় গ্রহণ করেছে ; সুতরাং প্রসঙ্গ পরিবর্তিত ক'রে বললাম, "তোর বউয়ের আদৌ সন্তান হয় নি না-কি সারদা ?"

নিমেষের মধ্যে সারদার কঠোর মূর্তি মোলায়েম হ'য়ে গেল ; সন্তোষস্নিগ্ধ কণ্ঠে বললে, "আদৌ হয় নি কিষ্টো। আর কোনো গুণ না থাকুক, শালীর ঐ গুণটি আছে, আমাকে ঝরঝরে রেখেছে, ঝামেলায় ফেলে নি।" ব'লে হুড় হুড় ক'রে চেয়ার সরিয়ে উঠে পড়ল।

স্ত্রীকে শালী ব'লে উল্লেখ করলে খানিকটা অসঙ্গতির দোষ হয়,

সারদার মস্তিষ্কের বর্তমান অবস্থায় সে কথা উত্থাপন করতে সাহস করলাম না। 'শালীর বোন শালী না হ'য়ে শালা হবে না-কি' ব'লে হয়ত আমাকেই বেকুব বানিয়ে বসত।

রাজপথ পর্যন্ত সারদাকে এগিয়ে দিয়ে এলাম। সারদার এক্কা পথের ওপারে খোলা মাঠে অপেক্ষা করছিল।

৩

এর পর ছুটি-ছাটার দিনে সারদা মাঝে মাঝে আসতে লাগল। আমিও একদিন তার বাসায় গিয়ে বেড়িয়ে এলাম।

তখনকার দিনে বন্ধুপত্নীরা সাধারণত পর্দানশীনই ছিল। দ্বারান্তরাল থেকে দেহের, অথবা অবগুণ্ঠনের তলা থেকে মুখের, যেটুকু পরিচয় পাওয়া যেত, তারই উপর তাদের বিষয়ে ধারণা গ'ড়ে তুলতে হ'ত। সেই রকম ধারণার সাহায্যে সারদার স্ত্রী কাদম্বিনীকে দেখে আমার আকাশের কাদম্বিনীর মতোই মনে হয়েছিল; শুধু দেহের রঙের শ্যামলতাতেই নয়, অবগুণ্ঠনপ্রান্তবর্তী ওষ্ঠাধরের কচিৎ মৃদু স্ফুরণেও।

এরূপ স্ত্রীর উপর সারদার কতটা নেশা ছিল ঠিক বলতে পারি নে; কিন্তু মদ ছাড়া তার আর এক প্রবল নেশা ছিল দাবাখেলার। দাবা-খেলায় সে ছিল নিপুণ খেলোয়াড়; বিশেষত বোড়ের খেলা সে এমন সাংঘাতিক ভাবে খেলতে পারত যে, তার বোড়ের সম্মুখের কোণাকুণি জুটো ঘরে এসে প্রাণ হারাবার আশঙ্কায় প্রতিপক্ষের হাতী ঘোড়া বলগুলো সর্বদা সিঁটিয়ে থাকত। সে বলত, রাজাকে মাৎ করবার সর্বোত্তম মাৎ হচ্ছে বোড়ের চালে মাৎ।

দেখতে দেখতে দাবাখেলা জ'মে উঠল। প্রথমে সারদা আমাকে নিয়েই খেলতে বসত; তারপর একে একে অনেক খেলোয়াড় জুটতে লাগল। ছুটির দিনগুলো সারদা সাধ্যমতো বাদ দিত না। প্রথম দিকে খেলাটা আমার বৈঠকখানার পাশের ঘরেই বসত, কিন্তু ক্রমশ সারদার দাবাখেলার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়তে, দিকে দিকে তার ডাক পড়তে লাগল।

বৎসর দুই এই ভাবে চলার পর একদিন সারদা তার অফিসে এক অভাবনীয় কাণ্ড ক'রে বসল। পূর্বরাত্রে টানটা বোধ হয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় বেশি হ'য়ে গিয়েছিল, সে যখন অফিস যেতে উদ্যত হ'ল তখনও

সম্পূর্ণভাবে খোঁয়াড়ি ভাঙে নি,—শরীর ম্যাজম্যাজ করছে, মন অবসন্ন, শুয়ে পড়বার জন্য শয্যা অসম্ভব রকম আকর্ষণ করছে। এ অবস্থায় কাদম্বিনী অফিস কামাই করবার পরামর্শ দিলে। পরামর্শটা বোধহয় সুপরামর্শই ছিল, কিন্তু অফিসে সেদিন জরুরি কাজ আছে, কামাই করা সারদা সমীচীন মনে করলে না। খোঁয়াড়ি ভাঙবার জন্য সে নূতন ক'রে আর একটু মদ খেয়ে নিলে। কাদম্বিনীকে বললে, "কোনো চিন্তা নেই কাদু, ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যে ধাতস্থ হ'য়ে যাব।"

কিন্তু ঘণ্টা দুয়েকের অনেক পূর্বেই সঙ্কট দেখা দিলে। যে জরুরি কাজের জন্য অফিস যাওয়া, তাই হ'ল কাল। অফিসে পৌছবার মিনিট দশেকের মধ্যে ছোট সাহেব হ্যামিণ্টনের ঘরে ডাক পড়ল সেই জরুরি কাজের সম্পর্কে। হ্যামিণ্টন নূতন লোক, মুড়ি-মিছরির পার্থক্য জানে না; দেহ একটু দুর্বল, মেজাজ কিন্তু চতুর্গুণ কড়া। নূতন মদ্যের কল্যাণে সারদার মেজাজ তখন বেশ একটু রঙিলা হ'য়ে উঠেছে। একজন সহকর্মী বললে, "কোনো ছুতো ক'রে কিছুক্ষণের জন্য গা-ঢাকা দিন সারদাবাবু, এ অবস্থায় সাহেবের কাছে যাবেন না।"

সারদা বললে, "কেন, মদ খেয়েছি ব'লে? কিন্তু তার বাবার পয়সায় ত খাই নি। নিজের পয়সায় খেয়েছি। তবে অপরাধটা কোথায়?"

মস্তিষ্কের তরল অবস্থায় এই যুক্তিটা সারদার যথেষ্ট জোরালো ব'লে মনে হ'ল; এবং এর দ্বারা হ্যামিণ্টনের সন্তুষ্ট না হ'য়ে উপায়ান্তর থাকবে না—মনের মধ্যে এই প্রতীতি ভ'রে নিয়ে ফাইল হস্তে সে হ্যামিণ্টনের নিকট উপস্থিত হ'ল। মনে করলে যুক্তিটা তিক্ত অবস্থার জন্য ফেলে না রেখে আগেভাগেই সেরে ফেলা ভাল।

"স্যার!"

মুখ দিয়ে ভক্ ভক্ ক'রে নির্গত হচ্ছে দেশী মদের উৎকট দুর্গন্ধ।

হ্যামিণ্টন একটা ফাইলে নিমগ্ন ছিল; মুখ তুলে চেয়ে দেখে কঠোর স্বরে বললে, "তুমি মদ খেয়েছ?"

কুঞ্চিত চক্ষে শান্ত কণ্ঠে সারদা বললে, "ঠিক সেই কথাটাই বলতে যাচ্ছিলাম। খেয়েছি; কিন্তু নিজের পয়সায় খেয়েছি, তোমার বাপের পয়সায় খাই নি।" সারদা মনে করলে, সে মাত্র একটি সরল সত্যের উল্লেখ করছে।

চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে হ্যামিণ্টন চিৎকার ক'রে উঠল, "What! You dare say like that damn swine?"

ফাইলটা টেবিলে রেখে তেমনি শান্ত কণ্ঠে সারদা জবাব দিলে, "A swine does not drink wine, but a gentleman does."

মারমুখ হ'য়ে হ্যামিণ্টন এগিয়ে এল,—"Get out at once, or I kill you!'

কিন্তু হায়! হ্যামিণ্টন যদি তখন স্বপ্নেও জানত কোন্ কদর্য বিপদের মধ্যে এগিয়ে আসছে, তা হ'লে এগোনোর পরিবর্তে বোধহয় দু-চার হাত সে পেছিয়েই যেত। ঘুষি পাকিয়ে সে কাছে আসা মাত্র বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে দুই বাহু দিয়ে তাকে সাপটে জড়িয়ে ধ'রে সোহাগস্নিগ্ধ কণ্ঠে সারদা ব'লে উঠল, "You come to kill the swine, but the swine will kiss you darling."

মদের বিকট গন্ধ থেকে এবং তদপেক্ষা স্থূলতর বিপত্তি থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য মস্তক বারংবার যথাসম্ভব পশ্চাতে ও এ-পাশ ও-পাশ সরাতে হচ্ছিল ব'লে হ্যামিণ্টন নেশার দ্বারা পুষ্টতর সারদার স্বাভাবিক শক্তিকে পরাভূত করতে বাগ পাচ্ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে সে 'চাপরাসী, চাপরাসী' ব'লে চিৎকার করতে লাগল।

উত্তেজনাপূর্ণ কথাবার্তার আভাস পেয়ে চাপরাসীরা বারান্দা থেকেই বুঝেছিল, ভিতরে একটা বিতণ্ডা চলেছে। সাহেবের উৎকণ্ঠিত ডাক শুনে দ্রুতপদে ঘরের ভিতরে উপস্থিত হ'য়ে জন-দুই মিলে হ্যামিণ্টনের দেহ থেকে সারদাকে জোর ক'রে ছিনিয়ে নিলে।

ক্রোধে ও অপমানে হ্যামিণ্টনের মস্তিষ্ক টগবগ ক'রে ফুটছিল। সুযোগ পেয়ে সে উন্মত্ত ভাবে সারদাকে আক্রমণ ক'রে পেটে একটা ঘুষি বসিয়ে দিলে। আঘাতটা হ'ল গুরুতর। কোঁক ক'রে একটা শব্দ ক'রে সারদা মেঝের উপর নেতিয়ে পড়ল; তারপর একটু বাদে অল্প অল্প রক্তবমন আরম্ভ করলে।

চাপরাসীদের মধ্যে একজন ব'লে উঠল, "মর গিয়া সার্দাবাবু।" সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অফিস জুড়ে হল্লা উঠে গেল। হ্যামিণ্টনের উপরিওয়ালা চীফ এঞ্জিনিয়ার প্রেস্টন ঘটনাস্থলে ছুটে এলেন।

৪

তৃতীয় দিনে সারদা হাসপাতাল থেকে অফিসে এক মাস ছুটির দরখাস্ত আর চাকরিতে ইস্তফার চিঠি দিলে। তার তিন-চার দিন পরে দশ হাজার টাকার ড্যামেজ দাবি ক'রে সারদার পক্ষ থেকে হ্যামিণ্টনের নামে আমি রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠালাম।

উকিলের চিঠি পেয়ে হ্যামিণ্টন ব্যস্ত হ'য়ে প্রেস্টনের শরণাপন্ন হ'ল। প্রেস্টন সারদাকে নিজের গৃহে ডাকিয়ে পাঠিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার জন্যে আর ইস্তফার চিঠি প্রত্যাহার করবার জন্য অনুরোধ করলে। বললে, "হ্যামিণ্টনের অবশ্য অন্যায় হয়েছিল, কিন্তু প্রথম অপরাধ তুমিই করেছিলে। যাই হোক, হ্যামিণ্টন দুঃখিত, আর সে কথা তোমার কাছে প্রকাশ করতে রাজি।"

কাজের লোক ব'লে প্রেস্টন সারদাকে ভালবাসত, চাকরি না ছাড়বার জন্য সে তাকে চেপে ধরলে।

সারদা কিন্তু সম্মত হ'ল না। বললে, "মিস্টার হ্যামিণ্টনের আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করবার দরকার নেই; কিন্তু স্যার, চাকরি আর আমি করব না। আমার দুর্বল লিভারে চোট লেগেছে, ডাক্তার বিশেষ সাবধানে থাকতে বলেছে। যে-কোন মুহূর্তে স্রাব আরম্ভ হ'য়ে জীবন সংশয় হ'তে পারে। আমার প্রতি আপনার দয়া অসীম, মেডিক্যাল অজুহাতে আমার হাফ পেনশনের ব্যবস্থা করিয়ে দিন।"

অগত্যা সারদার পেনশন হ'য়ে গেল।

৫

পেনশন নিয়ে কিন্তু সারদা বিপদে পড়ল। নেশায় আর নিদ্রায় রাত এক রকম কেটে যায়, দিন কিন্তু কিছুতেই কাটতে চায় না। অফিসের সময় হ'লে বেলা দশটা থেকে গৃহ যেন কামড়াতে থাকে।

অবশেষে দাবাখেলার নেশার মধ্যে সে খুঁজে পেলে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের পথ। প্রত্যহ বেলা দশটার সময়ে যথারীতি আহার ক'রে দানাপুর থেকে বেরিয়ে প'ড়ে মুরাদপুরে আমার বাসায় উপস্থিত হয়। তখন আমার আদালতে যাবার সময়। সমস্ত দিন খবরের কাগজ আর

বই প'ড়ে কাটায়। বেলা চারটে থেকে এক-আধজন ক'রে দাবা-খেলোয়াড় আসতে থাকে; খেলা জ'মে ওঠে। সন্ধ্যার পর অবসর থাকলে আমিও মাঝে মাঝে এক-আধ দান বসি। তারপর রাত আটটা সাড়ে আটটার সময়ে সারদা দানাপুর ফিরে যায়।

এ ব্যবস্থায় কিন্তু জুৎ হয় না। একা ভাড়া আর অন্যান্য অসুবিধার মূল্য দিয়ে খেলার বহর ঠিক পোষায় না। অবশেষে মতলব ঠাউরে সারদা শ দেড়েক টাকা দিয়ে মায় ঘোড়া একটা একা কিনে ফেললে। রামলাল নামে পনের-ষোল বৎসর বয়সের তার এক ছোকরা চাকর ছিল। মাসিক এক টাকা বেতন-বৃদ্ধির দ্বারা উপরন্তু সে হ'ল একার চালক আর ঘোড়ার সইস।

এই নূতন সুযোগের ফলে পদ্ধতিটা একেবারে ঢেলে সাজা হ'ল। রাত চারটের সময়ে উঠে কাদম্বিনী ডাল ভাত আর তরকারি রেঁধে ফেলে, রামলাল বাজার থেকে দই মিষ্টি কিনে আনে; তারপর সাড়ে পাঁচটার পূর্বেই প্রভু-ভৃত্যে স্নানাহার সেরে বাঁকিপুরের পথে বেরিয়ে পড়ে। ঘোড়ার গলায় তিন সার সুরেলা ঘণ্টি বাঁধা। ঝুনঝুন ঝুনঝুন শব্দ করতে করতে সুদীর্ঘ পাঁচ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে বেলা সাড়ে ছটা পৌনে সাতটার সময়ে এসে পৌঁছয় বাঁকিপুরে।

সে সময়ে আমি মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত থাকি ব'লে সারদা আমার বাড়ি না এসে অপর কারও গৃহে উপস্থিত হয়। গৃহকর্তার সঙ্গে দেখা হ'লে হাসি-হাসি কাঁচুমাচু মুখে বলে, কি ভাই, এক দান হবে না-কি? গৃহকর্তা হয়ত বলে, না ভাই, কাজ আছে, এখন সুবিধা হবে না। ব্যস্ত হ'য়ে সারদা বলে, আচ্ছা আচ্ছা, থাক্ থাক্—আর একদিন হবে। কাউকে সে চটাতে চায় না। যে খদ্দের আজ হাতে এল না, আর একদিন আসতে পারে। ঝুনঝুন ঝুনঝুন শব্দ করতে করতে সারদা আর এক গৃহের উদ্দেশ্যে চলতে থাকে।

এই রকমে পাঁচ বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে একজন হয়ত বলে, আচ্ছা, এক দান না-হয় বসাই যাক। মহা খুশি হ'য়ে সারদা রামলালকে ইশারা করে। একটি শৌখিন নরম শতরঞ্জি এনে রামলাল ফরাসের উপর পাতে; তারপর নিয়ে আসে ছক্ দাবা বোড়ে, হান্টলি পামারের বিস্কুটের টিনে তামাক টিকে দেশলাই কলকে, এবং তার সঙ্গে কারুকার্যখচিত

একটা মোরাদাবাদী ফরসি। অদূরে মেঝের উপর ব'সে রামলাল তামাক সাজতে আরম্ভ করে। একমাত্র সময়টুকু ছাড়া গৃহকর্তার আর কোনো সামগ্রী ব্যবহার ক'রে সারদা কৃতজ্ঞতার ভার বাড়াতে রাজি নয়।

প্রাতঃকালীন খদ্দের দুষ্প্রাপ্য হ'লে সারদা আমার গৃহে এসে হাজির হয়। সেখানে তার এবং রামলালের সারাদিনের বিশ্রাম এবং নিদ্রার ব্যবস্থা। সে-সময়ে দানাপুরে কাদম্বিনীও নিদ্রা দিয়ে রাত্রির নির্যাতন এবং নিদ্রাভাবের জন্য প্রস্তুত হ'তে থাকে।

রাত্রি নটা পর্যন্ত আমার গৃহে দাবার আড্ডা জমিয়ে সারদা দানাপুরের জন্য উঠে পড়ে। মধ্যে এক জায়গায় সুরা দিয়ে নিজেকে উত্তপ্ত ক'রে নেয়; তারপর ঝুনঝুন ঝুনঝুন শব্দ করতে করতে পুনরায় দানাপুরের পথে অগ্রসর হয়। একার নিক্কণ শুনতে শুনতে মেজাজের মধ্যে সুরার সুর গমক মারতে থাকে। গৃহের সম্মুখে যখন পৌঁছয়, তখন দস্তুরমতো ধ্রুপদের বাঁট-দুন-চৌদুন আরম্ভ হ'য়ে গিয়েছে।

কড়া নাড়তে নাড়তে সারদা কাদম্বিনীকে বাপান্ত করতে থাকে, তারপর গৃহের মধ্যে প্রবেশ ক'রে মহরমের কায়দায় লাঠি ঘোরাতে আরম্ভ করে। মত্ত স্বামীকে বাগ মানিয়ে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়াতে কাদম্বিনীর বারোটা বেজে যায়। রাত সাড়ে তিনটায় আবার উঠতে হবে; নইলে রামলালকে দিয়ে দুটো উননে আঁচ তুলিয়ে চারটের সময়ে ডাল-ভাত চড়ানো যাবে না।

আকাশে চন্দ্র-সূর্যের উদয়াস্তের যে নিয়ম, দানাপুরে সারদা হালদারেরও ঠিক তাই। সকাল সাড়ে পাঁচটার সময়ে ঝুনঝুন ঝুনঝুন করতে করতে পূর্বদিকে গমন, আর রাত্রি সাড়ে দশটায় ঝুনঝুন ঝুনঝুন করতে করতে পশ্চিম প্রান্তে প্রত্যাবর্তন। এর শীত নেই, বর্ষা নেই, ব্যত্যয় নেই, ব্যতিক্রম নেই।

কিন্তু মাস ছয়েক পরে হঠাৎ এক সময়ে ব্যতিক্রম দেখা দিলে। উপর্যুপরি তিন দিন সারদার দেখা নেই। এ পর্যন্ত কোনোদিন যে-ব্যক্তি এক ঘণ্টা কামাই করে নি, তার এরূপ আচরণে খেলোয়াড়ের দল চঞ্চল হ'য়ে উঠল, আমি হলাম চিন্তিত। অসুখ-বিসুখ করল না ত তার! পরদিন ছুটি ছিল, ঠিক করলাম সকালে দানাপুর গিয়ে খবর নিয়ে আসব।

৬

পৌষ মাসের প্রখর শীতের রাত্রি তখনও নিঃশেষে শেষ হয় নি, বিকট কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে লেপ ফেলে চকিত হ'য়ে উঠে বসলাম।

"কে?"

বাইরে থেকে উত্তর এল, "কিষ্টোরাম, আমি ভাই সারদা। শীগগির দোর খোল। সব্বোনাশ হঁয়েছে!"

তাড়াতাড়ি দোর খুলে বাইরে এসে দেখি, সরদা দাঁড়িয়ে, মুখে উৎকট মদের গন্ধ।

"কি ব্যাপার?"

"আঁটকুড়ীর বেটী রাত বারোটার সময়ে পালিয়ে গেছে কিষ্টো।"

"পালিয়ে গেছে! কোথায় পালিয়ে গেছে?"

"একেবারে পগার পার।—বুঝছিস নে? মিত্যু হয়েছে তার।" ব'লে সারদা আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল।

বললাম, "বলিস কি সারদা! হঠাৎ কি এমন হ'ল?"

মাটিতে ব'সে প'ড়ে মাথা নাড়তে নাড়তে সারদা বলতে লাগল, "কিছুই হ'ল না রে ভাই, দিন তিনেক সামান্য জর হ'ল, তারপর রাত্রি বারোটার সময়ে দু-চারটে খাবি খেয়ে চোখ বুঝলে। তুই গিয়ে সৎকার করিয়ে দে ভাই। আমার হাতে একটিও পয়সা নেই, পরশু সেভিংস্ ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে তোর দেনা শোধ করব।"

হাতে ধ'রে সারদাকে দাঁড় করিয়ে সহানুভূতির কণ্ঠে বললাম, "বিপদে অধীর হ'তে নেই সারদা, তুই শান্ত হ। তোর কোনো চিন্তা নেই, আমি সব ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি।"

সারদা বললে, "এবার তা হ'লে আমার ব্যবস্থা কর্।"

"তোর আবার কি ব্যবস্থা?"

ডান হাত এগিয়ে দিয়ে সারদা বললে, "গোটা দুয়েক টাকা দে, মথুর শার দোকানে গিয়ে ঠাণ্ডা হই। বাড়ির বোতলে যেটুকু তলানি প'ড়ে ছিল, তাই খেয়ে এসেছি। তাতে কিন্তু হবে না ভাই, এ বেঁজায় শোক।"

বললাম, "আমি তৈরী হয়ে নিচ্ছি; ঠাণ্ডায় থাকিস নে, ভিতরে গিয়ে ব'স্।"

ঘরে প্রবেশ ক'রে আমার দু হাত চেপে ধ'রে কাতর ভাবে সারদা বললে, "একটা কথা কিষ্টো!"

"কি?"

"চিতেয় সের খানেক চন্দন কাঠ ছড়িয়ে দিস। শালীকে সত্যিই ভালবাসতাম ভাই।" ব'লে পুনরায় উচ্ছ্বসিত হ'য়ে কেঁদে উঠল।

বললাম, "তাই হবে, স্থির হ। তোর সঙ্গে গাড়ি আছে?—একা?"

"আছে। আমাকে কিন্তু মোথরোর দোকানে নামিয়ে দিস ভাই।"

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম।

কাদম্বিনীর মৃত্যুর দিন তিনেক পরে সারদা কাশী রওনা হ'ল। সঙ্গে গেল রামলাল। কাশীতে সারদার এক দূরসম্পর্কের মাসী বাস করে, তারই বাসায় উঠে সারদা কাদম্বিনীর পারলৌকিক কার্য সমাপন করবে।

যাবার সময়ে আমাকে ব'লে গেল, "সংসারধর্ম আর কার জন্যে করব বল্? কাশী গিয়ে এবার সাধুসঙ্গ করব স্থির করেছি। দানাপুরের বাড়িটা খদ্দের ঠিক ক'রে বিক্রি করবার ব্যবস্থা তুই করিস। খবর দিলেই আমি দু-তিন দিনের জন্যে এসে কোবলা ক'রে দিয়ে যাব।"

বিদেশে বাল্যবন্ধু লাভ ক'রে আনন্দেই ছিলাম। বিয়োগ-বেদনার সম্ভাবনায় মনটা বিষণ্ণ হ'য়ে উঠল। কিন্তু কাদম্বিনী যদি নিজের প্রাণ দিয়ে সারদার অধ্যাত্ম সাধনার পথ সুগম ক'রে দিয়ে গিয়ে থাকে, আমি কেন নিজের সুখ-দুঃখ নিয়ে তার মধ্যে ব্যস্ত হই?

৭

দেওকিলাল নামে আমার এক মক্কেল ছিল, তার বাড়ি দানাপুরে। সারদার বাড়ির কথা তাকে একদিন বললাম। ঔৎসুক্যসহকারে সে বললে, তার এক আত্মীয় দানাপুরে বাড়ি কেনবার চেষ্টায় আছে, তাকে সে ও-বাড়ির কথা জানাবে।

বাড়ি দেখে দেওকিলালের আত্মীয়ের পছন্দ হ'ল, দর দিলে বারো শো টাকা। ভালই। সারদা জানিয়ে গেছে হাজার টাকা পেলে বিক্রি

করতে রাজি হবে। এ নিজে থেকে দু শো টাকা বেশি বলছে; হয়ত মনে মনে আরও কিছু চেপে রেখেছে, চাপ দিলে বাড়তে পারে। দেওকিলালকে বললাম, "দু-চার দিনের মধ্যে সারদাকে চিঠি দিচ্ছি।"

দিন দুই পরে দেওকিলাল আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, "কাশীতে কি চিঠি লিখেছেন ওকীল সাহেব?"

বললাম, "এখনও লিখি নি, আজকালের মধ্যে লিখব।"

"তা হ'লে আর লিখতে হবে না, হালদারবাবু এসে গেছেন; কাল বৈকালে বাজারে তাঁকে দেখেছি।"

"তুমি তাকে চেনো?"

সহাস্যমুখে দেওকিলাল বললে, "আগে থেকেই চিনি, কিন্তু সাহেব উওকুর পর থেকে দানাপুরে কে না তাঁকে চেনে?" একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, "এবার তা হ'লে একটু তাড়াতাড়ি ওঁর সঙ্গে কথাটা পাকা ক'রে নিন। আবার হয়ত কোন্‌দিন কাশী ফিরে যাবেন।"

বললাম, "আচ্ছা।"

* * *

সারদা ফিরে এসেছে অবগত হ'য়ে মনে মনে খুশি হলাম। পরদিনই গেলাম তার সঙ্গে দেখা করতে।

দানাপুর রেল-স্টেশন থেকে সারদার বাড়ি বেশি দূর নয়। তার বাড়ির কাছ-বরাবর পথে দেখা হ'ল রামলালের সঙ্গে। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি রে রামলাল, কবে এলি তোরা?"

সহাস্যমুখে রামলাল বললে, "পরসোঁ ফজিরে।"

"বাবু বাড়ি আছেন?"

"জী হাঁ, বাবু আছেন। আপনি যান না, দর্‌বাজা খোলাই আছে। আমি পান নিয়ে এখনই আসছি।"

সদর-দরজা ভেজানো ছিল, ঠেলা দিতে খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ ক'রে উঠান পেরিয়ে বারান্দায় উঠে দেখি, ঘরের ভিতর তক্ত-পোশের উপর পিছন ফিরে ব'সে সারদা নতমুখে নিবিষ্ট মনে কি দেখছে। অপ্রত্যাশিত উপস্থিতির দ্বারা তাকে বিস্মিত ও পুলকিত ক'রে দেবার লোভে সন্তর্পণে একটু অগ্রসর হ'য়ে নিজেই বিস্মিত হ'য়ে গেলাম। শুধু

নতমুখ সারদাই নয়, আধ-খেলা দাবা-বোড়ের ছকের অপর দিকে নতমুখী সুন্দরী তরুণী। মুখ দিয়ে আপনা-আপনি বেরিয়ে গেল, "কি ব্যাপার ?"

মুখ তুলে আমাকে দেখে মৃদুস্বরে 'এই !' ব'লে আরক্তমুখে তক্তপোশ থেকে অবতরণ ক'রে তরুণী কোণের দিকে স'রে গেল। ঘর ছেড়ে পালাবার উপায় নেই, পথ আগলে আমি দাঁড়িয়ে।

পিছন ফিরে আমাকে দেখে সারদা আনন্দে উচ্ছল হ'য়ে উঠল। "আরে কিষ্টোরাম যে ! কি ক'রে সন্ধান পেলি ?" তার পর সজোরে নিজের পাশে এক থাপ্পড় মেরে বললে, "ব'স্ ভাই, এখানে ব'স্।"

বললাম, "তা না-হয় বসছি, কিন্তু ইনি কে ?"

সহাস্যমুখে সারদা বললে, "এত বড় উকিল হ'য়ে এটা আর বুঝলি নে কিষ্টো ? এটি মাসীমার দেওর-ঝি হেমাঙ্গিনী, আমার স্ত্রী বটে। কাশী থেকে বিয়ে ক'রে এনেছি।"

বললাম, "তা বেশ করেছিস, কিন্তু কাশীতে ত গেছলি সাধুসঙ্গ করতে ! তার কি হ'ল ?"

সারদা অট্টহাস্য ক'রে উঠল, "সে কথা আর বলিস নে ভাই ; কাশীতে একটিও আসল সাধুর দেখা পেলাম না, সবাই চিৎহাত সাধু। তাই মাসীর বাড়িতে হেমার দেখা পেয়ে সাধ্বী-সঙ্গ লাগিয়ে দিলাম।"

"দাবা শেখাচ্ছিস ?"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে সারদা বললে, "ক্ষেপেছিস ! ও আমাকে শিখাতে পারে। মাসীর বাড়িতে দাবা খেলতে খেলতেই ত কিস্তিমাৎ ক'রে গাঁট বাঁধলে।" ব'লে হেসে উঠল। তারপর ব'লে চলল, "গজের খেলা খেলে বেঁজায় ! এক দান খেলে দেখ্ না ক্যানে। যেখানেই তুই তোর রাজা থুবি, দেখবি কোণাকুণি শালীর দুই গজ শুঁড় উঁচিয়ে আছে।"

বললাম, "শুঁড় দিয়ে ওঁর গজ তোর রাজাকে বন্দী করলে আপত্তি নেই, কিন্তু তোকে বন্দী করলে বন্ধুহারা হব।"

সহাস্যমুখে সারদা বললে, "সে ভয় নেই কিষ্টো। আমরা কি মতলব করেছি জানিস ?"

"কি মতলব ?"

"কাশী যাবার সময়ে ঘোড়াটা বেচে দিয়ে গিয়েছিলাম। এসে অবধি

একটা ঘোড়া কেনবার চেষ্টা করছি। ঘোড়া কেনা হ'লেই আবার আগের মতো তোদের পাড়ায় যেতে আরম্ভ করব। তবে এবার আর একা নয়—জোড়ে। আর, ভোরে নয়, বেলা তিনটের সময়ে। হেমাকে তোর বাড়ি থুয়ে দু-চার ঘর সেরে আসব। তারপর সন্ধ্যা থেকে তোর বাড়ি আড্ডা জমিয়ে রাত নটার সময়ে রওনা।"

বললাম, "পথে মোথরোর দোকানে গাড়ি থামবে না ত?"

হা-হা ক'রে হেসে উঠে সারদা বললে, "তার আর উপায় নেই রে ভাই। আঁটকুড়ীর বেটী আমাকে দিয়ে বিশ্বেশ্বরকে সুরা উচ্ছুগ্‌গু করিয়েছে।"

হেমাঙ্গিনী ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। অবগুণ্ঠন কপালের মাঝ-বরাবর। ঈষৎ নত হ'য়ে করজোড়ে আমাকে অভিবাদন ক'রে বললে, "ঠাকুরপো, আপনি যে আমাদের কত আপনার, তা আমার জানতে একটুও বাকি নেই। আপনারা দুজনে খেলতে বসুন,—আমি আপনাদের খাবার ক'রে নিয়ে আসি।"

হেমাঙ্গিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছন থেকে তাকে দেখতে দেখতে মনে হ'ল, হেমাঙ্গিনী নাম বেমানান হয় নি, কিন্তু সৌদামিনী হ'লে সারদার দুই স্ত্রীর নামের অর্থসঙ্গতি আরও অনেক জোরালো হ'ত।

॥ সমাপ্ত ॥